# শ্রীশ্রীকৃষ্ণকরুণানিধি

( কৃষ্ণভক্তিমূলক ধর্ম্ম-গ্রন্থ )

ব্রজমণ্ডল-বৃষভানুপুর-নিবাসী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণারবিন্দপ্রমত্ত মধুকর

শ্রীপুলিনবিহারী দাস প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাস মজুমদার বি-এ

১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৩৩৪

মূল্য—২৷৷০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাস মজুমদার বি-এ
১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

[ গ্রন্থকার এবং প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত ]

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ,
১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাস মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# শুদ্ধিপত্র

| পত্রাঙ্ক | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ২৮১ | ১৩ | জননী ছুটী | জননী ছুটী |
| ১২৯ | ১০ | ক্ষারোদবিকুলে | ক্ষারোদধিকুলে |
| ৪১ | ১৬ | অন্ত্যজ শ্রেণীর | অশুজ শ্রেণীর |
| ৩৩৮ | ৫ | ফুলকুল-চর্চ্চিত | পুষ্পচয়-চর্চ্চিত |
| ৩৪ | ২ | চিন্তায় সুশীতল | চিন্ময় সুশীতল |
| ৩৪৫ | ৩ | ব্রজেশনন্দনো | ব্রজেশনন্দন |
| ৩৬৮ | ১৩ | সুর-সুন্দরী প্রভাব | সুরসুন্দরী প্রভার |
| ১৪৪ | ৬ | উদয় স্ফূর্ত্তি | উদয় স্ফূর্ত্তি |
| সূঃ ২৪ | ১ | অনসূয়াগারে | স্বনসূয়াগারে |

মুদ্রাঙ্কণ দোষে আরও যে সকল ভুল আছে তাহা বিজ্ঞ পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

ভাবাবেশে

শ্রীললিতবিহারী দাস।

ভাবাবেশে

শপ্লিনাবিহারী দাস।

# প্রকাশকের নিবেদন

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধানের পর বাংলার তথা ভারতের উপর দিয়া যে বৈদেশিক প্রভাবের বন্যা বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার সমাজ ও ধর্ম্মের আদর্শ বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ভারতের জাতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য—ইহা ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের দর্শন শিক্ষা দেয় ত্যাগ, আর ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় সাম্য, মৈত্রী। অপরকে বঞ্চিত করিয়া নিজকে পুষ্ট করাটাই ভারতের কাম্য নয়। পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারত তাহার ধর্ম্মের এই বৈশিষ্ট্যকেও বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে। যাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিজ সম্পৎ ছাড়িয়া ভারত ছুটিয়াছে—তাহা ধ্বংসমূলক; গঠনশক্তি তাহার নাই। তাহা ভাই-ভাইকে প্রেমে গলাগলি বাঁধিয়া থাকিতে শিক্ষা দেয় না; শিক্ষা দেয় রক্তারক্তি। সেখানে প্রবৃত্তির ভীষণ জ্বালা আছে; নিবৃত্তির সুকোমল শীতল স্পর্শ সেখানে প্রাণের সহজ সরসতা আনিয়া দেয় না। এ আদর্শের পতন অবশ্যম্ভাবী। এ প্রবৃত্তির আগুন আপনি আপনি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে; আর সেই ভস্মস্তূপের মধ্য হইতে প্রভাতের নবারুণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এক নূতন সৃষ্টি, যাহা সকল কলুষতাকে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবে।

ভারত এবার ধাক্কা খাইয়া শিখিয়াছে—যাহার পশ্চাতে সে ছুটিতে-ছিল সে তাহার কাম্য নয়। কাম্য যাহা, তাহা সে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। ভারতের মহামনা মনীষিগণের অনুপ্রেরণায় ভারত ফিরিয়া চাহিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে। মনীষিগণের সাধনার ফলে

ভারতের আকাশ আবার বালসূর্য্যের তরুণ আভায় রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। মেঘজালকে দূরে রাখিয়া দিতে পারিলে, ইহাই দ্বিপ্রহরের প্রখর প্রভায় সমস্ত ভারতকে উদ্ভাসিত করিয়া জগতে আপনার আসন প্রতিষ্ঠিত করাইয়া দিবে।

নবযুগের এই সন্ধিক্ষণে এইরূপই একখানা গ্রন্থের প্রয়োজন। গ্রন্থকার তাহার বুকের রক্ত নিংড়াইয়া আপন তুলিকার মুখে প্রেম, সাম্য, মৈত্রীর ধর্ম্ম অঙ্কিত করিয়াছেন। ইনি সর্ব্বসাধারণকে কলকণ্ঠে ডাকিয়া বলিতেছেন—এস মাতাপিতা ভ্রাতাভগিনিগণ, আমরা এই ধর্ম্মের আশ্রয় লই।

গ্রন্থকার বহু দুরূহ সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। ইনি কৃষ্ণভক্ত সাধক ও প্রেমের পূজারী। তিনি দেখাইয়াছেন এই সামাজিক জাতি বিভাগের গণ্ডীর মূল্য কতটুকু। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে জাতি বিচার করিয়া ইনি চান সাম্যের প্রতিষ্ঠা। বৈষ্ণবের আদর্শ কি, কাম্য কি, বৈষ্ণব-আচার কাহাকে বলে, সমাজে ও সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে তাহার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব কতটুকু, এবং তাহার স্থান কোথায় তাহাও ইনি যেমন দেখাইয়াছেন, তেমন তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে আকর্ষণ করিয়াছেন। সুতরাং গ্রন্থখানি যেমন মঙ্গলদায়ক, তেমন-ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সাধারণের ইহা অবশ্য পাঠ্য, আর বৈষ্ণবগণের পক্ষে ইহা চিরসাথী, পথের পাথেয়, বিষ্ণুপদধৌত মন্দাকিনীর স্নিগ্ধ বারিধারা।

সাধনপন্থার সখ্য-দাস্য-বাৎসল্য-মধুর এই চারিটির কোনটিকেই ইনি বর্জ্জনীয় বলেন নাই। সকলের যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করিয়া যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক মধুর রসকেই শীর্ষস্থান দিয়াছেন। ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান প্রেম। যে প্রেমের টানে প্রকৃতির স্বভাবে বৈচিত্র্য ঘটাইয়া যমুনায় উজান বহে, বিশ্বচরাচর আকম্পিত হয়, সেই প্রেমের জীবন্ত মূর্ত্তিই মুক্তির কাণ্ডারী মোক্ষধাম। এই প্রেমের দেবতাকে প্রেমিক হইয়া কি ভাবে সাধন করিতে হয়, তাহা সাধক দেখাইয়াছেন। প্রেমের শক্তি অসীম; প্রেম বিশ্ববিজয়ী।

যেরূপ জলপ্রবাহের মোক্ষধাম সমুদ্র, সেরূপ দেহীর মোক্ষধাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তরঙ্গিনী আকুল আগ্রহে সমস্ত পথ দৌড়িয়া আসিয়া সাগরের বুকে ঝাঁপ দিবার সন্ধিক্ষণে একবার স্থির লালিত্যে থমকিয়া দাঁড়ায়। সাগর-আলিঙ্গনের জন্য তখন তার অন্তরে কি ব্যাকুল বেদনা! কি গভীর গুঞ্জরণ তার বুকে ধ্বনিত হইতে থাকে! তারপর এক নিমিষে গভীর গর্জ্জনে কুল ভাঙ্গিয়া সমস্ত বাধা নিশ্চিহ্ন করিয়া উলঙ্গ উন্মুক্ত প্রাণে সে সাগরকে মহা আলিঙ্গন করে! তারপর? তারপর সব নিরব, নিস্পন্দ! সাগরের বুকে জড়াইয়া তরঙ্গিনী চিরকালের মত নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। দেহীকেও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব মিশাইয়া দিতে হইবে—তবেই চিরশান্তি। এই জন্য গ্রন্থকার মধুর রসকেই প্রধান বলিয়াছেন।

যৌবনের সিংহদ্বারে নারী যখন পৌছায়, আপন অজ্ঞাতেই তখন সে সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠে। আর এই কৈশোরের প্রথম আলোক সম্পাতেই সে প্রথম দেখে—তাহার অন্তরে এ কিসের ব্যাকুলতা, কিসের এ গুঞ্জরণ! কাহাকে সে চায়, কাহার অভাবে তার এক মুহূর্ত্ত চলে না! তখনই সে চায় মিলন। কিশোরীর সরস প্রাণে এই-ই প্রেম। এ প্রেমপ্রবাহ কোন বাধা মানিতে চায় না—কূল ছাপিয়া সে ছুটিতে চায়। সাধক বলিতেছেন তুমি কিশোরীর এই পবিত্র ভাব গ্রহণ কর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য তোমার অন্তরে

ধ্বনিয়া উঠুক কিশোরীর কূল-ছাপান বাঁধ-ভাঙ্গান বিরহের মধুর করুণ আর্ত্তনাদ। সমস্ত বিঘ্ন পদদলিত চূরমার করিয়া ছুটিয়া চল, ঝাঁপাইয়া পড়, ওই অনন্তদেবতার বুকে। সেখান হইতে তুমি আসিয়াছিলে, আবার সেখানেই তোমার অনন্ত মিলন।

অন্যান্য তথাকথিত বৈষ্ণবগণের সহিত এই সাধকের পার্থক্য এই যে ইনি **কামনাবর্জ্জিত ব্যভিচারহীন** কিশোরীর **প্রেম**কেই আদর্শ করিয়াছেন। সকল আবর্জ্জনাকে দূরে রাখিয়া ইনি চান নিষ্কাম্ প্রেম। ইঁহার প্রেমধারা কলুষনাশিনী দিগন্তপ্লাবিনী পবিত্র মন্দাকিনী ধারার ন্যায় স্বতঃ উৎসারিত।

ভক্ত অমর কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জয়দেব যে রঙ্গিন পুষ্পমালায় তাঁহাদের কৃষ্ণ-বিরহ-ব্যথা অমর মধুর ভাষায় গাঁথিয়া রাখিয়াছেন, এই সাধক ভক্তের সরল প্রাণের সরস সহজ ব্যথার গুঞ্জরণেও সেই ভাব-গাঁথার সেই তান-লয়-স্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। উত্তরার্দ্ধের বর্ণনা, গান, স্তোত্রসমূহ পাঠ করিবার সময় পাঠক দেখিবেন—কোন্ অজানা মুহূর্ত্তে তাহার মানসচক্ষুর সম্মুখে সেই মূর্চ্ছনা, সেই অমর ঝঙ্কার মূর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছে—অতি মধুর, অতি চমকপ্রদ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বদনবর্ণনার দু-একটি পদ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে—

নীলদেবেশ-মণি- দ্যুতি-মুখমণ্ডল
চন্দন-লেপন-কপালম্।
কলাপ-বিলাপক- কুঞ্চিত-কেশধর-
সুষমাকুল-প্রতিপালম্॥
সুন্দর-গোবিন্দ-বদনম্।

চিন্ময় কুন্দদতি ! কুরূপ-কাম-কোপ-

বিদলন-সুখ-সদনম্ ॥

কস্তুরী-বিরচিত সীমন্ত-সীমাস্থিত

নাসামূল-তিলকরেখম্ ।

মনো-ভব-মোহনে, রতি-সতী-রচিত

স্বপতি-পরাজয়-লেখম্ ॥—ইত্যাদি ।

যে পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-ব্যথাতুর ভক্ত কৃষ্ণ অদর্শনে গুমরিয়া গুমরিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া অশ্রু বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে কবিগুরু বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জয়দেবের স্মরণে বুকভাঙ্গা মর্ম্মভেদী দীর্ঘ তপ্তশ্বাস ফেলিয়াছেন, তাহা ভক্ত মাত্রকেই একবার কাঁদাইবে। এস ভাই, এস ভগিনি! একবার সেই মহাপূত অশ্রুতে আপনার অশ্রুধারা মিলাইয়া দেই—একবার সেই বিষ্ণুপদধৌত নীরধারায় অবগাহন করি!

পূর্ব্বার্দ্ধের দু-এক স্থলে ও উত্তরার্দ্ধের অনেক স্থলে গ্রন্থকার আপনার বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ গীতা, ভাগবত, পুরাণাদির শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহার যথাযথ অনুবাদ দেওয়া হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে সুবিধানুযায়ী অংশমাত্র অনুবাদ করিয়া সমগ্র শ্লোকের বা অংশমাত্রের ভাব গ্রহণ করিয়া প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। ভাবগ্রাহী পাঠক ইহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

ভ্রমবশতঃ দু-এক স্থানে ভুল রহিয়া গেল। ভগবদ্‌কৃপায় গ্রন্থখানার পুনর্মুদ্রন হইলে তাহা সংশোধনের ত্রুটি হইবে না।

—প্রকাশক

# শ্রীশ্রীকৃষ্ণকরুণানিধি

শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপায় নমঃ

## সূচনা অধ্যায়

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ-চরণ-কমল-মধুকরেভ্যো নমঃ।
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গতপ্রাণ-ব্রজভাব-মত্ত-মানবোত্তম-মনুজকুল-ভূষণেভ্যো নমঃ॥

"যাঁর কথা শুনে প্রাণ কাঁদে, যাঁর মোহন-মূর্ত্তি মহাপুণ্যে স্বপ্নে একবার দেখিলে জীবাত্মা 'কৃতার্থ হলাম' বলে পুলকিত হয়! —ওই স্বপ্ন আমায় সদাই দেখাও, যে স্বপ্নে তোমার দেখা পাই। সে স্বপ্ন নয়, সে-ই জাগরণ! যাহাতে তোমার রূপ দেখা যায় না— সে-ই স্বপ্ন! সে-ই মহানিদ্রা! নন্দ-ব্রজের কালোশশী! ব্রজ-গোপীর মনচোরা! একবার আমায় দেখা দাও! তুমি কোথায় রয়েছ! তোমা ভিন্ন সুখের উপায় কিছুই নাই! আমি সকলের দিকে চেয়ে দেখেছি, সব স্বার্থপর চোর! কেউ আমার হিতার্থী নয়। ছলনা ক'রে বন্ধু সেজে, সুখের বস্তু চুরি করবাব মন্ত্র এরা খুব জানে! জগতের নর-নারী সকলেই চোর, দুঃখদাতা! সুখদাতা প্রাণের বান্ধব মন-জুড়ান থাক্‌তে হয় ত তুমিই আছ। দেখা দাও, প্রাণের সখা!

কাঙাল বলে ঘৃণা করো না। তোমার সেই চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কবৃন্দের জ্যোতি দান করা কালো রূপ! সেই বর্ষাদিনে মেঘঢাকা বিদ্যুৎ হাসিতে উদ্ভাসিত অংশমাত্র-নির্ম্মল-আকাশ-নীলিমা-ময় কালো রূপ! সেই শারদ-সরোবরে-বিকশিত-প্রফুল্ল-নীলোৎপল-নীলিমা নয়ন-তৃপ্তিকর-কালো রূপ! যে রূপের মধ্যে সব রূপ লুক্কায়িত হয়, আবার প্রকাশিত হয়, সেই কিশোর গোপনন্দন-বেশ কালো রূপ একবার আমাকে দেখাও! সেই বিশাল অথচ মনোহর নয়নভঙ্গী, সেই মধুর হাসি, সেই বন্ধুজীবের ন্যায় লালবর্ণের অধরপল্লব! সেই ময়ূর পাখার মোহনচূড়া! সেই বাঁশীধরা ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গী! সেই বনমালা-বিভূষিত মোহন বেশ! একবার আমাকে দেখাও! আমি নয়ন মুদে শুধু ওই দেখ্‌ব! আর কিছুই দেখ্‌ব না! কোথাও যাব না! কিছুই খাব না! কিছুই চাই না! আমি মর্‌ব কি বাঁচব, হাস্‌ব কি কাঁদ্‌ব, জাগ্‌ব কি ঘুমাব, আমি সব হারাব কি সব পাব, তাও জানি না। কিন্তু দেখ্‌ব একবার তোমার ওই রূপ! সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ করে কোথাও সুখ পাই নাই। সব দেখে, সব ছেড়ে, মনের মানুষ! এইবার তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ করব! মন বল্‌ছে—এইবার সব পাওয়া হবে!"—এই বলিয়া সর্ব্বত্যাগী ভক্ত নির্জ্জনে যাঁর জন্য কাঁদিতে থাকেন, যাঁর নামগুণ দ্বারা, হরিনাম সংকীর্ত্তন দ্বারা অমঙ্গল নাশের বিধান হয়, জীব কেন সেই কৃষ্ণকরুণানিধির ভক্ত হয় না! সেই কৃষ্ণ-ভক্তকে জীব কেন প্রিয়-বান্ধব-জ্ঞানে আশ্রয় করে না! কৃষ্ণ বড় দয়ালু; তিনি সর্ব্বেশ্বর, এক, অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-স্বরূপ। তাঁর তুল্য সুখদাতা ভক্তবৎসল, ভক্তরক্ষক ও ভক্ত-হিতের জন্য মানাভিমানশূন্য, শরণাগতপালক আর কেহই নাই; মানব মাত্রকে কৃষ্ণ-ভক্ত হইতে হইবে, জগতের মধ্যে ভক্ত ও ভগবান

—এই তত্ত্বজ্ঞান, সর্ব্বসুখদ সকল জ্ঞানের চূড়ামণির ন্যায় জীবমাত্রেই গ্রহণ করুক।

কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবই জগদ্‌গুরু ও ভববন্ধন মোচনকারী,—শাস্ত্রের ইহাই নিত্য বিধান। তাহা জানাইবার জন্য এই নব প্রবন্ধের আবির্ভাব হইল। কত মরছে, কত জন্মাচ্ছে! মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, পতি, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি কত মরিল। কোথায় গেল, সন্ধান পাওয়া গেল না। কান্নার নদী বহিল, কেউ ফিরে স্বপ্নেও একবার দেখা দিয়ে সে কান্না থামাইল না। কান্না থামানোর পরিবর্ত্তে, সেই স্নেহের—সেই ভালবাসার মানুষ—স্বপ্নে যদি দেখা দেয় ত দেখা যায় সেই মরণ সময়ের ভয়-দেখানো বিকট মূর্ত্তি। ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়; তবুও তার কথা ভোলা যায় না। পাগল মন বলে,—হায়রে কোথায় গেলরে! বেঁচে থাক্‌ত ত সুখ দিতরে! ওঃ কি ঘৃণিত মায়া! যে সদাই বেঁচে থাকে, যাঁর নামে মরণ-ভয় দূর হয়, এবং যে রূপ দেখ্‌লে—স্বপ্নে জাগরণে যাঁর রূপ দেখলে—মন ফুলের হাসির মত আপনা হতে হেসে উঠে,—চোখ দিয়ে জল পড়ে বটে, কিন্তু সেই সময় কি অসীম আনন্দ এসে ভেদাভেদ-রহিত অচিন্তনীয় সুখধামে প্রেরণ করে!—শাস্ত্র চিরদিন যাঁর চরণের সন্ধান বলিতেছে, সেই কালো সোনা করুণানিধি কৃষ্ণের জন্য মন কেন কাঁদে না। সেই কৃষ্ণরূপের দিকে মূঢ় নয়ন কেন দেখে না! কৃষ্ণের সঙ্গে মায়া কেন লাগে না,—তাহাই জানাইবার জন্য এই চিরনব প্রবন্ধের আবিভাব হইল।

লৌকিক সম্বন্ধ ধরিয়া ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ পরমেশ্বর বস্তুকে লাভ করিয়া কৃতার্থ ও মানবত্ব লাভ করিতেছেন, এবং এই ভাবেই ঈশ্বর মানবেরই সাধ্য। কেহ ঈশ্বরকে মাতা-পিতা-ভাবে,* কেহ পুত্র-ভাবে কেহ স্বামী-ভাবে, এবং আরও কতজন নানাবিধ ভাবে তাঁহাকে ভক্তি

করিয়া প্রাপ্ত হইতেছেন। এখন ঈশ্বর যদি সর্ব্বভাবের মূর্ত্তি হইয়া ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হন, তবে এমন একটি ভাব ধরিতে হইবে, যাহাতে ঈশ্বরকে সদাই দেখিতে লালসা ও নিজের অঙ্গে স্থান দিয়া বসাইতে প্রবল বাসনা জন্মে, এবং তিনি ভিন্ন রাত্রিদিন কাহারও রূপের দিকে দৃষ্টি পতিত না হয়। এই জগতে নবীন যুবা পুরুষে কিশোরী নারীর যে প্রণয়, তাহাতে এই সর্ব্ব-চিন্তাহারা পরস্পর সম্মিলন চেষ্টা যেমন বিশেষভাবে লক্ষিত হয়, তেমন আর কোন ভাবেই দেখা যায় না। শিশুপুত্র মায়ের সোহাগ পাইতে খুব ভালবাসে সত্য, কিন্তু মা তাকে অনেক সময় খেলনা দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়া দেন, এবং দুর্ব্বল শিশুকে মা যদিও যত্নসহকারে লালন-পালন করেন, তথাপি তাঁর মনে হয়, "ছেলেটি যদি সবল হয়, তবে কতই না আনন্দ হয়! বড় হয়ে বউ নিয়ে যদি ঘর করে, তবে তাই দেখে আমার সাধ পূর্ণ হয়।" এখন এই মাতৃভাবের মধ্যে পুত্রের অন্যরূপ অবস্থা পরি-বর্ত্তনের ভাব মায়ের অন্তর কামনা করে, কেননা পুত্রের মলমূত্র পরিষ্কার করা এই শিশুদেহ অপেক্ষা আর একটি স্বেচ্ছায় আহার-বিহারকারী সবল সুন্দর দেহকে মা কামনা করিতেছে। সেইটি কৈশোর বা নবীন যুবা বয়সের দেহ ভিন্ন আর কিছুই নয় জানিবে। সুতরাং এই মাতৃভাবে অন্যভাব কামনাহেতু ইহাতে ব্যভিচার-দোষ পূর্ণরূপে দেখা যায়; যেহেতু মলমূত্র ধোয়ান শিশুরূপ মায়ের ভাল লাগে না, এই জন্য অন্য রূপ কামনা করে। অতএব ভগবানকে মা করিয়া তাঁ'র দ্বারা মলমূত্র ধোয়ানও উচিত নয়। সমর্থা কিশোরী হও। যেহেতু যুবক স্বামী অনুগতা কিশোরীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে; এবং পত্নীর আরও বয়স বেশী হ'ক্ বা আরও বয়স কম হ'ক্, কোন পুরুষ এ কামনা করে না। আবার সেই পুরুষের যেমন ভাব, কিশোরী

নারীরও তেমন ভাব। সে সদাই এই কামনা করে—স্বামীকে আমি এইরূপেই চিরদিন যেন আনন্দ দান করি; এবং স্বামী আমার যেরূপ মন ভুলাইতেছে, যেরূপে প্রথমে আমার নয়ন-মন আকর্ষণ করিয়াছে, সেইরূপেই সারাজীবনটি আকর্ষণ করুক। দিন চলিয়া যাইতেছে, জীবনের গণা দিন কমিতেছে। কিছুদিন পরে এ যৌবনের লাবণ্য, বল, বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুই থাকিবে না; বৃদ্ধ হইব, রোগাদির যন্ত্রণায় মন অস্থির হইবে; তখন প্রাণ-বল্লভ কৃষ্ণের ধ্যান কেমন করিয়া করিব! সেবাপূজা কি করিয়া করিব! 'কাল কাল' করিয়া আর কাল কাটান যায় না। এই ত সেই বৃদ্ধ হইবার প্রথম সোপানে উঠিয়াছি। তারপর সেই ভীষণ দশা আসিবে। ধ'রে ধ'রে তুলিবে, খাওয়াবে! নয় মলমূত্রময় শয্যাতে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিব! ওঃ সে কি ভীষণ দশা! হায়, তখন নিজের জ্বালাতে অস্থির; সুস্থির চিত্তে যাহার রূপ দেখিতে হয়, সেই করুণানিধি কৃষ্ণরূপকে তখন কি করিয়া দেখিব! তাঁহাকে না দেখিলে ত এ যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই! অতএব এই সময়ে তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক জ্বালার শেষ করিব। এস নাথ! এস সুন্দর পয়োদ কালশশী! আজই আমায় দর্শন দাও! আর 'কাল আসিব' বলিয়া ভুলিয়া আছ কেন! আমার জীবন-যৌবন যে বৃথায় যাইতেছে! সময় থাকিতে সুখদাতা আমায় দর্শন-দানে কৃতার্থ কর। এই ভাবে বিরহিনী ব্রজবালার ন্যায় সুধী ভক্ত কাঁদিতে কাঁদিতে—"কই প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণ, এখন কেন দর্শন দিতেছেন না! তাঁহার আসিবার কাল কি এখনও হয় নাই"—ভাবিয়া গাহিতে থাকেন—

"কালি বলি কালা গেল মধুপুরে,
সে কালের কত বাকী।

যৌবন-জোয়ারে হইতেছে ভাঁটা,
তাহারে কেমনে রাখি ॥”

এই কিশোর বয়সের প্রণয়! ইহাতে অন্যরূপ কামনা থাকে না বলিয়া ইহা ব্যভিচার-হীন সত্য-প্রেম। মহামনাগণ চিরদিনই এই প্রেমের অন্বেষণ করিতেছেন। অতএব কিশোর স্বামীরূপে পরমেশ্বরের সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপন—ইহাই শ্রেষ্ঠ ভাব! এই কিশোর প্রিয় কিশোরী প্রিয়াকে, মা যেমন ছেলেকে খেলা দিয়া ভুলায়, তেমন ভুলাইতে পারে না। শিশু ত মায়ের দুগ্ধ পান করিয়া খেলনা নিয়া খেলিতে থাকে; কিন্তু কিশোরী নায়িকা শুধু কিশোর নায়কের জন্যই কাঁদিতে থাকে। আমার নিত্য কিশোর-কিশোরী রাধামাধবের কুঞ্জ-ভঙ্গের শেষে এই কৈশোর প্রেমের কি মর্ম্মভেদী দৃশ্য প্রকাশ হইয়াছে—শ্রীমান্ বলরাম দাস ঠাকুরের পদের কিয়দংশ লইয়া অনুভব করা হউক। সখিগণ সহিত শ্রীরাধা নিজ মন্দিরে যাইবার কালে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দুইয়ের হৃদয়ভাব, যথা—

“পদ আধ চলত খলত পুন বোর।
পুন হেরি চুম্বয়ে দুহু মুখ হেরি॥
দুহু জন নয়নে গলয়ে জলধার।
রোই রোই সখিগণ চলই না পার॥”

মা খেলনা দিয়া শিশুকে ভুলাইয়া বায়, কিন্তু এ প্রেমে খেলনা দিয়া ভুলাইবার সাধ্য নাই! কেমন করিয়া ভুলাইবে! যে প্রেমমত্ত মন বলিতে থাকে—

“প্রাণ বঁধুহে নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম-চিন্তামণি মালাটি গাঁথিয়া
হিয়ার মাঝারে লব॥”

তাহাকে খেলনা দিয়া ঈশ্বর ভুলাইতে না পারিয়া নিজকে দিয়া ভুলাইতে চেষ্টা করেন। অতএব কিশোরী নারীর ন্যায়, নিত্য কিশোর জগৎপতি কৃষ্ণের উপাসনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব। দাসভাবে মহাসঙ্কোচ,—"প্রভুকে নিজের আসনে কি করে বসাব, নিজে বা কি করে তাঁর আসনে বস্‌ব!"—প্রহরীর মত দ্বার দেশে "আজ্ঞা করুন" এই ভাবে করযোড়ে থাকা ;—ইহাতে ঈশ্বর তাহাকে নিজ পত্নীর ন্যায় নিজ অঙ্গে ধরিতে সমর্থ হন না। এইহেতু দাসভাব সর্ব্বোত্তম নহে। পত্নী ও ভৃত্যের যতদূর পার্থক্য ততদূর ভাব বুঝিয়া লও। পত্নীর সহিত কেমন প্রেম, আর একজন বন্ধুর সঙ্গে কেমন প্রেম, ইহাতে সখ্যভাবের পার্থক্য বুঝিতে পারিবে। অতএব নারীভাবে জগৎপতিকে পতি জ্ঞানে ভাবনা—সর্ব্ব সুখের শেষ সীমা, ইহাই জানাইতে এই নিত্য নব-প্রবন্ধের আবির্ভাব হইল।

পূর্ব্বোক্ত দাসভাব দুই প্রকারে ভক্তের অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত হয়। একটি সঙ্কোচরহিত দাসভাব, আর একটি সঙ্কোচযুক্ত দাসভাব। সঙ্কোচরহিত দাসভাব সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবে বিদ্যমান থাকে। এইজন্য সখ্য-বাৎসল্য-মধুর শ্রেণীর কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগণ দাস-অভিমান উপাধিতে বিভূষিত হন। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই জন্য স্বীয় চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যথা—

"কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটি ব্রহ্ম-সুখ তার নহে এক বিন্দু॥"

ইহা যে সঙ্কোচরহিত দাস-অভিমান সে সম্বন্ধে কোন অন্যথা নাই। যেমন নারায়ণের বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মী, দাসীভাবে নারায়ণের শ্রীচরণ কোলে লইয়া পদসেবা করিতেছেন ; ইহাতে মধুর-ভাব-বিশিষ্টা পত্নীরূপা লক্ষ্মীর অধিক আনন্দ হইতেছে, সময়ে নারায়ণের

বক্ষেও তিনি শয়ন করিবেন। কিন্তু কেবল মাত্র দাসীভাবে যে সকল লক্ষ্মী-সহচরিগণ লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবাকার্য্য করেন, তাঁহারা চরণসেবা ভিন্ন নারায়ণের বক্ষে বা পর্য্যঙ্কে শয়ন করিতে পারিবেন না; যেহেতু তাঁহাদের মনে সঙ্কোচযুক্ত দাসীভাব বিদ্যমান আছে, সঙ্কোচরহিত মধুর পত্নীভাব তাঁহাদের নাই। শ্রীমন্ উদ্ধব যখন ব্রজে গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণবিচ্ছেদ-কাতর শ্রীনন্দবাবা প্রভৃতিকে কহিয়াছিলেন, "ব্রজরাজ! আপনার কৃষ্ণ-বলরাম মায়া-মনুষ্য মূর্ত্তি, এই অখিলবিশ্বের মাতাপিতা ত তাঁরাই দুটী; তাঁদের আবার মাতা-পিতা কে? কিন্তু হে ব্রজরাজ নন্দ! হে ব্রজরাজ-মহিষী মা যশোদে! আমরা যাঁকে সর্ব্বেশ্বর বলে জানি, যাঁর জ্যোতি ধ্যান করে সুখী হই, যোগী-ঋষিগণ কঠোর তপস্যা ক'রে যাঁর চরণ দর্শন জন্য, কাননে, গিরিগহ্বরে অবস্থিত, সেই পরাৎপর ব্রহ্ম-কৃষ্ণকে পুত্র-জ্ঞানে আপনারা যে কোলে পিঠে করে লালনপালন করেছেন; ইহাতে এ জগতে আপনারাই ধন্যতম!" উদ্ধবের এই সকল কথা শুনিয়া কৃষ্ণস্নেহ-বিহ্বল শ্রীনন্দবাবা গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "উদ্ধব! তোমার ঈশ্বরের অথবা জগতের ঈশ্বরের চরণে যে মনটি আমাদের লাগিয়াছে, সেই মনটি সর্ব্বদাই আমাদের থাকুক। অর্থাৎ হে উদ্ধব! কৃষ্ণ-বলরামকে তোমরা ঈশ্বর-জ্ঞানে যে ভক্তি দেখাও, আমরা মূঢ় গোপজাতি সে ভাব দেখাইতে জানি না। তবে পুত্রভাবে পাগল আমি, সে দুটীকে কাঁধে করে, 'বল-কানু আমার বাপের ঠাকুর, আমি এদের বুড়া চাকর' এই কথা যখন বল্‌তাম, তখন কৃষ্ণ-বলরাম সশব্দে মধুর হাসি হেসে, আমার বুকে চির মনোরম রাঙ্গা চরণের মৃদু আঘাত কর্‌ত, করতালি দিত। আমি বল-কানুর সেই রাঙা পায়ের শোভা এক দৃষ্টিতে দেখ্‌তাম্; মনে কর্‌তাম এ দুটীর এ চরণ চিরদিন যেন

আমার ব্রজপুরকে বিভিন্ন ভাবে ভূষিত করে। আমাদের এই ভাবটি তোমাদের ঈশ্বরের চরণে থাকুক।" এ স্থলে জগৎপিতা কৃষ্ণ যাঁহাকে পূজ্য পিতা জ্ঞান করেন, সেই বাৎসল্য-রস-মন্দির নন্দের হৃদয়ে সঙ্কোচরহিত দাস্যবৃত্তি রহিয়াছে। এইভাবে এই দাস্যবৃত্তি শ্রীরাধিকা প্রভৃতিতে বিদ্যমান জানিবে। কিন্তু সঙ্কোচযুক্ত কেবল মাত্র দাস্য-বৃত্তি—যাহা রক্তকাদি শ্রীকৃষ্ণের দাসগণে বিদ্যমান—ইহা তাহা নহে। ইহা সঙ্কোচরহিত অভিলাষ পূরণের দাস্য জানিবে। এই দাস্য সর্ব্ব-মনোহর সর্ব্বোপরে শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষের জন্য বিরাজিত। আমি সখা হইয়াও দাসভাবে চরণসেবা করিব, পিতা হইয়াও দাসের তুল্য সুখ দিতে যাইব, পত্নী হইয়াও আমি তাঁর দাসীর তুল্য কার্য্য দেখাইব—ইত্যাদি সঙ্কোচরহিত মহাদাস্যভাব সকলেরই প্রার্থনীয়। এই হেতু পরম পূজনীয় কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগণ দাস ভিন্ন কোন উপাধিতে ভূষিত হন না। এই সঙ্কোচরহিত দাসভাবটি যেন একটি আবরণ সদৃশ, এবং তাহার মধ্যে সখা-বাৎসল্য-মধুর ভাবত্রয় মুক্তা-স্বর্ণ-স্পর্শমণি-সদৃশ বিরাজিত। আবরণ হীন হইলে মূল্যবান বস্তু অপহৃত হইবে; এই জন্য মহাজন বৈষ্ণবগণ দাস্যভাবের আবরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। যে দিন হইতে বৈষ্ণব-জগতের নিত্যানন্দ পূর্ণ-বস্তুর প্রতি সর্ব্ব মানবের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে কৃষ্ণের ইচ্ছাতে আনন্দ বস্তু রক্ষার জন্য দাস-উপাধির আবরণও পতিত হইয়াছে। আবরণ দেখিয়া যাহারা ফিরিয়া যায়, তাহারা সব কিছু হারায়; যাহারা আবরণকে ধরে, তাহাদের হাতে ধনরত্ন যতকিছু সব পড়ে।

এইজন্য ইঁহারা অতি পূজনীয়। হরিদাসগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নকলেবর আপনার জন, গোলক-বৃন্দাবনবাসী, সকল জীবের পাপ-তাপ-জ্বালা-নাশক; এবং উদ্ধারকারী ইঁহারা ভিন্ন আর কেহ নাই। বৈষ্ণবীয়

বেশ ( যাহাকে ভেক বলে ) ইঁহাদের পরম প্রিয় হয়। ইঁহারা কোন জাতি-অভিমান রাখেন না, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় কৃপালু ও সমদর্শী; এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-বাস-কালে উপবীত হীন বলিয়া, ইঁহারা পৈতা রাখেন না, তিলক-কণ্ঠি ইঁহাদের প্রধান আশ্রয়। প্রকৃত পক্ষে পবনের ন্যায় সর্ব্বগামী, সমদর্শী, নিত্য স্বরূপ বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইয়া, যাঁহারা জাতি-অভিমানসূচক চিহ্ন ধারণ করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবপদ হইতে কথঞ্চিৎ ভ্রষ্ট ভিন্ন আর কিছুই নহে জানিবে। যেহেতু, মথুরা-দ্বারকার কৃষ্ণ-লীলা হইতে ব্রজের কৃষ্ণলীলা অকথনীয় উত্তম—ইহা তত্ত্বদর্শীরা জানেন। শ্রীমন্ গৌরসুন্দর ব্রজলীলাতে সদাই আবিষ্ট; অতএব গৌরাঙ্গ-আশ্রিত জনগণ মাথুর-শ্রীকৃষ্ণের উপনয়নাদি কেন গ্রহণ করিবে! এই হেতু উপবীতহীন বৈষ্ণবগণই প্রকৃত গোপ-ভাবমত্ত বনবাসী জীব, অথবা সাধনসিদ্ধ ব্রজবাসী জানিবে। এই শ্রেণীর কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগণই বাসুদেবের ন্যায় জীবের পূজনীয়। শাস্ত্র তাই বলিতেছেন—

"হরিভক্তিরতান্ যস্তু হরি-বুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ।
তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রা! ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদয়॥"

ইতি বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

অর্থাৎ হে বিপ্রকুল-চূড়ামণিগণ! কৃষ্ণ-ভক্তি-রত মানবকে যে কৃষ্ণ বুদ্ধিতে পূজা করে, তাহার উপর ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদি দেবগণ সন্তুষ্ট হন। এই কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবকে নিন্দা করিলে, কি ফল ভোগ হয়, তৎসম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ কহিতেছেন, যথা—

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে॥"

অর্থাৎ যে মূঢ় মানব মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করেন, সেই দুরাচার পিতৃগণের সহিত মহারৌরব নামক নরকে গমন করে।

এই দাস-অভিমানী বৈষ্ণববৃন্দের কি যে অপূর্ব্ব মহিমা তাহা রাধাকৃষ্ণ-গতপ্রাণ মহাজনগণই জানেন। দাস-অভিমানী বৈষ্ণবের অধরামৃতাদি:( উচ্ছিষ্টাদি ) মানবের সর্ব্বকল্যাণ আনয়ন করে। এতৎ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মূর্ত্তি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ অন্ত্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছদে কহিতেছেন—

"বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণালাজ।
যাহা হইতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হইলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্ত-পদধূলি আর ভক্ত-পদজল।
ভক্ত-ভুক্তশেষ এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্ব-শাস্ত্র পুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি শুনো ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥"

বিশ্বাসহীন নাস্তিকেরা বিচারাদি মানে না; নিজ-অহঙ্কারে পাখা উঠা পিপীলিকার মত শেষে মরিতে থাকে। সাধক মহাত্মাগণের আচরিত পথে ক্ষণকালের জন্য তাহারা যদি গমন করে, তবেই নিজের ভ্রম জানিতে পারে। যাহার বর্ণপরিচয় নাই, সেই নিরক্ষর মূর্খ একবারেই রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িতে ইচ্ছা করিলে বিরক্তি ভিন্ন আনন্দ কি প্রকারে পাইবে? কৃষ্ণ কি কখন নিজেই বলেন যে, "আমি এই কৃষ্ণ, তোর কাছে এসেছি। এই আমি চূড়া-ধড়া-বাঁশী নিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়ালাম, তুই আমায় ভক্তি কর। আমি খেতে পাই না, তোর কাছে খেতে এসেছি!" তা কখনই বলেন না,

তাঁকে দেখিতে হইলে ভক্তির চক্ষু খুলিতে হইবে। "হা কৃষ্ণকরুণানিধি" বলিয়া কাঁদিতে হইবে, তবে তিনি দেখা দেবেন। ভক্তের দুয়ারে কাঙালের মত কৃষ্ণ আসেন, এ কথা চিরসত্য। অতএব অগ্রে ওই দাস-অভিমানী ভক্ত সাজ।

ঈশ্বর জগতে মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হইয়া লোক-শিক্ষার্থ যে সব ভক্ত-ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন, তাহাই মানবের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ভক্ত-ধর্ম্ম দুই ভাবে আচরণ করিতে হয়—অন্তরে ও বাহিরে। এই দুইটির একটি নষ্ট হইলে পাখাহীন পাখীর ন্যায় কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অন্তরের ধর্ম্ম আচরণ—ঈশ্বরের রূপ-গুণ-লীলা চিন্তা। বাহিরের ধর্ম্ম আচরণ—শরীরে ঈশ্বর অধিষ্ঠান সূচক তিলক-তুলসী-মালাদি ধারণ, পূজা শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি। কিন্তু মনুষ্যরূপে লীলাকারী ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশক যে আচার, যেমন গোপনারী সঙ্গে রাসলীলা, গোবর্দ্ধন-ধারণ, দাবানল পান প্রভৃতি মানুষের আচরণীয় নহে। এ আচার মানুষের মৃত্যুর কারণ জানিবে। এই হেতু রাস-পঞ্চাধ্যায়ের শেষভাগে শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে কহিয়াছেন, যথা—

"ধর্ম্ম ব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যা-চরণ মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচো-যুক্তং বুদ্ধিমাং স্তৎ সমাচরেৎ॥"

অর্থাৎ পরনারী লইয়া যে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, ইহাতে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য কিছু হয় নাই জানিবে। কেননা ইহাতে তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান

ঈশ্বর, মানবরূপে আসিয়াছেন, তাহারই প্রকাশ হইতেছে। শত কোটি গোপীসহ শত কোটি কৃষ্ণ হইয়া রাসলীলা সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ ভিন্ন অন্যে সম্ভব হয় না। এইরূপ ইন্দ্র-চন্দ্র-বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তেজস্বী জনগণের গুরুপত্নী-বেশ্যা-গমনাদি দোষ-জনক নহে। ইহাতেও তাঁহারা জগৎ-পূজনীয়। আগুণ যেমন সর্ব্বভক্ষক, সেই রূপ তেজীয়ান মানবেরা সর্ব্ব কার্য্যকর। কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন মানুষে এইরূপ আচার বাহিরে না করিলেও মূর্খতা বশতঃ যদি মনে মনে করিয়া থাকে, তবে তাহাতেও সে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কারণ সাগরজাত হলাহল রুদ্র ভিন্ন কেহ পান করিতে পারে না। এই সর্ব্বেশ্বর ও ঈশ্বর ইন্দ্র-চন্দ্রাদির আদেশবাক্য সত্য; অতএব তাহাই পালন করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের কোন সময়ের সত্য-আচরণ-ধর্ম্ম তাঁহার আদেশ-বাক্যের সঙ্গে যদি মিলিত হয়,তবে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাহাই আচরণ করিবেন। কৃষ্ণ কখনও রাসলীলাদি করিতে আজ্ঞা দেন নাই। অর্জ্জুন ও উদ্ধবকে ভক্ততুল্য তাঁহার ধ্যান করিতে আদেশ দিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণকরুণানিধির আদেশ পালন করিতে হইলে, তাঁহার ভক্ত সাজিতে হইবে।

সাজা বলিলে বিচারশক্তি-হীন মূঢ়েরা বলে—বাহিরে সেজে কি হয়? মনের ভিতরে সাজাই ভাল! কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন, মন যাহার সাজিয়াছে, সেইত বাহিরে সাজিতেছে। অগ্রে মন সাজিয়াছে, তবে ত বাহিরে সাজিতেছে। যে বাহিরে সাজে নাই,তাহার মন কখনও সাজে নাই। যেহেতু মনের কার্য্য বাহিরে সব প্রকাশ হয়। গৃহাদি প্রস্তুত করিতে হইলে অগ্রে মন প্রস্তুত করে, তবে হস্তের দ্বারা বাহিরে প্রস্তুত হয়। মন যে কার্য্য অগ্রে না করে, সে কার্য্য বাহিরে কখনও সম্ভব নয়। অতএব যাঁহারা মনে ভক্ত বা ধাম্মিক সাজিয়াছে, তাহারাই বাহিরে ভক্ত বা ধাম্মিক সাজিয়াছে জানিবে। যেখানে নিজের মন ছাড়া

দ্বিতীয় জনের মন নাই, সেখানে বাহিরের সাজ না সাজিলে চলে ; কিন্তু বহু মনবিশিষ্ট মনুষ্য-মণ্ডলীতে বাহিরের সাজ না রাখিলে, মনের ভিতরের সাজ নষ্ট হইবেই হইবে ; ইহাতে কোন অন্যথা নাই। যেমন কোন গৃহস্থ মনে ভক্তি করিয়া ঠাকুর বাড়ীতে দুধ দিতে সঙ্কল্প করিল ; গাভী দোহন হইল ; কিন্তু সঙ্কল্প গৃহস্থের মনে আছে, বাহিরে প্রকাশ করে নাই। এমন সময়ে তা'র একটি শিশুপুত্র হঠাৎ আসিয়া সেই দুধ খাইতে লাগিল। গৃহস্থ বলিয়া উঠিল, "আহা দুধটা ঝুঠো কর্‌লি, ঠাকুর-বাড়ীতে দুধ দেওয়া আর হল না।" এইরূপে যাহারা মনের সাজ বাহিরে না প্রকাশ করে, অধার্ম্মিকদের সঙ্গে পড়িয়া তাহাদের মনের সাজ বা ধর্ম্মবুদ্ধি যে নাশ হইবে, তাহার কোন ভুল নাই। বাহিরের সাজে বাহিরের শরীরকে রক্ষা করা যায়, বাহিরের শরীর রক্ষা না করিলে মন ঠিক থাকে না—ইহা কে না জানে ? অতএব ধর্ম্মের সাজে বাহিরে সাজ, তবে মন ধর্ম্মের সাজে সাজিবে। নতুবা যতকিছু বল অন্ধের রাস্তা দেখানোর ন্যায় হাসি মাত্র জানিবে। যাঁহাদের ভক্তি-ভরা ঈশ্বরলীলা কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারী নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইতেছে, সেই মহাজনগণ দাস-উপাধিতে বিভূষিত ; যেমন চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রামচরিত প্রণেতা হিন্দী ভাষার মহাকবি তুলসীদাস প্রভৃতি। মায়ার কুহকে দাস পদবীটি যেন ঘৃণাস্পদ হইয়াছে। সেই হেতু এই দাস-মহাজনদের কাছে যাহারা ঋণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে, তাহারাই বৈরাগী, অধিকারী, দেবশর্ম্মা, গোস্বামী প্রভৃতি পদবী লইতেছে। দাস বলিতে যেন তাহাদের কত মান নষ্ট হয়। "পেটে না ধরে মা!"—তাই হ'ক্। কিন্তু এ অভিমান দুদিনের জন্য মিথ্যা। পুণ্য-ভূমি ভারতখণ্ডের সমুদয় সাররত্ন এই দাস-পদবী বৈষ্ণব-মহাজনবৃন্দের

অধিকারে রহিয়াছে। বৈষ্ণব বিরচিত শাস্ত্র ভিন্ন ভারতের পরিচয় দেবার কিছুই নাই। ভারতের নিজস্ব যত কিছু সমস্ত বৈষ্ণব শাস্ত্রের মধ্যে। শ্লোক-গুরু বাল্মিকী, নারায়ণ-অবতার বেদব্যাস, এই দুই জন পরম বৈষ্ণব বনের ভিতর বসিয়া সাধুবেশ ধারণ পূর্ব্বক রামলীলা ও কৃষ্ণলীলা লিখিলেন। তাহার ভিতর হইতে ধার-কর্জ্জ করিয়া কত ব্রহ্মমত, কত তন্ত্রমত, কত চার্ব্বাক-মত, কত কাব্যকার মহাকবি হইল, কত বা হইবে, তাহার সীমা নাই! কিন্তু এই দুই জনের চিরনব গৌরব রক্ষা করিতেছেন, ভক্ত বৈষ্ণবগণ। যত দিন ভারত বৈষ্ণব-গৌরবালোকে প্রদীপ্ত, ততদিন সে স্বাধীন, যতদিন সে দীপ্তি ম্লান, ততদিন সে পরাধীন! স্বার্থ-সাধন-কুজ্ঝটিকা দ্বারা সে দীপ্তি যখন ম্লান হইল, এক ধর্ম্ম-প্রাণ বিষ্ণুতেজ অন্তর্ধ্যান প্রায় দেখিয়া পরাধীন বারবনিতার কোলে পুণ্যভূমি তখন শায়িত-দশায় তন্দ্রাভিভূত হইল। করুণানিধি কৃষ্ণের প্রাণ কাঁদিল! লীলাভূমির প্রিয় জীবগণের ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য শক্তিত্রয়কে গায়করূপে স্বভাব-সুন্দর অভিনব-ব্রজ গৌড়-মণ্ডলে প্রেরণ করিলেন।

প্রথম গায়ক শ্রীজয়দেব, দ্বিতীয়-তৃতীয় গায়ক শ্রীচণ্ডিদাস ও শ্রীবিদ্যাপতি। কিন্তু জাগিল না দেখিয়া নিজজন সহ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে করুণানিধি গৌড়মণ্ডলে শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। মূচ্ছিত ভারত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-সমাগমে সংজ্ঞালাভ করিল। অমনি সেই বিমল-দীপ্তিতে সকলে দেখিল, সবার আমি, আমি সবার;—সকলকে আমার করিতে হইবে, সকলে আমার হইবার একমাত্র উপায় কৃষ্ণভক্তি। যে কৃষ্ণভক্তি করে, সে চণ্ডাল হইলেও আমার বান্ধব; কৃষ্ণভক্তিহীন মাতাপিতাদি শত্রু ভিন্ন কিছুই নয়। এই মহা উত্তেজনা-বলে ভারত স্বাধীন হইবার পথে উঠিল। অমনি শ্রীরূপ-সনাতন-জীব

প্রভৃতি বৈষ্ণবমূর্ত্তি, শ্রীমাধবী-মীরা প্রভৃতি বৈষ্ণবীশক্তি-মূর্ত্তি ভারতে ঘরে ঘরে দেখা দিল। কিছুদিন খুব বৃন্দাবনলীলা চলিল। নাই জ্ঞান চর্চ্চা, কৃষ্ণভক্তিহীন বিদ্যা-জ্ঞানের মুখে ছাই! কৃষ্ণভক্তিহীন জ্ঞানীর সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী গর্জ্জনপূর্ব্বক কহিলেন—চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছদে প্রকাশ, যথা—

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক-জ্ঞান।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান॥"

কিন্তু কিছুদিন পরে বৃন্দাবন-চন্দ্রমা লুকাইল দেখিয়া পাষণ্ড পেঁচককুলের কুটনীতি চীৎকারে কর্ণ বধির হইতে লাগিল। অন্ধকার হেতু অলসতা বশে অনেকে শয়ন করিল; সেইজন্য স্বাধীনতার পথে উঠিয়াও পরাধীন রহিল। নিকুঞ্জমণ্ডিত গিরি-দ্রোণী হইতে কেহ কেহ বৈষ্ণবীয় মণিপ্রদীপ হস্তে জাগাইতে চেষ্টা করিলেন। সেই মণি প্রদীপ, যথা—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥"

ইতি শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা, নবম অধ্যায়।

চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শপচাধমঃ॥
আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

ইতি পদ্মপুরাণ।

গীতাতে করুণানিধি অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে সখা! আমার ভক্তি এমনই প্রভাবশীলা যে, মহাপাপকারী এক মনে আমাকে ভজন করিলে তাহার বলে সে সাধু নামেই বিভূষিত হয়—ইহা সম্যক্ প্রকারে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। পাপকার্য্যহীন জনেরা আমার ভক্তি-বলে যে সাধু হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! কৃষ্ণভক্ত নীচ চণ্ডালাদি জাতি উচ্চ বর্ণাপেক্ষা উত্তম। কৃষ্ণভক্তিহীনেরা উচ্চবর্ণ-জাত হইলেও তাহারা নীচবর্ণাপেক্ষা অধম। পূজার মধ্যে বিষ্ণু পূজাই শ্রেষ্ঠ; এবং তাহা অপেক্ষা বৈষ্ণব-পূজা শ্রেষ্ঠতর; যেহেতু ভক্তপূজা ভিন্ন ভগবানের অনুভব কিছুতেই হয় না। এই শ্লোক দুইটি পদ্মপুরাণে শ্রীশিব দেবীকে কহিয়াছেন। এই সকল শ্লোকের ভাষা-প্রতিধ্বনি উঠিল—

" মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ-ভজে।
শুচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে॥" ইত্যাদি।

এইরূপ কত মণিপ্রদীপ মোহ-অন্ধকারের মধ্যে কৃষ্ণভক্তগণ প্রকাশ করিয়া পথ দেখাইতেছেন, তবু মূঢ় জীব সুপথে চলিতেছে না; এই চিন্তা হইতে শ্রীবৃষভানুপুরে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর শ্রীচরণতলে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাই প্রবন্ধমালিকাকারে প্রকাশ করিলাম। এই সূচনা-চম্পাক-পুষ্পপুঞ্জ সুমেরুর ন্যায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণকরুণানিধি কুসুম-মালার সুষমা-গৌরব-রক্ষাকারীরূপে স্থাপিত হইল।

আর্য্যঋষির বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুসারে মানবের চারিটি ভাগ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই নাম ধরিয়াছে; কিন্তু ইহা কি আকার-গত বৈষম্যে না গুণ-কর্ম্ম বৈষম্যে? বিচার করিলে জানা যায়, গুণকর্ম্ম বৈষম্যে এই পৃথকত্ব। অর্থাৎ সুন্দর-আকারে উচ্চ জাতি সূচিত হয় না। শ্রীমান্ সুত গোস্বামী সুন্দর গুণের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন

বলিয়া, নৈমিষারণ্যে ষাটি হাজার ব্রাহ্মণ ঋষিগণ সমীপে উচ্চ ব্যাসাসনে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবৎ ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই রহস্য বিশেষরূপে জানাইবার জন্য বৈষ্ণব ধাম অনন্ত বলরাম স্থতকে সংহার-ছলে নিত্যানন্দ-ধামে পাঠাইয়া, স্থত-হত্যাতে 'ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইয়াছে' ইহা ঋষিগণের বদন হইতে প্রকাশ করতঃ সৌতিকে ব্যাসাসন দিলেন এবং পাপক্ষালন হেতু তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কুরুবংশ ধ্বংসের লৌকিক সুযোগ করিলেন। আহা হলপাণি শ্রীবলদেবের 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়'—এই আচরণ-শিক্ষা মায়ার দাস স্বার্থান্ধ মানুষ গ্রহণ করিল না! এখনও সেই কাকরবের ন্যায় কর্ণ জালাকর বিকট-নীতি চীৎকার। যে শূদ্র, সে সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাতা, সত্ত্বগুণী কৃষ্ণ-ভক্ত হইলেও শূদ্র বা বর্ণসঙ্কর; ব্রাহ্মণ নিরক্ষর মৎস্য-মাংস-ভোজী দস্যু হইলেও—"ঢাল নাই, তরবার নাই, নিধিরাম সর্দ্দার"—তবু সে ব্রাহ্মণ। কিন্তু এই নিধিরাম সর্দ্দারকে সর্দ্দার রাখিলে যে শত্রুর হাতে প্রাণ দিতে হইবে বা হইতেছে, তাহা কেউ ভাবিতেছে কি? কেহ কেহ বলিল কালো রঙ শূদ্রের, গোরো রঙ উচ্চ বর্ণের বা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির। এই বিচার শুনলে, হাসি আসে—চোখ দিয়ে জলও পড়ে। জ্যোতিষ মতে যে বর্ণ বিচার তাহা জাতিগত পার্থক্য রাখে না। তাহার মতে সর্ব্বজাতিতে সর্ব্ববর্ণের উৎপত্তি, তিথি-নক্ষত্র-ঋতুভেদ সুচিন্তা-কুচিন্তা-ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির দ্বারা সংঘটিত হয়। অতএব জ্যোতিষের বর্ণ-বিচার যথার্থ, এবং সকলেরই প্রাপ্য। যারা রূপ নিয়া জাতীয় প্রার্থক্য সুচনা করে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানহীন জানিবে। সত্ত্বগুণের আচরণে সাত্ত্বিকী জ্যোতি বা ব্রহ্ম-জ্যোতি; এইরূপে রাজসিকী-তামসিকী জ্যোতি সর্ব্বরূপের মধ্যে বিকাশ প্রাপ্ত হয়—ইহা চির স্বতঃসিদ্ধ।

অতএব কালো বর্ণের ব্রাহ্মণ হয় না, গোরো বর্ণের শূদ্র হয় না, —এ সিদ্ধান্ত সবিশেষ ভ্রান্তিপূর্ণ। গোরা-রঙ ধরিয়া ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য বিচার বড়ই অন্যায়। এই বিচার যারা করে, সেই রূপের মাতাল অন্ধদিগকে আমি বলি, "নিকটে ওই যে চর্ম্মকারের কন্যা বা চর্ম্মকার পুত্র পরম সুন্দর, তাহাকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য সমাজ কেন গ্রহণ করিতেছে না?" ইহার উত্তর কেউ দিবে না! যদি কেউ না দাও, তবে আয্যঋষির সেই সত্য-নীতিপূর্ণ উপদেশ সকলে সাদরে গ্রহণ করো; উচ্চ গুণে উচ্চ কর্ম্মে উচ্চ জাতি। নীচ গুণে নীচ কর্ম্মে নীচ জাতি। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র গুণ প্রত্যেক মানবের ধর্ম্ম; জাতিগত ধর্ম্ম নয়। ব্রাহ্মণ-গুণ ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা-তপস্যা ইত্যাদি—সেও তোমাকে করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়-গুণ—শত্রু-পরাজয় দেশরক্ষা ইত্যাদি। ষড়রিপু—এই ছয় শত্রু জয় পূর্ব্বক বাধ্য করিয়া তোমার দেহ-দেশকে রক্ষা করিতে হইবে। বৈশ্য-গুণ—বাণিজ্য, গোপালন ইত্যাদি। তোমাকে ভগবৎ প্রেমের বাণিজ্য ও 'গো' শব্দে 'ইন্দ্রিয়', তাহাদিগকে সংযতভাবে রাখিতে হইবে। শূদ্রের কার্য্য সেবা। তোমাকে কথিত গুণ সমূহকে পূজা বা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে হইবে। বুঝিলে? তোমার ভিতরে সেই মুখ, বাহু, উরু, চরণ রহিয়াছে। করুণানিধি কৃষ্ণ জানাইতেছেন, "প্রত্যেকের কাছে, সেই ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্ব রহিয়াছে। আমার উপদেশ মানিয়া আমাকে পূর্ণভাবে আশ্রয় করো; তোমাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সব প্রতিপালিত হইবে। নতুবা মৎস্য-মাংস ভোজী স্বার্থপর ঘাতক হইয়া যজ্ঞোপবীত কণ্ঠে ধরিলে তুমি সেই চণ্ডাল ভিন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কিছুই নও।" যদি বল, "পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয় রাজগণ মৃগয়া করিয়া জীবহত্যা করিতেন, মাংসাদিও ভোজন করিতেন, আমরা এসব করিলে দোষ পাই কেন?" ইহার

উত্তর প্রবন্ধের মধ্যে পাইবে। প্রথমেও একটু মাত্র বলি—ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয় রাজগণ সাধু, ধর্ম্ম ও দেশকে অসভ্য-প্রকৃতি বা রাক্ষস-জীবগণের হাত হইতে রক্ষার মানসে আসুর ভাব জাগাইবার জন্য, বেদজ্ঞ ঋষিগণের আদেশে বিধানানুসারে এই সব জীবহত্যাদি করিতেন; যেহেতু অসুর না সাজিলে অসুর দমন হয় না। ইহাতেও তাঁহাদের পাপনাশ জন্য শেষে তপস্যাদির বিধান ছিল। তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণকে, ঈশ্বর-স্বরূপ জ্ঞানে ভক্তি ও ভয় করিতেন এবং দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে আর মাংসাদি স্পর্শ করিতেন না। রাজার রাজসিক রাজধর্ম্মে ইহাতে দোষ নাই। তুমি রাজা নও, কৃষ্ণভক্তকেও মান না, দেশের সর্ব্বনাশ দূর না করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়া সুখী হও, তুমি অবিধানে নিত্য মাংসাদি ভোজন করো, অতএব অনিয়মিত-ভাবে পশু হত্যা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহকারী নীচ ব্যাধ ভিন্ন তুমি উচ্চ জাতি কখনই নও। সাত্ত্বিক ভোজনের বিষ্ণুতেজ, পরশুরাম-রূপে রাজসিক-আসুরভাবে উন্মাদ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-বধে দেখাইয়াছি, তাহা কি জান না? নীচ জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা হয়, নীচ কার্য্য করিতে লজ্জা হয় না কেন? নীচ কার্য্য কাহাকে বলে শুনো। ভক্তি ত্যাগ করিয়া অনিয়মিতভাবে দেহ-পোষণ-জন্য জীবহত্যা, ছল-কপটতাপূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন, পরের সুখ সহ্য করিতে না পারা, পরকে দুঃখ দিয়া বুদ্ধিবলে নিজে সুখী হইতে চেষ্টা, এবং মহাজনের আচরিত ধর্ম্ম গ্রহণ না করা, এই সব নীচ কার্য্য। এই সব ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভক্তের কথিত ভক্তি ধর্ম্ম যাজন করো, উচ্চ জাতি বলিয়া ঢক্কা (ঢাক) বাজাইতে হইবে না; সকল সংসার আপনা হইতেই তোমাকে উচ্চ বলিয়া নতশীর্ষে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতার্থ হইবে। তুমিও মহানন্দে প্রেমাশ্রুলোচনে, "আমি দীন চণ্ডাল" এই

নীচতা স্বীকার করিয়া চির-উচ্চ-সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবে। অতএব এইরূপে উচ্চ বা উচ্চ-জাতি হইতে হয়। তুমি ভুল করিয়া মিথ্যা কপটতা পূর্ব্বক কেন নরক-সংসার করিতেছ! কৃষ্ণভক্ত হইয়া সত্য সংসার করো। কৃষ্ণভক্ত না হইয়া উচ্চ হইতে চেষ্টা করিলে তোমার সর্ব্ব আশা নষ্ট হইবে। শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি না করিয়া মূঢ় শূদ্র উচ্চ হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিল বলিয়া, প্রভু কৃষ্ণ স্বহস্তে তাহার মস্তক ছেদন-পূর্ব্বক আসুর-মুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু দণ্ডকারণ্যে কঠোর তপস্যাহীনা ভক্তিপরায়ণা শবর কন্যার উচ্ছিষ্ট বদরী-ফল ভোজনপূর্ব্বক জাত্যাভিমানী ঋষি অপেক্ষা সে অনেক বড়,তাহা জগৎ সকাশে প্রকাশ করিয়াছেন। করুণানিধির সেই রাম অবতারের উচ্চ আদর্শ দর্শন করিয়া কেন তাঁহার ভক্ত সাজিতেছ না? শাস্ত্রযুক্তি না মানিয়া, কৃষ্ণের ভক্ত না হইয়া, যতই বড় বলে অভিমান করো, সে তোমার বড় হওয়া নয়, নীচ পথে যাইবার স্বার্থপর কুহক মাত্র! যে সব মূঢ় জীব, ধর্ম্ম ব্যাধের দৃষ্টান্তে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব মহাজন দিগকে ত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্ম-ব্যাধকে গুরু করে, তাহাদিগকে করুণানিধি কৃষ্ণ জানাইয়াছেন যে—ধর্ম্মব্যাধ ব্যাধকুলজাত, সৎসঙ্গের প্রভাবে যখন তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হ'ন, তখন তিনি সত্ত্বগুণী মৎস্যমাংসাদি ভোজন ত্যাগপূর্ব্বক নিরভিমানে মাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, এবং মাতাপিতাকে দেবদেবীর ন্যায় পূজা ও অতিথি-সৎকারাদি করিতেন; সর্ব্বোপাধি মুক্ত, সব ছাড়িয়া কৃষ্ণভক্তকে আপন জ্ঞান, নিজে ভক্ত সাজিয়া কৃষ্ণসেবাধর্ম্ম তিনি যাজন করেন নাই, এই হেতু তিনি ধ্রুব-প্রহ্লাদের ন্যায় উচ্চপদ বা ঋষিপদ সে জন্মে প্রাপ্ত হন নাই; 'ধর্ম্মব্যাধ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন, ধর্ম্ম-ঋষি বা জীবন্মুক্ত মহাভাগবৎ হইতে পারেন নাই। যেহেতু ধর্ম্ম-ব্যাধের

পূর্ণমুক্তি বৈষ্ণবঋষিগৃহে জন্মগ্রহণ করিলে হইবে—ইহা শাস্ত্র নির্দ্দেশে জানা যায়। এখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সর্ব্বোপাধি-বিনির্মুক্ত কৃষ্ণসেবা রূপ মহাজন-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কে এই ধর্ম্মব্যাধকে গুরু করিয়া ধর্ম্মব্যাধ সাজিতে ইচ্ছা করে? ক্রোধের দাস দুর্বুদ্ধি বক ভস্মকারী তপস্যাভিমানী ব্রাহ্মণ বালক গৌতম, ধর্ম্মব্যাধকে গুরু করিয়া সংসারি সাজিয়াছে বলিয়া, সত্য-সংসারে অবস্থিত, জীব-দুঃখে ব্যথিত হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের দাস বৈষ্ণব ঋষিগণ বা তাঁহাদের অনুগামিগণ তেমন সংসারী হইবেন না। তৎকালে কোন ঋষি তপস্যাদি ত্যাগ-পূর্ব্বক ধর্ম্মব্যাধের মাংস বিক্রয়াদি কার্য্যও করেন নাই। যারা ব্যাধের কার্য্য করে, মুখে পরিচয় দেয় ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় প্রভৃতি, তাহারা বিবেচনাহীন হইয়া এই সব গল্প দ্বারা নিজের পাসণ্ড দল সৃষ্টিপূর্ব্বক নরক ভোগের পথ পরিষ্কার করিতেছে।

হে করুণানিধে! সকলের চক্ষে দৃশ্যমান্ হও। নয় সব যাক্—তুমি থাক আর আমি থাকি! সব যদি আমার বিপক্ষ হয়, আর তুমি যদি আমার সপক্ষে থাকো, তবে জান্‌ব আমার সব আছে। আর তুমি যদি আমার বিপক্ষ হও, সব যদি আমার সপক্ষে থাকে, তাহলে জান্‌ব আমার কিছুই নাই! প্রকাশ হও! নীলাকাশে চাঁদের ন্যায়, বৃন্দাবনচন্দ্রমা! সকলের নেত্রে প্রকাশ হও! কুঞ্জে কুঞ্জে তোমার বাঁশীর গান, গৃহে গৃহে তোমার ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ লীলাগান, মৃদঙ্গ-সপ্তস্বর-যন্ত্র-করতাল বংশীধ্বনিসহ প্রতিধ্বনিত হইয়া সর্ব্বজ্বালা দূর করুক! সর্ব্বমানব এক মনে এই গান কণ্ঠে রাখুক।

যথারাগেন গীয়তে

আশ্রয়ামি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-স্বরূপম্ ।

নিরুপাধি-মুক্তং রাসকেলী-যুক্তং
সমুজ্জ্বল সার- মবতারী-স্বরূপম্ ॥
একার্ণব-নীরে পৌরষ-বিহারে,
যোগ-নিদ্রা-ধৃতং নারায়ণ-পুরুষম্ ।
নাভি-সরোবরে, সরোসিজোদরে
পিতামহ-ব্রহ্মা, জাত-লোককারণম্ ॥
সর্ব্ব-বীজ-হেতুং তাপ-নাশ-কেতুং
নারায়ণ দেব- মবতার নিধানম্ ।
নিজাংশ-কলয়া, বিশ্ব রচিতয়া,
দেবতা-তির্য্যগ মানবাদি-জনকম্ ॥
প্রথমাবতারে ভূমি-দেবাকারে
সনক-সনন্দ সনৎ-সনাতনম্ ।
পদ্মজ-মনসি, দুস্তর তপসি,
স্থিত-ধৃত-ব্রহ্ম, ত্রিভুবন পূজিতম্ ॥
রসাতল-গতা, ধরা-বিচলিতা,
শূকরস্বরূপং বসুন্ধরোদ্ধরণম্ ।
তৃতীয়াবতারং দেবর্ষি-স্বরূপং
শ্রীহরি মানসং পঞ্চ-রাত্র কথকম্ ॥
চতুর্থাবতারে ধর্ম্মজায়োদরে
নর-নারায়ণং তপ-সুখ-সাধনম্ ।
পঞ্চমাবতারং কপিল-স্বরূপং
চাসুরি নামিনে সাংখ্য—তত্ত্ব-কথিতম্ ॥

| | |
|---|---|
| ষষ্ঠমাবতারে, | অনসূয়াগারে, |
| দত্তাত্রেয়রূপ | মাত্ম-বিদ্যা প্রকাশম্। |
| সপ্তমাবতারং | যজ্ঞনামধরং |
| চাকুতি-মাতরি | রুচি-ঋষি-তনয়ম্॥ |
| অষ্টমে ঋষভং | মেরুদেবী-সুতং |
| নাভি-পুত্র-বরং | পরম-হংস ধর্ম্মম্। |
| নবমাবতারং | পৃথু-নাম-ধরং |
| পৃথিবী-দোহনং | কমনীয়-শোভনম্॥ |
| সমুদ্র-প্লাবনে, | নিস্থল-ভুবনে |
| মীন-রূপ-ধরং | বৈবস্বত-রক্ষিতম্। |
| মন্দর-ভূধরং | পৃষ্ঠ-পর-ধরং |
| সমুদ্র-মন্থনে | কমঠাব-তরণম্॥ |
| দ্বাদশাবতারং | ধন্বন্তরি-রূপং |
| ত্রয়োদশে মোহং | মোহিনী-নারী-রূপম্। |
| চতুর্দ্দশে রূপং | ভীষণ নৃসিংহং |
| সভক্ত-সুখদং | দৈত্যোদরদারণম্॥ |
| পঞ্চদশে হ্রস্বং | কিমপি সুদীর্ঘং |
| ত্রিলোক-ব্যাপকং | ত্রিপাদ-সু-পারকম্। |
| বলি-বন্ধ-করং | গৃহ-বন্ধ-হরং |
| বামনাবতারং | চারু-শোভা-শোভিতম॥ |
| ষোড়শাবতারং | ভৃগুকুলপালং |
| ত্রিসপ্ত-প্রতিজ্ঞং | নিঃক্ষত্রিয়কারকম্। |
| ততো সপ্তদশে, | সত্যবত্যাকাশে, |
| জ্ঞান-প্রভাকরং | বেদ-ব্যাস-নামকম॥ |

অষ্টাদশেরূপং রামরঘুভূপং
সেতুবন্ধকারং সুর-সুখ-দায়কম্ ।
ঊনবিংশো বিংশং যাদবাবতংসং
রাম-কৃষ্ণরূপং ধরা-ভার-হারকম্ ॥
[illegible] াবং গোকুলবিহারং
বৃন্দাবনচরং মহামুনিকথিতম্ ।
কলি-সম্মিলনে ন্নসভা-মোহনে
বুদ্ধরূপধরং হত্যা-যজ্ঞ-দলনম্ ॥
দ্বাবিংশাবতারং কল্কি-কলি-গতং
ধৃতাসি পত্রকং দস্যু-কুল-দলনম্ ।
হ্যসংখ্যেয়-রূপ মকথামনুপং
শ্রীগৌরাঙ্গ দেবং যেনাপি সুপ্রকাশম্
পুলিনবিহারী- দাস কৃত স্তোত্রং
ত্রিসন্ধ্যা -পঠনে সর্ব্ব-সুখ দায়কম্ ।
গীয়তাং শ্রূয়তাং সাধুনাং সাত্বতাং
দ্বাবিংশাবতারং সর্ব্ব-দুঃখ-নাশনম্ ॥

"বৈষ্ণবীয়-সিদ্ধান্ত-পথ-প্রদর্শনে সমুজ্জ্বল-প্রদীপ-স্বরূপ চৈতন্য-চরিতামৃত-ভাগবতাদি গ্রন্থ ভারতের গৃহে গৃহে স্থাপিত হউন; এবং অক্ষর-ব্রহ্মরূপে স্বকৃপায় অবতীর্ণ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রবণ-পঠন-সেবা হইয়া নিত্য সুখ-রাজ্যের পন্থা প্রদর্শন করুন।" "হা কৃষ্ণকরুণানিধি" বলিয়া জীবের প্রাণ কেঁদে উঠুক। আবার সেই শ্রীগৌরাঙ্গের আচরিত কর্ম্মাবলী জীবগণ অনুসরণ-পূর্ব্বক ব্রজের পথে কৃষ্ণ বলে কেঁদে চলুক"—এইসব চিন্তা হইতে এবং "কৃষ্ণভক্তিহীন শাস্ত্র গ্রন্থাদি জীবের ত্রিতাপ জ্বালা দান করে" তাহাই জানাইবার মানসে

প্রাণবন্ধু শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় শ্লোক অভিধা-অর্থের দ্বারা কৃষ্ণ-করুণানিধি প্রবন্ধ-গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। কেন করিলাম, কে করিল, তা জানি না; তবে শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সেই চির নব মধুর ভাষার দ্বারা তাহার উত্তর এই—

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥"

কিন্তু শেস বক্তব্য এই যে এই কৃষ্ণকরুণানিধি প্রবন্ধ আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ও জীবন-মরণের সহচর; যেহেতু ইহারই দ্বারা আমি আমার শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় নির্ণয় করিয়াছি। সেই নির্ণয় যুক্তিতে কোন ভজনানন্দ-বৈষ্ণব-মহাত্মা যদি ভজন-বিরোধ-রীতি লক্ষ্য করেন; তবে তাঁহার যুক্তিকে মুখ্য ভাবে রাখিয়া আমার যুক্তিকে গৌণ-ভাবে রাখিবেন। ইহাতে সেই কৃষ্ণ ভজনানন্দ মহাত্মার উপর কেহ যেন দোষদৃষ্টি না করেন।

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণকরুণানিধি প্রবন্ধ-গ্রন্থে সূচনাধ্যায়।

# শ্রীশ্রীকৃষ্ণকরুণানিধি।

## শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

## পূর্ব্বার্দ্ধ প্রারম্ভ

যিনি নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তন্মায়ায় মুগ্ধ জীবের বহির্মুখতা প্রদর্শন পূর্ব্বক যিনি সংসার জ্বালায় দহ্যমান জীবের সুখবিধানার্থ বেদ পুরাণাদি গ্রন্থ প্রকাশ, দুষ্ট দলন, সাধু পালন, ধর্ম্ম স্থাপন জন্য যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করিতেছেন, সেই সচ্চিদানন্দ করুণানিধি কৃষ্ণের সদাই জয় হ'ক্। যিনি মহাজন ভাব্য সুমধুর-ব্রজলীলা কালীন কালীয়-বিষপানে ত্যক্ত-জীবন ব্রজবাসী-রাখাল-বালক ও গোবৎস দেখিয়া ভাবিলেন—"আমার ভক্তগণ যখন মৃত তখন আর কাদের সঙ্গে সাধের ব্রজলীলা করব"—এই ভাবিয়া অমৃতবর্ষিণী-দৃষ্টিতে যিনি তাঁহাদের জীবন দান করিয়াছেন, পাপিয়সী পুতনা কপট-মাতৃস্বসা-বেশে যাঁহার নিকট গমন করিলে যিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মৎসম্বন্ধী কপট-ভক্তিও উত্তম ইহা জানাইবার জন্য পুতনার কোলে বালকের মত শয়ন করিয়াছিলেন, ধাত্রীর গতি দিয়াছিলেন সেই প্রাণবন্ধু করুণানিধি কৃষ্ণের সদাই জয় হ'ক। যিনি সম্প্রতি কলিযুগে গৌরাঙ্গরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ পূর্ব্বক আচণ্ডাল ব্রাহ্মনাদি-সীমাবদ্ধ মানবমণ্ডলীকে—"ঈশ্বরের কাছে সকলে সমান,

জীব তুমি মায়ার দাস হয়োনা, মায়ার দাস হয়ে নীচে পড়েছ, নীচ হয়েছ, কৃষ্ণের জীব তুমি কৃষ্ণের দাস হও, উঁচুতে উঠ্‌বে ; সকলেই উচ্চ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতে পারিবে, এই নীতি প্রচার করতঃ কৃষ্ণ ভক্তিই মানবের মানবত্ব দানের প্রধান উপায়, কৃষ্ণ ভক্তের আসন সকলের উপরে কৃষ্ণ ভক্ত সমদর্শী ভেদাভেদ জ্ঞান রহিত এবং সমগ্র সুধীজন প্রিয়, এই সুমতি বংশী বাদন দ্বারা যিনি সংসার কাননের মায়া-মরিচীকা-ধাবমান-মরণোন্মুখ জীবকুলকে শ্রীকৃষ্ণ ভজন রূপ চিন্ময়-শস্য-শ্যামল-সুজল-প্রান্তরের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন, সেই ভক্ত বৎসল করুণানিধি অখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বামী কৃষ্ণের সদাই জয় হ'ক্।

ইহা শ্রীবৃন্দাবনস্থ পূর্ব্বকালে যাঁহারা ঋষি, তপস্বী, মুনি পদবাচ্য, এবং বর্ত্তমানকালে যাহারা সর্ব্বোপাধি শূন্য নিরভিমান কৃষ্ণ দাসানুদাস বৈষ্ণব নামে প্রকীর্ত্তিত তাঁহাদের সমালোচ্য নিত্যসুখদায়ক ভুবন পাবন উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ মহিমাসূচক প্রবন্ধ। হে সংসার-তাপ-তাপিত জীবকুল! সর্ব্ব বেদান্তের সার স্বরূপ নিত্য সুখলাভের প্রধান উপায় তোমাদের সকল দুঃখ অবসানকারী কৃষ্ণ করুণানিধি নামক প্রবন্ধ পাঠ শ্রবণ পূর্ব্বক সর্ব্ব সুখে সুখী হও। গৌড়ীয় ভারতি! শতদল-বিমল-অঙ্গে রাধা-কৃষ্ণ লীলাকথারূপ হেম মরকতমণির অলঙ্কার-ধারণ-পূর্ব্বক কান্তি-কৌমুদীতে অজ্ঞান-তমঃ নাশ করিতে করিতে সর্ব্বদা রসনা কমলাসনে অবস্থান করো। কৃষ্ণ-ভক্তি-সৌরভ যাহাতে বর্ত্তমান, ক্ষুদ্র বৃহৎ বাক্যবিন্যাস যাহার কুসুমাবলী, শ্রীমদ্ভাগবত কথিত যুক্তি যাহার গ্রন্থন সূত্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণ করুণানিধি যে প্রবন্ধহারের নাম, সুধী ভক্তবৃন্দ যাহার গ্রাহক, সর্ব্বামঙ্গলরূপ পূতি গন্ধ নাশক, রাধা-গোবিন্দ সেবানন্দ মধুতে মনতৃপ্তিকারী এই কৃষ্ণকরুণানিধি প্রবন্ধ-হার ব্রজবাসী-ভাব-মত্ত বৈষ্ণববৃন্দের কণ্ঠদেশ চির সুশোভিত করুক।

জগৎ শিক্ষাগুরু, ভাগবত কুসুম কাননের নিত্য মালাকর, যে মহাজন বৃন্দের প্রদর্শিত মার্গ সমাশ্রয় পূর্ব্বক আমার এই মালা গ্রন্থনে প্রবৃত্তি সেই রাধাগোবিন্দ গত প্রাণ শিক্ষাগুরু সেই গোস্বামী পাদবর্গ চির জয়যুক্ত হইয়া অজ্ঞানতিমির নাশ করুক। আমাদের অন্তর ধন্য হইবার জন্যই এইভাবে প্রার্থনা করুক—

জয়রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্টদাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোঁসাইয়ের করু চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোঁসাই যবে ব্রজে কৈলেন বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ॥
এই ছয় গোসাই যাঁর তাঁর মুই দাস।
তা সবার চরণ রেণু মোর পঞ্চ গ্রাস॥"

রাজর্ষি পরীক্ষিত যিনি কৃষ্ণগত প্রাণ, যিনি মাতৃগর্ভে অশ্বথামার ব্রহ্মতেজাস্ত্র দহ্যমানকালে মাতার কাতর ক্রন্দনে আহুত করুণানিধি কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র বিধ্বস্ত, ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা পাইয়া ভুবনমোহন সুখদাতা শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করতঃ তাঁহার চরণে মনপ্রাণ সমর্পন করিয়াছিলেন সেই ভক্ত প্রবর চন্দ্রকুলচন্দ্রমা ব্রহ্মশাপ ছলে সসাগরা ভারত রাজ্য ত্যাগ পূর্ব্বক একান্তমনে কৃষ্ণকথা শ্রবণ বা কৃষ্ণ ধ্যানের এই প্রধান সুযোগ জানিয়া অনশনে গঙ্গাতীরে বসিয়াছিলেন; আহা! আমার করুণানিধি কৃষ্ণ এমনই মধুর বটে! শ্রীমদ্ভাগত গ্রন্থ আজ সকল মানবকে এই জানাইতেছেন, মানবগণ! তোমরা যে অসঞ্চিত অর্থ পাবার আশায় চুরি ডাকাতি মিথ্যা প্রবঞ্চনা

করছ, যে অর্থকে কতই না সুখের নিধি মনে করে হস্তগত করবার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলছ, মাতাপিতাকে তিরস্কার, নির্ব্বাসন, সহোদর ভাইয়ের বুকে অস্ত্র বসাতে উদ্যত হচ্ছ, শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন কৃষ্ণ ভক্ত রাজর্ষি পরিক্ষীত হাসিতে হাসিতে সেই অর্থ-সম্পদ্ (দু চার লাখ টাকা নয়) সসাগরা ভারত রাজ্য মলমূত্রবৎ ত্যাগ করিয়াছেন। কৃষ্ণ আমার এমন সুন্দর, এমন সুখদাতা তাঁকে পেলে যে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের অধিপত্য সুখ আনুসাঙ্গিক ফলের মত পাওয়া যায়। যেমন প্রদীপ জ্বালার উদ্দেশ্য বস্তু দেখ্‌বার জন্য —আনুসঙ্গিক ফল সর্পাদি ভয় নিবারণ শৈত্যাদি বিনাশ প্রভৃতি, আপনা হ'তে এসে যায়, সেইরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি করুণানিধি কৃষ্ণের দাস যাঁরা—তাঁরা রাজ্যভোগাদি সুখ না প্রার্থনা করলেও আপনা হ'তে তাঁদের কাছে কতশত এসে যায়। যে সুখ আপনা হতে আসে ভিখারীর মত যে অর্থ নারী সম্ভোগাদি সুখ, ওহে কৃষ্ণ ভক্ত তুমি আমায় গ্রহণ করে কৃতার্থ করো, বলে প্রার্থনা করে, তাদের জন্য ভিখারী সাজে মনুষ্যরূপী পশুরা! এই জন্য কোন কৃষ্ণভক্ত ভাবুক সংসারমদমত্ত পাগলা হাতীর মত) অঙ্কুশের আঘাতে যে গন্তব্য স্থানে গমন করে না) তার তুল্য মানুষকে দেখে ঠিক যেন তার মত হয়ে এইরূপ মানুষ পশুর প্রায় বলিয়া ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক করুণানিধি কৃষ্ণের কাছে কাঁদিতেছেন ;—

অন্ন জল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই
আছি যেন মোরা পশু পাখী হে।

সত্যইত! আহার-বিহার নিদ্রা-মৈথুন, এত পশু পাখীদের আছে। মানব! তুমি মানব হয়ে যদি এ বিষয়ে মগ্ন থাকলে, তবে

পশু পাখী হতে তোমার উচ্চতা কোথায়? তোমার উচ্চতা আছে কৃষ্ণের সঙ্গে ভক্ত সম্বন্ধে। সেই ভক্ত সম্বন্ধ কর, তুমি উচ্চ হইবে। নতুবা অতি নীচ পশু ভিন্ন তুমি আর কিছুই নও। কোথায় মানব তুমি বিশ্বপতি ভগবানের সকল জীবকে আপনার মত জেনে কৃষ্ণের কাছে নে যাবার জন্য প্রার্থনা করবে, কৃষ্ণ নাম শুনাবে, না তার পরিবর্ত্তে বাঘ ভালুকের মত, কৃষ্ণদাস পরিবর্ত্তে কাম-ক্রোধ-হিংসা প্রভৃতির দাস তুমি নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কাহাকে কাহাকে পীড়ন কাহাকে সংহার করবে বিচার করে দেখদেখি, যে করুণানিধি কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের ঘরে যে চাঁদের আলো, নীচ চণ্ডাল বলে যাকে ঘৃণা করো, তার ঘরে সেই চাঁদের আলো দিয়েছে সেই প্রেমময় গোবিন্দের দাস না "আমি বলবান, ওকে সংহারপূর্ব্বক ওর মাংসের দ্বারা আমার শরীরকে পুষ্ট করব" এইরূপ বাসনাকারী ওই বন্য পশু বাঘ ভালুকের দাস! পশুর দাস পশু ভিন্ন কোন্ পদ বাচ্য হইতে পারে? মাছ খায় যারা তারা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুক্ দেখি মনুষ্য জনম লইয়া মাছ খাইয়া আমরা কাদের স্বভাবের অভিনেতা হইতেছি। ঠিক ওই চিল কাকের স্বভাবের নয় কি? চিল কাক যেমন মাছ খাইল আর তার কাঁটাগুলো এক যায়গায় ফেলিয়া দিল বা রাশি করিয়া রাখিল, মাছ-খেকোরা ঠিক তাদের ন্যায় ভোজন পাত্রের কাছে সেই রূপ মাছের কাটা রাশি করিয়া রাখে না কি! আহা! ইহা দেখিয়া ভ্রান্ত জীবের কি একটু জ্ঞান আসে না যে এমন সাধের মানুষ জনম পাইয়া মানবের কর্ত্তব্য যে "জীবে দয়া" তাহা না করিয়া যখন চিল কাকের মত "আমি যেমন চলৎ জীব তেমনি মাছ প্রভৃতি চলৎ জীবকে, নিজের দলের জীবকে যখন মারিয়া খাইতেছি,—তখন যে যে ভাবের সদাই অনুসরণ করে, তাহাকে সেই ভাব সংঘটিত হয়, অতএব আমি

পরজন্মে ওই চিল কাক হইব, সাধের মানব জনম আর পাইব না! মাংস ভোজীরা মাংস খায়, ভোজন পাত্রের ধারে কতকগুলা হাড় রাশি করে, ইহা দেখিয়া তাদের এ জ্ঞান আসে না যে, শ্মশানে শৃগাল কুকুর আমাদের মৃত শিশু পুত্রকন্যা প্রভৃতির মাংস খাইয়া এইরূপ হাড় রাশি করে; অথবা মরা গরু প্রভৃতির মাংস ভোজন করিয়া শৃগাল শকুনি-প্রভৃতি অনেক যায়গায় এইরূপ হাড় রাশি করে! হায় হায় মানুষ হইয়া যদি এই শৃগাল শকুনির তুল্য ভোজন-পাত্রের কাছে হাড় রাশি করার পাঠ শিখিতে লাগিলাম, ত খাঁটি মানুষের পাঠ কবে শিখিব! কেহ রাগ করিয়া বলিবে তুমি মাছ মাংস খেকোদের যে নিন্দা করিতেছ বৈষ্ণব হয়ে, তোমার বিষ্ণু ঠাকুরের বাহন গরুড় সে মাছ খায় কেন বল দেখি? তাহার উত্তর এই—গরুড় জাতিতে পাখী; পাখী জাতির আহার প্রায়ই মাছ সাপ, কোকিল-শ্রেণীর আহার ফলাদি হইলেও গরুড় যে শ্রেণীর পাখী সে শ্রেণীর আহার মাছ সাপ প্রভৃতি, এইজন্য সে মাছ প্রভৃতি খায়। তুমি ত পাখী জাতি নও, তুমি যে মানুষ জাতি, তুমি মাছ খাও কেন? পাখী জন্মিল, তার মাবাপ, অমনি তাকে মাছ পোকা খাওয়াইতে শিখাইল। মানুষ জন্মিল, তার মাবাপ অমনি দুধ বা দুধের তুল্য জিনিষ খাওয়াইতে শিখাইল; মাছ মাংস পোকা ত খাওয়ায় নাই; তবে মানুষ মাঝখানে বড় হইয়া মাছ মাংস পোকার তুল্য জীব খায় কেন? এই তার মহা ভুল নয় কি! যাহাতে প্রথম জীবন গড়িল, বড় হইয়া তাহা ত্যাগ করাই কি মানুষের কর্ত্তব্য? কুক্কুরাদি পশু প্রথমে মাতৃ দুগ্ধ খায়, পরে মাংসাদি ভোজন শেখে, মানুষ হইয়া এইরূপ শিখিলে মানুষাকারে পশু ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? এইরূপ মানব-পশু মায়ের তুল্য নারীর কাছে যাইতে ভয় পায় না। কেননা পশুরা স্বাভাবতঃই মাতৃ-গমনকারী। আহা মানব! তোমার

একটুও কি মনে হয় না যে সকল ঠাকুরের রাজা যে শালগ্রাম বিষ্ণু ঠাকুর, তাঁর ভোগের জন্য ঘৃত দুগ্ধ আতপ তণ্ডুল ফল মূল প্রভৃতি শাস্ত্রকারের বিধান। বিশ্বপতি ভগবান যখন নিরামিষ ভোজী, তখন তুমি তাঁর দাস, পুত্র বা অংশ স্বরূপ হয়ে মৎস্য মাংস ভোজী হও কিসের জন্য। মৎস্য মাংস ভোজী হইয়া নরক ভোগ করিবার পথ তুমি কি নিজ হস্তেই প্রস্তুত করিতেছ না?

আমরা প্রাকৃত-জগতে দেখি মানুষের দাস মানুষ, মানব—মানবের সঙ্গ করে। সেইরূপ ভগবানের দাস ভগবানের মত জীব। ভগবানের মত জীব যাঁরা তাঁরা হিংসাদি ওই পশুবৃত্তি ত্যাগ করতঃ প্রেম-ভক্তিতে আরাধনা পূর্ব্বক ভগবৎ সঙ্গ করে এবং তাহা হইলে মানবত্ব সম্পন্ন হইল, নতুবা মনুষ্য শরীর ধারণ করিলেও তুমি পশু! গঙ্গাজল-রাখা সোনার কলসীতে—লবণাক্ত নদীর জল ভরে রাখ্‌লে তাকে কি গঙ্গাজল বলা যায়? সেইরূপ সোনার জন্ম ভগবৎ আরাধনাকারী মানব দেহের মধ্যে পশুবৃত্তি থাক্‌লে তাকে পশু ভিন্ন মানব বলা যায় না! মাটীর কলসীর গঙ্গাজলের আদর হয়, সোনার কলসীর লোণা জলের কেউ আদর করে না। সাংসারিক দৃষ্টিতে যিনি নীচ জাতি তিনি যদি করুণানিধি ভগবান কৃষ্ণের আরাধনা করেন তবে তিনি সর্ব্বোত্তম, ঠিক ওই মাটির কলসীর গঙ্গাজলের মত। উচ্চ কুলজাত ব্যক্তি হিংসা দ্বেষ পরায়ণ কৃষ্ণভক্তি বিহীন হইলে সে অতি নীচ সোণার কলসীতে লোণা জলের মত! শাস্ত্র প্রমাণ দিতেছেন—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা জ্ঞেয়ো সর্ব্বোত্তমোত্তমাঃ।
সর্ব্বা বর্ণেষুঃ তে শূদ্রা যে অভক্তা জনার্দ্দনে॥

অর্থাৎ শূদ্র কুলোদ্ভব যদি কৃষ্ণভক্ত হয়, সেই সর্ব্বোত্তমোত্তম।

কৃষ্ণভক্তি বিহীন হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি শূদ্ররূপে পরিণত হইবে।

এখানে শাস্ত্র প্রমাণ অনুসারে জানা যায় কৃষ্ণভক্তি বিহীন কার্য্য ( শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন বন্দন প্রভৃতি হীন হিংসাদি পরায়ণ মানব জীবিকা নির্ব্বাহ কর কার্য্য শূদ্রত্ব-প্রতিপাদনের হেতু ! ইহা সর্ব্ব-শ্রেণীর-জীবের জন্য। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত নব যোগীন্দ্র-সংবাদ-উপলক্ষে প্রমাণ দিতেছেন—

মুখ বাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষ স্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈ বিপ্রাদয়ঃ পৃথক ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম প্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাভ্রষ্টা পতন্ত্যধঃ ॥
দূরে হরি কথাঃ কেচিদ দূরে চাচ্যুত কীর্ত্তনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রা দয়শ্চৈব তে হনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্ ॥

—ইত্যাদি

যোগীন্দ্র চমস রাজর্ষি নিমিকে কহিতেছিলেন—

সেই ভগবান পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকেই চারি আশ্রম ধর্ম্ম সহিত চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণের দ্বারা তাহারা পৃথকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যাহাতে সত্ত্ব গুণ আছে তিনিই ব্রাহ্মণ, যাহাতে সত্ত্ব রজ গুণ আছে তিনি ক্ষত্রিয়, যাহাতে রজতম গুণ আছে তিনিই বৈশ্য, যাহাতে তম গুণ আছে তিনিই শূদ্র ! এই জীবাত্মা স্রষ্টা ঈশ্বরকে যাহারা জানে না বা তাঁহার সেবা পূজা করে না, এমন জীবকুল নিজ স্থান হইতে অতি জঘন্য স্থান চণ্ডালত্ব প্রভৃতিতে পতিত হয় ! অর্থাৎ কৃষ্ণ ভজন না করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যের বৈশ্যত্ব

শূদ্রের শূদ্রত্ব থাকে না। রজ তম গুণের অতীত শুদ্ধ সত্ব, ( দয়া প্রেম আনন্দ ) যাহার সত্বা এমন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই চারি বর্ণের মধ্যে যিনি কায়মনোবাক্যের দ্বারা সেবা পুজা করিবেন তিনিই সর্ব্বোচ্চ ভগবানের প্রিয় অঙ্গ বলিয়া কাত্তিত হইবেন। স্পর্শমণি সংযোগে লৌহাদি নিকৃষ্ট ধাতু কাঞ্চনত্ব প্রাপ্তির ন্যায় কৃষ্ণ সেবারত শূদ্রাদি বিপ্রত্ব লাভে পূর্ণরূপে সক্ষম হয়। কৃষ্ণ বহির্মুখী ক্রিয়া শূদ্রাদি প্রতি-পাদনের হেতু; যে কোন প্রকারে হউক না কেন কৃষ্ণোন্মুখী হইলে সর্ব্ব শ্রেণীর জীব পরম পবিত্র হইবে; সেইজন্য কহিতেছেন—দূর হইতে হরিকথা বা অচ্যুত কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতিও আপনা-দের ন্যায় রাজর্ষি ঋষি পদবী সমারুঢ় হইতে পারেন। কেন না কৃষ্ণ কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে সকলেই কৃষ্ণের দয়ার পাত্র হন।

ভক্তগণ! করুণানিধি ভগবানের সেই ভক্ত বাৎসল্য কেমন শ্রবণ কর! যে ভক্ত ভগবানের চরণ রজ পাবার জন্য তাঁর মোহন মূর্ত্তিকে ধ্যান করিতেছেন ভগবানও সেই ভক্তের উচ্ছিষ্ট খেতে লালায়িত, শুধু আবার খাওয়া নয়, ভক্ত উচ্ছিষ্ট খেয়ে ভগবানের আনন্দে চোখে জল আসে! সেই ভক্তমাল বর্ণিত রামায়ন ঘটনা শ্রবণ কর। যে সময় করুণানিধি কৃষ্ণ রাক্ষস সংহার ও সাধুগণকে রক্ষা কর্‌বার জন্য রামচন্দ্ররূপে দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়াছিলেন সেই সময় পরম প্রেমভক্তি-ময়ী এক শবর কন্যা তথায় বাস করিত। এই কাননের অন্যান্য ঋষি তপস্বীগণ জাতি মর্য্যদা অভিমানযুক্ত, রামভক্ত হইলেও চণ্ডাল কন্যাকে ঘৃণার নেত্রে দেখিতেন। এই শবরী অস্পৃশ্যা জ্ঞানে আপনাকে হীন মানিয়া ও রামভক্ত সাধু তপস্বীগণকে, ভক্ত ভগবানের অঙ্গ বোধে তাঁদের সেবা পূজা করিতে উৎসুক, কৌশলক্রমে তাহাও সম্পন্ন করিত ঋষিগণ এতই অভিমান যুক্ত ছিলেন যে, নীচকুলোদ্ভবা শবর কন্যাকে

দর্শন করিলে স্নান করিয়া দেহশুদ্ধি করিতে হইবে এইভাব প্রকাশ করিতেন, সেইজন্য শবর নন্দিনী সাধুগণের কোন প্রকার উদ্বেগ দেওয়া অনুচিত অভিপ্রায়ে নিশিযোগে স্নানহেতু পম্পা সরোবর গমনকারী-ঋষিগণের যে কণ্টাকাকীর্ণ মার্গ 'ভগবদ্ভক্তের চরণে কাটা ফুট্‌লে—প্রভুর না জানি কতই না কষ্ট হবে' এই ভাবিয়া এই যাতয়াতের পথে ঝাড়ু গিরি করিত। প্রভু আগমন পূর্ব্বে আগমন বার্ত্তা শুনিয়া দণ্ডকারণ্যবাসীগণ সাধনার ধন আসবেন এই ভাবিয়া নানা রকম সাজসজ্জা প্রভুর ভোগের জন্য উপাদেয় বস্তুর সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। সাধুগণের আশ্রমে ফুলের সিংহাসন, ফুলের চন্দ্রাতপ, দধি দুগ্ধ ঘৃত মাখন মিশ্রি নানাবিধ সুমিষ্ট ফল প্রভৃতি সংগ্রহের বন্দোবস্ত হইল। এদিকে বালিকা ভীল নন্দিনী প্রিয়তম প্রভুর জন্য স্বহস্তে প্রাণ দিয়ে মনোনীত বস্তু সংগ্রহ করিতে লাগিল। একমাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন তার এ সংসারে সাহায্য কর্‌বার কেহই নাই। লোকবল নাই কেন না সে অবিবাহিতা, মাতৃপিতৃকুলের অন্যান্য শবর শবরী থাকিলেও তাহারা মৎস্য মাংসাশী বলিয়া সে তাদের সঙ্গে মেলে না। এই জন্য আর আর চণ্ডাল চণ্ডালিনীরা তাঁকে কুলকলঙ্কিনী বলিয়া গালি দেয়। সমাজবল নাই, কেন না সে যে সাধু সমাজের ভাব ধর্‌তে ইচ্ছা করে সে সমাজ তাঁকে অস্পৃশ্যা অন্ত্যজ জাতি জ্ঞানে "কুক্কুরীর আবার যজ্ঞঘৃত খাবার বাসনা" এইরূপ তিরস্কারও করেন; সেই জন্য সে মনের দুঃখ মনের মানুষ শ্রীগোবিন্দকে জানিয়ে চুপ্ চাপ্ আপনার কুটীরে পড়ে থাকে। আজ প্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক আনন্দে আত্মহারা শবরনন্দিনী আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কুল বাগানে ফল সংগ্রহে মন দিয়াছে: কুল সংগ্রহ করিতে করিতে শবর নন্দিনীর ভাব অপূর্ব্ব। সে ভাবিতেছে যিনি অযোধ্যার রাজভোগে প্রতিপালিত,

দশরথ-বাবা কৌশল্য-মা যাঁকে দুগ্ধান্ন পুষ্পান্ন প্রভৃতি দ্বারা ভোজনানন্দে যে চাঁদ বদনের মধুর হাসি দেখ্তে লালায়িত সেই চাঁদবদনে আমি বনের কুলফল দেব। কুল ফল যদি তিক্ত বা অম্লরস যুক্ত হয় তাহলে প্রভুর না জানি কতই না কষ্ট হবে! আমি সব ফল চেখে চেখে রাখব, বনের ফলে বিশ্বাস নাই। সুমিষ্ট ফল ভিন্ন প্রভুকে আর কি বা দেব, এক মায়ের ছেলে যেমন সকলে সমান হয় না, সেইরূপ একটী গাছের একটী ফল মিষ্ট বলে সব যে মিষ্ট হবে তার নিশ্চয়তা কি আছে; এই মনে করিয়া সেই সরলা প্রেমময়ী ভীল নন্দিনী সব ফল চাখিয়া চাখিয়া জগদস্বামীর জন্য রাখিতে লাগিল। আজ নিশিযোগে শবরী সম্মার্জ্জনী-হস্তে ঝাড়ু দিতে দিতে চিন্তা করিতেছে; কালত প্রভু আসবে, আমার কুটীরে কি আসবে! শঙ্কর যাঁর জন্য ভিখারী সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, ওই উচ্চকুল জাত সাধু তপস্বীগণের নিকট ভিন্ন আমার মত নীচ-কুল জাতা বিদ্যাবুদ্ধি হীনা শবরীর নিকট আস্বে কেন! কিন্তু তিনি পরম দয়াল! তাঁর নাম রূপ গুণ শ্রবণ করে মনে হয়, সাগরের জলের সীমা হতে পারে কিন্তু আমার দয়ানিধি রামের দয়ার সীমা হতে পারে না! তাঁর নব দূর্ব্বাদল কান্তি দর্শনে মনে হয় দূর্ব্বাদামাম্বরা পৃথিবীর মত তিনি সকলের কাছে সমান! সকলকেই তিনি বুকে নিতে ইচ্ছুক! সেই জন্য বুঝি তার নাম শুনলে, অতি দুঃখের সময় 'হা রাম' বলে ডাক্‌লে দুঃখের বোঝা নেমে যায়, চুপে চুপে সেই আনন্দময় এসে কোলে তুলে নেয় তাই এত আনন্দ পাই। যাঁর নাম করলে বা শুনলে এত আনন্দ, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে না জানি কত আনন্দ? দয়ার ঠাকুর-কাঙালের ঠাকুর যখন কাঙালিনীর পত্রকুটীরে আসবে যখন 'ও শবরী! ও শবরী!' বলে ডাকবে, তখন সেই চিত্রপটের চিত্রিত, চিত্তপটের চির ভাব্য, সেই

চির সুন্দর রঘুকুলসুন্দরকে দর্শন করে হতভাগিনী আমি কি করব"। ভীল-নন্দিনীর চোখে জল আসিল, দেহে কম্পন ও রোমাঞ্চ হইল, ভগবানের ভাবী দর্শনসুখ স্মরণ পূর্ব্বক শুদ্ধ ভক্তের দেহে যে সাত্ত্বিক-বিকার দেখা যায় তাহাই হইতে লাগিল; তাহার হস্ত হইতে ঝাঁটা খসিয়া পড়িল! আর ঝাড়ুগিরি করিতে পারিল না, 'হা রঘুনন্দন' বলিয়া পথিমধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যময় চারিদিকে সে কেবল সেই ধনুকধারী নবদূর্ব্বাদলকান্তি রাঘবেন্দ্রকে অনুজ লক্ষ্মণের সহিত দেখিতে লাগিল! রজনীর শেষ ভাগ, ব্রাহ্ম মুহুর্ত্ত! চারি দণ্ড রাত্রি থাকিলে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত বলা হয়। শীতল সুগন্ধ অরুণোদয়-বায়ু দণ্ড-কারণ্যের ঋষিগণের ঘুম ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। বন্য কক্কুট হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতস্বর এককালে উদ্গীরণ করিতেছে। সাধুগণ প্রভাতী কীর্ত্তন কেহ বা স্নানাদি করিতেছেন। কিন্তু শবরী সেই ভাবে পথের মাঝে সাশ্রু নয়নে রামময় জগত দেখিতেছে, বাহ্য স্ফূর্ত্তি নাই। এমন সময়ে পম্পাসরোবরে স্নানকারী এক তপস্বী সেই পথ দিয়া—

"জয় রঘুনন্দন রাজা রাম।
জানকী বল্লভ সীতা রাম॥"

—এই গান করিতে করিতে আসিতেছেন। রজনীর অল্প অন্ধকারে তরুমূলে স্থিতা মলিন বসনা শবরীকে ভ্রম বশতঃ পদস্পর্শ পূর্ব্বক তিনি কোন জীবজ্ঞানে যখন ত্রস্ত স্বরে বলিলেন 'কে রে'। তখন শবরীর ধ্যান ভাঙ্গিল। সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে বিরহিনীর দুঃখোচ্ছ্বাসের ন্যায় সে বলিয়া উঠিল 'আমি শবরী'। তখন সাধু গালাগালি আরম্ভ করিল! 'কুক্কুরী! এমন করে এ সময় এখানে বসে আছিস্ কেন? আমার প্রভাতী স্নান নষ্ট করলি? 'এই বলিয়া সেই জাত্যাভিমানী সাধু' 'রাম

রাম' বলিতে ব'লিতে পুনর্ব্বার পম্পা সরোবরে স্নান করিতে গমন করিলেন। আর শবরী তখন চিন্তামগ্ন, সে ভাবিতেছে "আমার আজ সাধু স্থানে অপরাধ হ'ল। অস্পৃশ্যা আমি আমাকে স্পর্শ করে সাধুকে পুনর্ব্বার স্নান করতে হ'ল, ভজন কার্য্যের কত সময় আমার জন্য নষ্ট হ'ল! আমি ত নিত্য সাধুগণ স্নান করে না আস্‌তে আস্‌তে আপন কুটীরে পালিয়ে যাই! কিন্তু আজ ত সব ভুলে গে'ছি! যাবার সময় ঝাড়ু দেওয়ার কার্য্য সব ভুলে গেছি। হা রঘুনন্দন! তোমার রূপ গুণ কি এতই মনোহর! সব বিষয়কে ভুলিয়ে দিতে কি তার এতই ক্ষমতা! না, আমি মূর্খা, নারী জাতি একা দুর্ব্বলা বলে আমার উপর কি তোমার বেশী আধিপত্য! ওই সাধুরা তোমার ভজন করে বাহিরের কাজের কথা তাদের সব ত মনে থাকে, কিন্তু আমি তোমায় ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাহিরের কাজের কথা সব ভুলে যাই কেন? তাই হক্, হে সুখনিধে! তোমায় ভাব্‌তে ভাব্‌তে চিরদিন যেন আমি এ সংসারের সব কথা ভুলে যাই! ওই ভাবে আমি বড়ই সুখী। তোমার এ জগতে সকলেই, কিন্তু আমার তুমি একাই সখা! তোমায় ভাব্‌তে ভাব্‌তে সাধু-অপরাধে যদি আমার মরণ হয় সে আমার অসীম আনন্দ! তাই বলি যেমন ভাবে মনের ভিতর বাসা করেছ, 'অমনি ভাবে চিরদিনই করো।' শবরী ঝাঁটা হস্তে শীঘ্রই সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল, এবং নিজের পাতার কুঁড়ের ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক শুইয়া শুইয়া জগৎস্বামীর ধ্যান করিতে লাগিল। পূর্ব্বোক্ত জাতি-গুণ কর্ম্মাভিমানী সাধু মহারাজ যখন পুনর্ব্বার সেই সরোবরে স্নান করিলেন, তখন তাঁহার স্পর্শে সরোবরের অমৃতোপম নির্ম্মল জল মানব শোণিতে পরিণত হইল! কেন হইল জান? ভুবন পাবনী ভগবদ্ প্রেমময়ী শবর তনয়ার অবজ্ঞাজনিত মহাপাপ তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে।

ভগবান এই উপলক্ষে জগৎকে এই শিক্ষা দিলেন যে "মদ্ভক্তো শ্বপচো প্রিয়ঃ",অর্থাৎ আমাকে ভক্তি করে যে চণ্ডালাদি জাতি সে আমার অতি প্রিয় হয়; সেই আমার প্রিয় নীচ জাতিকে উচ্চ-জাতি গুণী সৎকর্ম্মী যদি কেহ অবজ্ঞা করে, তবে তজ্জনিত মহাপাপ পূর্ণ মাত্রায় তাহার দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাকে মহাপাপীরূপে পরিণত করে। তিনি এমন মহাপাপী হন যে তাহার স্পর্শে অতি পবিত্র বস্তু ভুত প্রেত রাক্ষস প্রভৃতির ভোগ্য মল মূত্র রক্ত প্রভৃতিতে পরিণত হয়। সেই জন্য পম্পা সরোবরের পবিত্র জল আজ রক্তাকারে পরিণত! করুণানিধি কৃষ্ণ নিজের ভক্তকে এতই পবিত্রকর জানেন যে কোন সময় চরণোদ্ভবা ত্রিলোকতারিণী গঙ্গা গোবিন্দকে বলিয়াছিলেন, 'হে প্রভু আমিত ত্রিলোকের পাপ গ্রহণ করে সকলকে উদ্ধার করিব, কিন্তু আমাকে কে উদ্ধার করিবে! সঞ্চিত পাপের বোঝা আমার বক্ষ হইতে কে অপসারিত করিবে? অমনি গোবিন্দ বলিয়াছিলেন, গঙ্গে! তোমাকে উদ্ধার করিবে আমার অঙ্গ-স্বরূপ জাতি-গুণ-কর্ম্মাভিমানশূন্য সৎকর্ম্ম-নিরত ভক্ত বৈষ্ণবগণ! এই কারণ বুঝি শ্রীমদ্ভাগবতে পুত্ররূপে প্রাপ্ত ভগবান কপিলের মুখে তত্ত্বজ্ঞান বার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক কপিল জননী দেবহূতি কপিলকে ভগবৎ স্বরূপ জ্ঞানে কহিতেছেন—

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।"

—অর্থাৎ হে প্রভু! এই কারণে চণ্ডালাদি জাতি শ্রেষ্ঠ হয়, তোমার সন্তোষ করিবার জন্য যাঁহাদের জিহ্বা সদাই কৃষ্ণ গোবিন্দ প্রভৃতি নাম রটনা করিতে থাকে। প্রভাতে জল আনয়নে গমনকারী সাধুগণ সরোবরের নির্ম্মল, জল রক্তরূপে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল, এমন হইবার কারণ কি কেহই এতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে পারিলেন না। তখন সকলে স্থির মীমাংস হইয়া কহিলেন যে আজত রঘুমণি অনুজের

সহিত এস্থানে আসিবেন। তিনি আসিলে এবিষয়ের রহস্য প্রকট হইবেই হইবে। এই মনে করিয়া প্রভুর আগমন পথ পানে সকলে চাহিয়া রহিলেন। নাতিদীর্ঘ সময়ে জানকীবিয়োগবিধুর রঘুকুল নায়ক অনুজ লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যের সাধু পল্লী গমন মার্গে অবতীর্ণ হইলেন। ঋষিগণ পুষ্প সিংহাসন পুষ্প চন্দ্রাতপ রচনা পূর্ব্বক প্রভুর ভোগ্য বস্তু প্রস্তুত করিতেছেন, আর পথ পানে মাঝে মাঝে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক "প্রভু এখনই আসিবেন" এই বলিয়া সকলে উল্লাসসাগরে মজ্জমান হইতেছেন; কিন্তু অকস্মাৎ তাহাদের এই উল্লাসসাগরে অপূর্ব্ব সন্দেহ উর্ম্মিমালার আবিভাব হইল! তাঁহারা নিস্পন্দ পাদপরাজির ন্যায় অবস্থান করতঃ ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয় লীলা দর্শন করিতে লাগিলেন। করুণাময় রামচন্দ্র ঋষিগণের সেই পুষ্পসিংহাসন পুষ্প বিতান বিশিষ্ট উপাদেয়-ভোগ্য-সমন্বিত, পবিত্র-ঋষি-আশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্ত্যজা অস্পৃশ্যা বন্য ভীলনীর পাতার কুঁড়ে ঘরের ক্ষুদ্র চত্বরে কেন উপস্থিত হইলেন, সকলে আকুল মানসে তাহাই ভাবিতেছেন। এদিকে শবরী প্রভু অঙ্গনে আসিয়াছেন দেখিয়া আশা সাগরের মাণিক ঋষিগণের আশ্রম পরিত্যাগ করে পথ ভুলে বুঝি আমার কুটীরে আসিয়াছেন মনে করিয়া বিশাল নয়নে প্রভুদ্বয়ের মোহন মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল! তার ইচ্ছা ছিল প্রভুকে সে বলবে, 'প্রভু'। পথ ভুলে অস্পৃশ্যা শবরীর কুটীরে কেন এলেন সাধুগণের কুটিরে যান্ এই বল্‌বে, কিন্তু সে কিছুই পারিল না বিরহিনীর প্রিয় মিলনের ন্যায় চকোরের চন্দ্রোদয়ের ন্যায় আনন্দরস সিঞ্চিত দূর্ব্বাশ্যামল রূপ ও তৎসঙ্গে গৌরকান্তি দর্শন করিয়া নয়ন পান পাত্রের দ্বারা রূপমাধুরী পান করিতে লাগিল। আনন্দ সমুদ্র উথ্‌লে উঠার হেতু তাহা শবরীর নেত্ররূপ জল নির্গমন পথ দিয়া নয়ন ধারারূপে প্রকাশ হইতে লাগিল। তাহার এই ভাব দেখিয়া

জগৎপতি আনন্দে হাসিতেছেন; তাহা দেখিয়া শবরীর লজ্জা ও ভয় হইল। লজ্জা হ'বার কারণ—"আমি বড় বড় চোখ্ করে প্রভুর দিকে চেয়ে আছি, প্রভু হয়ত আমাকে পাগলিনী মনে করে হাস্‌ছে, আর ভয় হ'বার কারণ—এমন গুণের ঠাকুরকে ঋষিগণ আবার হয়ত কত দোষ দেবে, প্রভুকে আর হয়ত সেবা পূজা কর্‌বে না, কেন না তারা যাকে অস্পৃশ্যা বলে ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না, তাদের উপাস্য ঠাকুর আমার অঙ্গনে এসে হাস্‌ছেন, এমন নিষ্কলঙ্ক চাঁদকে আবার হয়ত কলঙ্ক হতে পারে, এই ভয়ে শবরী প্রভুদ্বয়কে দণ্ডবৎ বা আসন প্রদান সম্মান প্রদর্শন না করে তাড়াতাড়ি মনের ঠাকুরকে মনের ভিতর নিয়ে ঘরের ভিতর গিয়া লুকাইল। যাহার মন প্রাণ ভগবচ্চরণে উৎসর্গী-কৃত, ভগবান তাহার দণ্ডবৎ আসন প্রদান আদিসাধক ভক্তির অপেক্ষা করেন না ভগবান নিজে বরং সময়ে সময়ে তাহাদের সেবা-শুশ্রূষাদি করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর উৎকৃষ্টতম ভক্ত যাঁরা গোবিন্দ ভিন্ন আর অন্য জানেন না, সেই শ্রীদামাদি ব্রজের গোপ বালকগণ যাঁরা জগদীশ্বর কৃষ্ণের স্কন্ধে চড়িয়া খেলা করিয়াছেন। সেইজন্য করুণা-নিধি ভগবান শবরী লুকাইয়াছে দেখিয়া অতি মধুর স্বরে ডাকিতে লাগিলেন ও শবরী! ও শবরী! লুকালে কেন! তোমায় দেখ্‌বার আশা বহুদিন হতে আমার মনে আছে আজ যদি ভাগ্য ক্রমে সেই দর্শনের সুযোগ হয়েছে তাতে তুমি নিজে প্রতি বন্ধক হচ্ছ কেন শবরী! এস এস বাহিরে এস! ভিখারীকে দেখে কি এমন করে লুকাতে হয় শবরী? ভক্ত! ভক্তবৎসল ভগবানের ভাব দেখ! বল্‌ছেন আমি ভিখারী। যাঁকে দেখ্‌বার জন্য যোগী ঋষিগণ অনন্তকাল হতে ভিখারী সেজে বসে আছেন যাঁর চরণ রজ পাবার জন্য মাত্র; অনন্ত ব্রাহ্মাণ্ড পতি প্রপঞ্চাতীত সেই ভগবান ভক্তের ভক্তি পাশে আবদ্ধ হয়ে বল্‌ছেন

কিনা 'আমি ভিখারীর মত তোমার দ্বারে এসেছি, তুমি লুকালে কেন!' অন্ধের নেত্রোদ্গমের ন্যায়, বামনের চন্দ্র ক্রীড়নক পাবার ন্যায়, শারদ কমলপুঞ্জে ভ্রমরকুল সঙ্গীতের মত অতি সুমধুর ভগবানের এই বাণী শ্রবণ পূর্ব্বক শবরী আনন্দে আত্মহারা! সে উঠিতে পারিল না, বা কিছুই বলিতে পারিল না। মানব শরীরের যাবতীয় ক্রিয়া সে ভগবানের রূপ গুণ-সাগরের ভিতর ডুবায়ে দিয়ে কাঙ্গালিনী সেজে ঘরের কোণে পূর্ব্বের মত বসিয়া রহিল। দয়াময় রঘুপতি তখন 'এইরূপ কাঙ্গাল আমার খেলার জিনিষ' এই ভাব প্রদর্শন জন্য, ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অভিমানিনী নায়িকার কাছে প্রাকৃত নায়কের মত সেই অপ্রাকৃত চিন্ময় ব্রহ্ম শবরীর হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক বাহিরে আনয়ন করিলেন, এবং প্রেমাশ্রুপাতনরতা পুলকাকুল কম্পিতা ভক্তিলজ্জাজড়িত নত বদনা শবরীকে নীরবে অবস্থান করিতে দেখিয়া, সেই বিকচকমলমুখ সহাস্য বদনে কহিলেন, "আমার জন্য কি ভোজন রেখেছ শবরী? কত দূর ঘুরে ঘুরে দুটী ভাই তোমার ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছি; কিছু খেতে দাওনা শবরী! কাঁদলে ত আর পেট ভরে না।" এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক প্রেমোন্মাদিনী সহাস্য বদনা শবরনন্দিনী প্রভুর হস্ত হইতে নিজ হস্ত ছাড়াইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল এবং পূর্ব্ব সঞ্চিত পত্র পেটিকাবদ্ধ দশনদংশিত উচ্ছিষ্ট সেই বদরীফলসমূহ প্রভুর সম্মুখে আনিয়া ধরিল। করুণানিধি সেই ফল আনন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন! শবরী ভোজনের সময় জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু! ফল মিষ্ট আছে ত?" অমনি ভগবান বলিলেন—"এমন মিষ্ট ফল আমি আর কখনও খাই নাই; একে ত সুপক্ক মিষ্ট ফল, তাতে আবার তোমার মত প্রেমভক্তিময়ী সরলা শবরতনয়ার অধররস সংযোগে মিষ্টতার চরম সীমায় দাঁড়িয়েছে; তুমি যদি দাঁতে কেটে এফল না চাখ্‌তে' তা'হলে এত মিষ্ট বোধ হয় হ'ত না শবরী";—বলিতে বলিতে ভক্তবাৎসল্যে

ভগবানের নেত্রে জল আসিল। তিনি আরও বলিলেন—"তোমার মত ভক্ত এ জগতে আমার কজন আছে শবরী! তোমার মত ভক্তের আনন্দ দেবার জন্যই ত আমি চিন্ময় বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ ক'রে ধরাতলে অবতীর্ণ, দুষ্ট সংহার আমার গৌণ উদ্দেশ্য, ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দ আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই জন্য আমার আবির্ভাবসুখ অগ্রেই প্রিয়তম ভক্তগণই অনুভব করে; দুষ্ট পাপীজনের নিকট আমি লুক্কায়িত অথবা ভীষণ শাস্তার ন্যায় প্রকাশিত হই। যতক্ষণ তোমার মত ভক্ত এ ধরাতলে না দেখি, ততক্ষণ আমার শরীর যেন জল্‌তে থাকে।" ভক্তের প্রেমে মত্ত ঠাকুরের ভাব এখন যাহা, তাহা শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুরের ভাষায় বলিতে গেলে—

"দীন নরোত্তম কহে,
সদা মোর মন দহে
হেন ভক্ত সঙ্গ না পাইয়া।"

এইরূপ। ভগবানের ভক্ত বাৎসল্যে অনুজ লক্ষ্মণের নেত্রে জল আসিয়াছিল। তিনি বলিলেন—"আমার অপেক্ষা দাদা ভক্তকে বড় ভালবাসেন; সেইজন্য ভাগ্যবতী শবরবালিকা সেই ভালবাসা দাদার কাছে পাইল, আর জাত্যাভিমান মর্য্যাদা বিশিষ্ট জ্ঞানকর্ম্মকাণ্ড নিরত ওই ঋষিকুল তাহার কণামাত্র পাইল, মায়ামুগ্ধ সংসারী জীব কিছুমাত্র পাইল না! হায় জীব! কি সুখ প্রাপ্ত হয়ে তোমরা আমার দাদার মত সুখনিধিকে পেতে চাও না!" শবরী নয়নজলে ঈশ্বরের চরণ ধোয়াইতেছে—'আর জন্মে জন্মে যেন এইরূপ ভাবে তোমাকে পাই' এই বর মাগিতেছে, দেখিয়া দয়াময় রাম তাহাকে মনোনীত বর দান পূর্ব্বক সানুজ সেস্থান হইতে ঋষিগণের আশ্রমে গমন করিলেন। ঋষিগণ প্রভুকে যথোচিত সেবাপূজাদি পূর্ব্বক প্রসঙ্গক্রমে সরোবরের

জল রক্ত হ'বার কারণ এবং পুনর্ব্বার তাহার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রঘুকুলমণি সহাস্যবদনে বলিতে লাগিলেন, "ঋষিগণ! তোমরা যাকে অস্পৃশ্যা অন্ত্যজা বলিয়া ঘৃণা কর, সেই শবর-বালার মত ভক্ত আমার খুব কম আছে। সে আমাগত প্রাণ হইয়া শবর জনোচিত কার্য্যাদি ত্যাগ করিয়াছে; সুতরাং যে নীচ হিংসাদি কার্য্য হেতু শবর জাতি নিকৃষ্ট, সেই নিকৃষ্টতা আর তাহাতে নাই; আমাগত প্রাণ হইলে সকল জীবই ভুবনপাবন হয়। তোমরা বাহিরের জ্ঞানকর্ম্মকাণ্ডের দিকে লক্ষ্য করে আমায় সেবাপূজা করো, আর সে বাহিরের জ্ঞানকর্ম্মকাণ্ড কিছুই লক্ষ্য করে না, নিজের প্রাণে যাহা ভাল লাগে আত্মবৎ ভাবে দিনরাত আমার সেবাপূজা করে। বাহিরের জ্ঞানকর্ম্মকাণ্ড অপেক্ষা 'আমার মত ঠাকুরের প্রাণ, আমি যাতে সুখী ঠাকুর তাতেই সুখী', এই ভাবে আমার সঙ্গে যে আত্মবৎ ভালবাসা হইতেই আমি অসীম সুখ প্রাপ্ত হই। হে ঋষিগণ, এ সম্বন্ধে আমি একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, শ্রবণ কর। কোন ব্যক্তির দুই বন্ধু আছে। এক বন্ধু ধনাঢ্য দাসদাসী পরিবৃত ঐশ্বর্য্যশালী, আর এক বন্ধু দাসদাসীহীন স্ত্রী মাত্র সম্বল অর্থহীন দরিদ্র। সেই ব্যক্তি যখন তাঁর ধনশালী বন্ধুর বাড়ীতে গেলেন, তখন ধনশালী বন্ধুটী তাঁহাকে উত্তমরূপে ভোজন কার্য্যাদি সম্পন্ন পূর্ব্বক পৃথক উত্তম শয্যাদি বন্ধুকে দিয়ে দাসদাসী দ্বারা তার শুশ্রূষাদির ভার দান পূর্ব্বক নিজে পৃথক শয্যাতে দাসদাসী পরিবৃত হইয়া শয়নসুখ লাভ করিতে লাগিলেন। আর তিনি যখন গরীব বন্ধুর বাড়ীতে গমন করিলেন, তখন গরীব বন্ধু ও তার স্ত্রী 'বন্ধু বাড়ীতে এসেছে, গরীব আমরা কি খাওয়াব' এই বলিতে বলিতে নিজের কুঁড়ে ঘরের ভিতর বসাইলেন, এবং প্রাণপণ যত্নে যথা-সাধ্য দীন জনোচিত বস্তু সংগ্রহপূর্ব্বক সহস্তে বন্ধুর মুখে তুলিয়া খাওয়া-ইতে লাগিলেন। এইরূপে ভোজন কার্য্য শেষ হইলে গরীব বন্ধুটী নিজের

শয্যাতে সমাগত বন্ধুকে শোয়াইলেন, কেন না সেই শয্যা ছাড়া তার দ্বিতীয় শয্যা আর নাই ; আর সেবা শুশ্রূষাদির জন্য তার স্ত্রীকে বন্ধুর নিকট দিলেন, কেন না দাসদাসী বা অন্য লোক তার কেহই নাই। এইরূপে গরীব সারারাতি বসিয়া বন্ধুর সুখ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা মাত্র গেল না। হে ঋষিগণ, বল দেখি, এই দুই বন্ধুর মধ্যে কোন বন্ধুর শ্রেষ্ঠত্ব অধিক। সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে গরীব বন্ধুর অধিক শ্রেষ্ঠত্ব। কেন না সে বন্ধুকে প্রাণের মত দেখিতে শিখিয়াছে। ধনী বন্ধু প্রাণের মত দেখিতে শিখে নাই ও নিজকে দিয়া বন্ধুকে সেবা করিতে শিখে নাই। সে 'বন্ধুও আমার ন্যায় সুখ ভোগী একজন পৃথক বস্তু, আমিও সুখভোগী একজন পৃথক বস্তু' এই জ্ঞানে 'বন্ধু আমি এক' এ ভাব ধরিতে সক্ষম নহে। সেইরূপ জ্ঞানকর্ম্মজনিত ভক্তিযোগে প্রাপ্ত জীবগণ আমাকে পাইয়াও আমা হইতে দূরে অবস্থান করে, নিজের তুল্য ভক্তিযোগে প্রাপ্ত জীবকুল আমার নিকটে অবস্থান করে। ঋষিগণ, শবরী নিজের প্রাণের মত আমাকে দেখিতে শিখিয়াছে, সেই জন্য সে আমার অতি প্রিয়। আজ নিশিযোগে আমার ধ্যানে আত্মহারা সেই শবরবালা পথিমধ্যে বসিয়াছিল। তোমাদের মধ্যে কোন সাধু স্নান করে আস্‌বার সময় তাঁকে পদস্পর্শ পূর্ব্বক অবজ্ঞা তিরস্কার করিয়া মহাপাপ সঞ্চয় করতঃ সরোবরে পুনর্ব্বার স্নান করিতে যায়, সেইজন্য সরোবরের পবিত্র জল রক্তাকারে পরিণত হইয়াছে। সেই কারণ ঋষিকুল শবরীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক যদি শবরীর চরণ রক্তাকারে পরিণত ওই জলে স্পর্শ করাতে পার, তবে সরোবর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।" ঋষিগণ ভগবানের মুখে এই কথা শুনিয়া আনন্দসাগরে ডুবিলেন। ভগবদ্ভক্তের অসীম পবিত্রতা জানিয়া সকলে শবরীর চরণ ধারণ পূর্ব্বক অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং শবরীকে ধরিয়া তাহার চরণ সরোবরে স্পর্শ করাইলে সরোবর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। এই

রূপে করুণানিধি কৃষ্ণ 'কেবল মাত্র এ জগতে আমার ভক্তই শ্রেষ্ঠ' এই তত্ত্ব, বিশেষতঃ শবরীর ন্যায় প্রাণের মত সেবাকারী ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক মায়ামুগ্ধ জীবকে নিজের করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনকারী ভক্তবৃন্দ তীর্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে পরমহংস-চূড়ামণি কৃষ্ণগতপ্রাণ শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামীকে সন্দর্শন পূর্ব্বক মহামনা ভাগবত প্রবর রাজর্ষি পরীক্ষিৎ কহিয়াছিলেন—

যথা :—

"যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈগৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ।"

—যে কৃষ্ণভক্তগণের স্মরণ করিলে পুরুষগণের হত্যালয় স্বরূপ গৃহসকল সুপবিত্র হয়, সেই কৃষ্ণভক্তদিগকে দর্শনপূর্ব্বক চরণস্পর্শ-পাদ্যার্ঘ্য-আসনাদি দ্বারা সুখী করিলে, সংসারী জীব যে কি পুণ্য লাভ করে, তাহা অকথ্য। এ স্থলে গঙ্গাকুলে অবস্থিত ভক্ত প্রবর পরীক্ষিৎ একথা বলিতেছেন কেন? গঙ্গা অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তের মহিমা জগতে অসীম, ইহা জানাবার জন্য নয় কি? নতুবা কলুষনাশিনী সুরধুনীর কুলে বসিয়া একথা বলিবার উদ্দেশ্য কি? তিনি জানিতেন, তীর্থাদিতে স্নান-দান-তর্পণ প্রভৃতির দ্বারা পাপমোচন হয়, আর কৃষ্ণভক্তের স্মরণের দ্বারা জীবের সর্ব্ব পাপ মোচন হয়। পক্ষান্তরে যে নির্জ্জন প্রাকৃত সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থানে কৃষ্ণভক্তকুল অবস্থান করেন, তাহাই তীর্থভূমিরূপে পরিণত; তাহাদের অসীম মহিমা কৃষ্ণগত-মন-জনগণই অনুভব করেন; সেইজন্য বুঝি পুত্ররূপে কৃষ্ণকে লাভকারী গোপরাজ নন্দ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা গর্গাচার্য্যকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

"মহদ্বিচলনং নৃনাং গৃহিনাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্রহ্মণ! কল্পতে নান্যথা কচিৎ॥"

—হে ব্রহ্মণ! আপনাদের ন্যায় সাধু ব্যক্তিরা যে সংসারে গৃহী লোকদের সম্মুখে আগমন করেন, তাহা কৃষ্ণভক্তি-ধন-হীন অতএব দীন, ত্রিতাপ জ্বালা ভোগকারী সংসারী জীবের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য; নিজেদের কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয়। এমন সর্ব্বার্থ সাধক কৃষ্ণভক্তগণ বহির্ম্মুখী জীবের কল্যান কামনার জন্য যে, কি গৃহে কি বনে সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করেন, মায়ামুগ্ধ জীব তাহা উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া তাহা-দিগকে কতই উপহাস করে! বিশ্বপ্রেম-ধর্ম্মাবলম্বনকারী বৈষ্ণব ঠাকুর-গণের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য আমার নাই; তবে তাঁহাদের শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে ভট সাজিয়া অবস্থান পূর্ব্বক যে নীতি শিক্ষা করিয়াছি, তাহা সর্ব্ব জীবের কল্যাণকর জানিয়া জগৎ হিতার্থ লিপি-বদ্ধ করিতেছি মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদচরিত্রের শেষ ভাগে, আত্মবৎ সেবাকারী ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন জন্য বেদব্যাসের হৃদয়ে যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছে তৎসম্বন্ধী শ্লোক এই:—নৃসিংহ দেবকে প্রহ্লাদ স্তুতি পূর্ব্বক কহিতেছেন—

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ,—
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত মনোবচনেহিতার্থং,—
পুণাতি সকুলং নতু ভুরিমানঃ॥"

—হে প্রভু! তোমার সেবার জন্য কায়মনোবাক্য যাহার অর্পিত,—অর্থাৎ হস্তের দ্বারা তোমার পূজার জন্য পুষ্পচয়ণ, মালা গাঁথা, হরি মন্দির মার্জ্জন, ভোগের জন্য অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত, তোমার ধাতু প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে স্নান ও চন্দনতিলকাদিতে সাজান, এবং তোমার উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণামাদি কায়িক ভক্তি,—মনের দ্বারা তোমার মোহন

কৃষ্ণরূপের ধ্যান প্রভৃতি মানসিক ভক্তি,—বাক্যের দ্বারা কৃষ্ণগোবিন্দ গোপীজনবল্লভ প্রভৃতি নামোচ্চারণ, তোমার লীলা গান, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থাদি পাঠ প্রভৃতি বাক্য ভক্তি করিয়া তোমাকে যে সব সমর্পণ করিয়াছে, সে শ্বপচ ( নীচ চণ্ডালাদি জাতি ) হইলেও এ জগতে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; নিজের কুলকে পবিত্র করিতে সেই সমর্থ হয়। দ্বাদশ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি তোমাতে বিমুখ হয়, হে পদ্মনাভ জনার্দ্দন! সে জগতে প্রচুর মানশালী হইলেও সেই শ্বপচের অপেক্ষা অতি নিকৃষ্ট। শাস্ত্র-বাক্য বা ঋষিবাক্য এই ; এই বাক্য যারা মানে না তারাই নাস্তিক, যমদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তারাই অনন্ত কাল নরককুণ্ডে যন্ত্রণা পাইতে থাকে। এখন দ্বাদশ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ অরবিন্দনাভ শ্রীকৃষ্ণে কেমন ভাবে বিমুখ, দ্বাদশ গুণহীন শ্বপচাদি কেমন ভাবে শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে দণ্ডক বন-বাসী যজ্ঞকারী আত্মসুখভোগী অভিমানী ঋষি ও আত্মসুখহীনা সর্ব্বাভিমান শূন্য যজ্ঞাদি জ্ঞানরহিতা পরম প্রেমময়ী শবরকন্যার দ্বারা প্রকাশ হইতেছে। এখানে যজ্ঞাদি বাহিরের লোকসমাজে যশস্কর কার্য্যাদি আত্মভিমান আনিয়া মানবকে কৃষ্ণপ্রেম পথের পথিক হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। প্রতিষ্ঠা লাভকারী মানব 'আমাকে কিসে বড় দাতা, বড় পণ্ডিত, বড় জ্ঞানী বলিয়া পূজা করিবে', কৃষ্ণ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া এই চিন্তায় রত থাকে ; ইহাই শ্রীকৃষ্ণে বিমুখতার কারণ। আর 'শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই পরম প্রিয়তম বস্তু, সর্ব্বদা সেই প্রিয়তমের কথা বলিব বা সকলের মুখে তাঁর কথা শুনব, সকলকেই সেই প্রিয়তমের প্রেমে আবদ্ধ হতে চেষ্টা করব, ইহাতে লোকে আমাকে পণ্ডিত বলুক বা মুর্খ বলুক, অথবা প্রসংশা করুক, তাহার জন্য আমি প্রয়াসী নই', এইরূপ ভাবের নাম শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখতা। ইহার সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত এইরূপ আসে যে, এক পুরুষের দুইটি স্ত্রী। প্রথম বড় পত্নীটি সংসারের

কাজকর্ম্মে বড় পটু, কিন্তু ক্ষণিক সুখভোগের জন্য সে স্বামীকে অপেক্ষা না করিয়া বাটীতে সমাগত সুন্দর সুপুরুষদিগের প্রতি উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে, সময়ে সময়ে গোপনে সেই পুরুষদের সঙ্গ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আর কনিষ্ঠা স্ত্রী সংসারের কাজকর্ম্ম করিতে তত পটু নয়; চিনির যায়গায় নুন দিতেও সে পশ্চাৎপদ হয় না; কিন্তু সে স্বামীর চরণ ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের দিকেও উঁকিঝুঁকি দেয় না। এই দুটী স্ত্রীর মধ্যে কোন স্ত্রীকে তাদের স্বামী ভালবাসবে? সকলেই বুঝিতে পারিতেছে যে ছোট স্ত্রীকেই ভালবাসিবে। এইরূপ গোবিন্দকে শুদ্ধ ভক্তিযোগে যাঁরা বাঁধিয়াছেন, তাঁরা বাহিরের কাজকর্ম্মে তত পটু হন না, ঠিক ওই জড়ভরতের মত অবস্থান করেন; তত্ত্বকথা বা কৃষ্ণ প্রসঙ্গ উঠিলে তাঁহারা সিংহতেজে মীমাংসা করিতে থাকেন। মহারাজ ভরত যিনি ত্রিজন্মে সাধন দ্বারা কৃষ্ণকে পাইয়াছেন, তিনি সাধারণ লোকের সমীপে জড় ( মুক বা গোগা ) বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন; তাহাতে তিনি কোন দুঃখ প্রকাশ করিতেন না। তিনি জানিতেন, এরা কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কথা ( যাহাতে জীবের সংসারবন্ধন আসে বই ঘোচে না ) সেই সব বলিবে,এরা নিজেরা বন্ধনের ভিতর পড়িয়া আছে। যার হাত দুখানি বাঁধা আছে সে অপরের বন্ধন কেমন করিয়া খুলিবে? সুতরাং এদের সঙ্গে কথা কহাও যা আর না কহাও তা;—এই ভাবিয়া চুপ করিয়া সেই সবিতৃমণ্ডলস্থ চিন্ময় গোবিন্দের ব্রহ্মজ্যোতিকে চিন্তা করিতেন; আর মনে করিতেন, যদি কারও বন্ধন মোচন প্রবৃত্তি জাগরিত হয়, এ সংসারবন্ধন ভাল না লাগে, মনে কৃষ্ণোন্মুখী হইবার বৃত্তি জাগরিত হয়, বলিত তাহার সঙ্গে কৃষ্ণকথা বলিব।—এই ভাবিয়া সেই রাজর্ষি প্রবর চুপ করিয়া থাকিতেন। পরে তত্ত্বজিজ্ঞাসু রাজা রহুগণ যখন তাঁহাকে শিবিকাবাহক রূপে লইয়া যাইতেছিলেন এবং যখন মন্দগামী তাঁহাকে "তুই এত মোটা, সামান্য শিবিকাবাহন কর্ত্তে

কুণ্ঠিত হতেছিস্ কেন ? তোকে শাসন করিব" এই কথা বলিয়াছিলেন, তখন মহারাজ ভরত বলিলেন, "এত মুর্খ মায়ামুগ্ধ জীব বলিয়া থাকে ! শৃগাল কুক্কুর-ভোগ্য নশ্বর দেহাদিতে মোটা-সরুর আরোপ হয় ; কিন্তু অনশ্বর চিন্ময় যে আত্মা সে সকলের কাছে সমান, সরু বা মোটা নয়। হে রাজন, মায়ামুগ্ধ তুমি মুর্খ হইয়া পণ্ডিতের মত 'আমি রাজা' এই অভিমান বশতঃ ক্ষুদ্র রাজ্যের আধিপত্য লাভ করে, সুখের জন্য রাত্রিদিন হাহাকার কর্‌ছ, অভাবের জন্য হাহাকার কর্‌ছ, কৃষ্ণের দাস হইলে অখিল রাজত্ব যে তোমার সব জানিয়া অভাব রহিত না। যদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বামী শ্রীগোবিন্দের প্রতি তুমি দৃষ্টি করিতে, তাহা হইলে তুমি 'আমি রাজা, স্থূল বা মোটা' এ অভিমান করিতে পারিতে না, সমদর্শী হইতে পারিতে, সুখের জন্য আর হাহাকার করিতে হইত না, এক স্থানে সব সুখ পাবার উপায় জানিয়া ঈশ্বরে চিন্তায় কালযাপন করিতে সক্ষম হইতে। ও রহুগণ ! এই জ্ঞান দান যজ্ঞ বা সূর্য্যাদি দেব উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা আসে না, ঈশ্বরে মনপ্রাণ সমর্পণকারী সমদর্শী সাধুজনের চরণরজ যতক্ষণ না স্পর্শ করিবে।" এইভাবে নানা তত্ত্ব কথনের পর রাজা রহুগণ শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে প্রণাম করিলেন, এবং সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি পাবার আশায় রাজর্ষি প্রবরের চরণ যুগল আশ্রয় করিলেন ! মহারাজ ভরতের এই চরিত্রে মৌনীর পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলিতেছেন "মৌনী সংযত বাক্য ব্যয়ী।"—যিনি নিয়মিত কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর অন্য কথা বলেন না, তিনি এ জগতে মৌনলাভ করিয়া থাকেন। যিনি কৃষ্ণকথা বলেন না, লোকসমাজে থাকেন না, অন্য কথাও বলেন না, অথচ ভোজনাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন করিবার জন্য লিখিয়া বা সঙ্কেত দ্বারা অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন, তিনি ঈশ্বর বহির্মুখী, লোকসমাজে কীর্ত্তিপ্রয়াসী ধর্ম্মধ্বজী মৌনী ! মৌনীত ওই যাঁরা 'অন্য কথা প্রসঙ্গে

মনে অশান্তি আসিবে' এই মনে করিয়া শান্তিময় নির্জ্জন কাননে বা কুটীরে অবস্থান পূর্ব্বক কিসে ঈশ্বর বহির্মুখী জীব ঈশ্বরমুখী হইবে, এই বাসনায় বেদ পুরাণাদি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ব্যাস বাল্মিকী প্রভৃতি ঋষিগণ, এবং এইরূপ মহাজনের পথাবলম্বনকারী নির্জ্জন কানন বা কুটীরবাসী সময়ক্রমে লোক সমাজে ঈশ্বরবার্ত্তা সমালোচনাকারী মানবগণ। ঈশ্বরে অনুরাগী জনগণ বাহিরের লোকসমাজের সুখ্যাতি তুচ্ছ করতঃ ভগবদুন্মুখী হয় বলিয়া তাঁহারা কি অকীর্ত্তিভাজন নিন্দনীয় হন? না, তাহা নহে। তাঁহারাই জগতে অমর কীর্ত্তি, পুণ্যস্মৃতি সুখ্যাতির আধার হইয়া থাকেন। প্রহ্লাদ কৃষ্ণ-বহির্মুখ দৈত্য-পিতা হিরণ্যকশিপুর বাক্য রক্ষা করেন নাই বলিয়া তাঁর সংসারে যশের সীমা নাই। ধর্ম্মশীল কৃষ্ণপরায়ণ মহামনা যদু সংসারসুখপ্রয়াসী পিতা যযাতির কথা রক্ষা করেন নাই বলিয়া ভগবান কৃষ্ণ তাঁহার কুলে অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক যদুকে অমর কীর্ত্তিভাজন করিয়াছেন। ঈশ্বরোন্মুখী ব্যক্তিরা সমগ্র জগতের মাতাপিতা বা পরম বন্ধুরূপে পরিগণিত; আর ঈশ্বর বহির্মুখী মাতাপিতা স্বজনাদি শত্রুরূপে পরিণত হয়। ঈশ্বরভক্ত মানবগণ দেবতা ও ঈশ্বরভজনবিহীন সংসারসুখপ্রয়াসী দেবদেবী উপাসনাকারীরা দৈত্য বা অসুর বলিয়া কীর্ত্তিত। এ সম্বন্ধে পদ্ম পুরাণের প্রমাণ এই—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তো সুর জ্ঞেয়ো আসুরো তদ বিপর্য্যয়ঃ ॥"

—অর্থাৎ এই লোকে দেব ও অসুর এই দুই সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশ্বব্যাপী যে ভগবান কৃষ্ণ, তাঁহাকে যাহারা উপাসনা করে—তাহারাই দেব, আর সেই সর্ব্ব শক্তিমানকে ত্যাগ করিয়া যাহারা নশ্বর সুখ

বাসনায় অন্য কোন শক্তি বা শক্তিমানের উপাসনা করে—তাহারাই অসুর নামে পরিচিত হয়। যাবতীয় দেবদেবীরা ভগবান কৃষ্ণের দাসদাসী সাধকসাধিকারূপে পূজিত। তাঁর মধ্যে যাঁদের কৃষ্ণে বেশী ভক্তি তাঁদের দেবসমাজে ও নরসমাজে বেশী সম্মান বা পূজা প্রচার। যেমন পশুপতি মহাদেব, সোণার কৈলাস থাকা সত্বেও তিনি যোগী, কৃষ্ণপ্রেমের পাগল হইয়া শ্মশানে কাননে ঘুরে বেড়ান, বিষ্ণু পদোদ্ভবা গঙ্গাকে চরণামৃত বলিয়া মস্তকে স্থান দান করিয়াছেন, মণিময় আভরণাদি পরিত্যাগ করতঃ পরম বৈষ্ণব সুধন্বাদির মস্তক 'বৈষ্ণব-অস্থি মণি অপেক্ষা উচ্চ' এই বলিয়া অস্থিমালা ধারণ করিয়াছেন. ইঁহার শক্তি মহাযোগিনী পরমা বৈষ্ণবী যোগমায়া কালী। এইজন্য স্বর্গসুখ ভোগী নিম্নশ্রেণীর সাধকগণ সময়ে সময়ে ইঁহাদের আশ্রিত হইয়া সুখী হন। দেবসমাজে শিবের শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলিয়া তিনি মহাদেব নামে পূজিত হন। শ্রীমদ্ভাগবৎ বলিতেছেন—

"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু পুরাণানামিদং তথা।"

—অর্থাৎ বৈষ্ণবের মধ্যে শিবের মত বৈষ্ণব এবং পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের মত পুরাণ আর নাই। ব্রহ্মা দেবদেবীদের মাতাপিতার স্রষ্টা, বেদপাঠকারী অভিমানে ক্রোধকে আশ্রয় করেন বলিয়া ইঁহার স্থান শিবের অপেক্ষা নিম্নে। দেবদেবীরা যখন ভগবানের ভক্ত, তখন তাঁহাদিগকে ভগবান জ্ঞানে পূজা করা ঋষিগণের বা আর্য্য শাস্ত্রের অনভিপ্রেত; অথবা ঈশ্বরকে ভুলিয়া সেই দেবদেবীরূপী ভক্তগণের পূজা পূর্ব্বক সংসারসুখে মগ্ন হওয়া দুঃখ পাবার হেতু। ভক্তের কাছে প্রভুর গুণগান না করিয়া, শুধু ভক্তের গুণগান করিলে ভক্তের প্রাণে কষ্ট হয়। ভগবানকে ত্যাগ করিয়া তাঁর গুণানুবাদ না করিয়া, ভক্তপূজায় আসক্ত সংসারসুখবাসনার প্রবলত্ব হেতু সুখপ্রার্থী জীবকুল দুঃখ পাইতে থাকে; কেননা ভক্তরূপী দেবদেবীরা

হইতে বীজ, এইরূপ সাকার নিরাকাররূপে শ্রীকৃষ্ণই লীলা করিতেছেন। প্রথমেই নিত্য গোলক বৃন্দাবনে হ্লাদিনী শক্তি রাধার সহ শ্রীকৃষ্ণের সাকাররূপে নিত্য অবস্থান, ইহার পূর্ব্বের আর কিছুই নাই। ইনিই অনাদির আদি বলিয়া কীর্ত্তিত। পরে এই করুণানিধি কৃষ্ণ মায়া প্রকৃতিতে নিরাকার বীজকে দান করেন, তাহা হইতে হিরণ্যগর্ভ মহাবিষ্ণু প্রভৃতির আবির্ভাব ও সমগ্র সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কারণ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সাকার মূর্ত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা নিরাকার জ্যোতিরূপে জ্ঞান করে, তাহারা কল্পিত মূর্ত্তি উপাসনাকারী তুচ্ছ সুখ ভোগী কঠিন হৃদয় মূঢ় মানব বলিয়া কথিত; যে হেতু জ্যোতি যখন দৈত্যদলন ভক্তপালন করে নাই, পাষাণ বৃক্ষকে মানবত্ব দেবত্ব দেয় নাই, তখন তাহার খ্যাতি কঠিন মূঢ় ভিন্ন অন্য কি হইবে? তাহারা সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণমূর্ত্তি হইতে অনেক দূরে মায়ারাজ্যে পড়িয়া থাকে বলিয়া শুধুই জ্যোতি মাত্র দেখে, যাহার অঙ্গ হইতে এই জ্যোতি আসিতেছে তাঁহাকে দেখে না। তরুগুল্ম সমাকীর্ণ গ্রাম হইতে মানুষ যখন দূরে থাকে, তখন গ্রাম তাহার কাছে জঙ্গলের ন্যায় প্রতীত হয়, পরে গ্রামের কাছে বা ভিতরে আসিলে সে যেমন কত নরনারী হাতী-ঘোড়া-গরু প্রভৃতি দেখে, সেইরূপ প্রেমভক্তি যোগে কৃষ্ণের নিকটে যাঁহারা যাইবেন তাঁহারা তাঁহার মোহন মূর্ত্তিকে দেখিতে পাইবেন,—ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। কৃষ্ণের সাকার বিগ্রহ খণ্ডন করিলে মহা অপরাধ হয়, সংসারমায়া তাহাকে ঘোর দুঃখও দেয়; সেই জন্য সাকার-উপাসনা-নিন্দুক প্রকাশানন্দ ভারতী কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় তিনি উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে শ্রীবৃন্দাবনধামে বিখ্যাত হইয়াছেন। যত জীবরূপে কৃষ্ণ লীলা করেন, তন্মধ্যে মনুষ্যরূপে যে বৃন্দাবন লীলা ইহাই সারাৎসার লীলা। সাকার মনুষ্যরূপে গোপবেশধারী বেণুবাদনশীল এই

সনাতন মূর্ত্তি মানবকে সব সুখ দেবার জন্য যমুনাকুলে কদম্বতলে 'রাধা রাধা' বলিয়া বাঁশী বাজাইতেছেন। এই কারণ বুঝি তত্ত্বদর্শী কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বসুখ-আকর সচ্চিদানন্দঘন করুণানিধি প্রাণবন্ধু শ্রীগোবিন্দের রূপগুণও সুখদত্ব দেখিয়া আকুল প্রাণে কাঁদিতেছেন—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁন্দে।
পরাণ-পুতলি মোর স্থির নাহি বান্ধে॥"—(ইত্যাদি)

এইরূপ কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই সর্ব্বসুখদাতা কৃষ্ণকে জীবনে মরণে যিনি অঙ্গে অঙ্গে স্থান দিয়া রাখিয়াছেন, তাঁর কাছে জীবন-মৃত্যু সুখ-দুঃখ উভয় সমান; সূর্য্যের কাছে আবার রাত্রিদিন কি? সেইরূপ তত্ত্বদর্শী কৃষ্ণভক্তের আবার জন্ম-মৃত্যু কি; তাঁরা চিরদিন জীবন্মুক্ত। তবে সাংসারিক দৃষ্টিতে সূর্য্য যেমন অস্তাচলে গমন করেন, তাই বলিয়া সূর্য্যের কাছে, মানুষের কাছে যেমন অন্ধকার আছে, সেইরূপ অন্ধকার থাকা মিথ্যা, সেইরূপ সাংসারিক নিয়ম বশতঃ কৃষ্ণ ভক্তের দেহাদির পতন ঘটিলেও সূর্য্যের কাছে অন্ধকার থাকা মিথ্যার ন্যায় তাহা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা। এখানে অনেকের মনে একটী সন্দেহের আবির্ভাব হইতে পারে যে, রাবণ প্রভৃতি সাধুপীড়ন, পরনারী হরণ, কৃষ্ণভক্তিহীন হইয়াও যখন শেষে কৃষ্ণের হাতে নিধন প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি পাইল, তখন হিংসাদি পরিত্যাগ, সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণভক্তি এ সবের আর প্রয়োজন কি? রাবণের মত শিবদুর্গা প্রভৃতির আরাধনা পূর্ব্বক সংসার সুখে সুখী হইনা কেন! এ তর্ক মূর্খ রাক্ষস-বুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষ ভিন্ন আর কেউ করে না। এ জগতে সুখের আধিক্য অনুসারে বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্ব সূচিত হয়। বিচার

করিলে জানা যায় রাবণাদি নিকৃষ্ট সুখে সুখী, হিংসাদি বর্জ্জিত সমদর্শী বৈষ্ণবী ধ্রুবপদবী সমরূঢ় সাধুগণ উৎকৃষ্ট সুখে সুখী। বৈষ্ণবগণ জীবনে কৃষ্ণে সমদর্শী মরণেও তাই, এই জন্য জীবনে মরণে সমান সুখী; আর রাবণাদি জীবনে কৃষ্ণে বিষমদর্শী মরণে সমদর্শী, এই জন্য সাধুগণ অপেক্ষা অর্দ্ধেক সুখ ভাগী। পরম বৈষ্ণব যাদবকুল, আহীরকুল বসুদেব, নন্দঘোষ প্রভৃতি জগদীশ্বর কৃষ্ণকে পুত্রাদিভাবে পাইয়া যে সুখ পাইয়াছেন, সেই সুখ শত্রুভাবে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত রাবণ বা কংসের হইবে—ইহা ভাবনা করা যে অসম্ভব! যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে—

"না তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতামতিঃ।"

—এই শ্লোকে নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন যে, ভক্তিযোগে ভগবানকে ভাবিয়া ভক্ত তেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হয় না, শত্রুভাবে ভগবানকে ভাবিয়া জীব তাঁহাকে যেমন প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ভক্তি যোগের প্রাপ্তি অন্যরূপ—ইহাই সূচনা করিতেছেন। এখানে এই প্রাপ্তির সম্বন্ধে তারতম্য এই—যাহারা শত্রুভাবে ভগবানকে ভাবে তাহাদের অর্দ্ধেক জীবন শীতলতাপূর্ণ সুখময়; আর নন্দঘোষ প্রভৃতির সম্পূর্ণ জীবন সম্পূর্ণ শীতলতাপূর্ণ সুখময়। ব্রজবালাগণের কাছে যে কৃষ্ণ জীবন-মরণে মদনমোহন সুখদাতা কুসুমকোমল, কংসের কাছে সেই কৃষ্ণ জীবনে মৃত্যুতুল্য ভয়প্রদর্শক যন্ত্রণাদায়ক বজ্রকঠোর! যদিও মরণের পর সকলেই কৃষ্ণের লোক হইল, তাহা হইলেও লোকের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। রাজসংসারে রাজার পিতা ও সখা যেমন রাজ-পুরুষ মধ্যে গণ্য, সেইরূপ গ্রামের পাহারাওয়ালাও রাজপুরুষ বলিয়া গণ্য; তাই বলিয়া সুখ ও মর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি করিলে রাজার পিতা, সখা বা মন্ত্রীর সঙ্গে সামান্য প্রহরীর যেমন তুলনা হয় না, সেইরূপ নন্দঘোষ, যশোদা, শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজকামিনীগণের সঙ্গে কংস বা শিশুপাল দন্ত-বক্রাদির তুলনা হয় না; কেননা, নন্দঘোষ ও বসুদেব কৃষ্ণের বাড়ীর

ভিতরের লোক, আর শিশুপাল, দন্তবক্র, কংস প্রভৃতি বাহিরের প্রহরী-দের মত লোক! চিরদিনই এইরূপ সম্বন্ধ কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের হয়ে আছে। সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই ব্রহ্মার চারি পুত্র বৈকুণ্ঠের প্রহরী জয়বিজয়কে অভিশাপ দিয়াছিলেন বলিয়া এই দুজন শত্রুভাব বিশিষ্ট ত্রিজন্ম হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ, রাবণ কুম্ভকর্ণ, পরজন্মে শিশুপাল দন্তবক্র নাম ধারণপূর্ব্বক ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সব আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, অখিল স্বামী ভগবান কৃষ্ণের দাসদাসী স্বরূপ যে দেবগণ তাঁহাদের পূজা করিতে হইলে 'কৃষ্ণকে কেমন করিয়া পাইব' এইভাবে করিতে হইবে। তাহাতে জীবনের কল্যাণ হইবে, কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাহায্য হইবে। নতুবা কৃষ্ণভক্তিবিহীন হইয়া দেবদেবীকে সুখদাতা, নামমাত্র কৃষ্ণভক্তি পূর্ব্বক সংসারসুখে সুখী হইলে দেবদেবীরা জীবকে রাক্ষস বা দৈত্যশ্রেণীর মধ্যে ফেলিয়া দুঃখের হেতু হইবে। দেবদেবীকে নিন্দা করিতে নাই; তাহা হইলে ভগবানের অঙ্গের নিন্দা করা হয়। বিশ্বসংসার সব ভগবানেরই অঙ্গ; ইহার মধ্যে চিন্ময় আত্মা স্বরূপ কৃষ্ণ; এই কারণ চৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী নিজগ্রন্থে লিখিয়াছেন, "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান"। এই কারণ দেবদেবী ছাড়া 'সর্ব্ব জীবও কৃষ্ণের' এই ভাব ধারণ পূর্ব্বক সমদর্শী হিংসাদি ভাব বর্জ্জিত হইয়া কৃষ্ণসেবা করিলে সকলের সেবা করা হয়, ইহাই মহাজন গণের অনুমোদিত। অনেকে মনে করিতে পারে দেবদেবী যখন ভগবানের অঙ্গ, তখন তাঁদের সেবা করিলে ত কৃষ্ণসেবা করা হয়; কিন্তু এ ধারণাও ভুল। দেবদেবীর সেবা করিলে সামান্যতঃ ভগবানের অঙ্গ-সেবা হয় বটে; কিন্তু অনন্ত অঙ্গবিশিষ্ট ভগবানের পূর্ণাঙ্গ সেবাজনিত সুখ তাহাতে আসে না। আর 'সেই দেবদেবী কৃষ্ণের অঙ্গ, তাহাতে

সর্ব্বত্র সমদর্শী প্রেমময় করুণানিধি কৃষ্ণ আছেন' এ বুদ্ধিতে কয়জন বা সেবা করে ? কেউ করে না। সুরথ লক্ষ ছাগ বলি দিয়া দেবীকে পূজা করিল, শেষকালে সেই লক্ষ ছাগ সুরথের দেহকে লক্ষ খণ্ড করিল, দেবী রক্ষা করিল না ! সুরথ যদি জানিত 'দেবীর ভিতরে কৃষ্ণের যে আত্মা আছে, সে আত্মা কাহাকেও হিংসা পীড়ন করে না, সেই কৃষ্ণ সন্তোষ জন্য দেবী পূজা করিতেছি', তবে নিরীহ ছাগশিশুকে জগদম্বার কাছে বলি দিত না। হিংসাদি পরায়ণ কুপথগামী মানুষরূপী পশুকে সংহার করা, ধর্ম্মস্থাপন ও দুষ্টদলন করা কৃষ্ণেরই ইচ্ছা, কিন্তু নিরীহ ছাগশিশু ও মৎস্যাদি সংহার পূর্ব্বক রাক্ষস সাজা কৃষ্ণের ইচ্ছা নহে। অনেক মুর্খ নারকী বলেন—মৎস্যমাংসাদি আমাদের যখন খাদ্য তখন কেন খাব না ? এসম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, সেই খাদ্য তোমার অজ্ঞান অবস্থার খাদ্য, চৈতন্য অবস্থার খাদ্য নহে। অজ্ঞান শিশু মলমূত্রকে খাদ্যরূপে খাইতে থাকে, চৈতন্য হইলে তাহা অখাদ্য বলিয়া পরিত্যাগ করে; সেইরূপ জীব তুমি অজ্ঞান অবস্থায় যাকে খাদ্য বলিয়া ভাবিতেছ, জ্ঞান আসিলে জানিবে সেও তোমার অখাদ্য। তোমার খাদ্য ওই মাতৃদুগ্ধের মত অবিকৃত জিনিষ, যাহাতে জীবলীলাকারিণী ভগবদ্বৃত্তি জাগিয়া উঠে নাই এমন বস্তু দুগ্ধ, অন্ন প্রভৃতি। যাহাতে জীবলীলাকারিণী বৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে, তোমার মত সুখ দুঃখ বুঝিবার শক্তি যাহাদের আছে, তাহাদের সংহার করিলে ভগবানের জীবলীলা শক্তির নাশ করা হয়, এবং তজ্জনিত পাপে ভগবানের কাছে অপরাধী হইতে হয়, তুমি পূর্ণরূপে তাঁর ভালবাসা পাইতে পার না। বীজরূপী জীবের আদান প্রদান দ্বারা সংসারের সৃষ্টি ও পালন কার্য্য চলিতেছে। স্থাবর জীব জঙ্গম জীবকে এবং জঙ্গম জীব স্থাবর জীবকে ভোজন পূর্ব্বক দেহ ধারণ করে—ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্টিতে আমরা ইহামাত্র

দেখিতে পাই। সর্ব্বশ্রেণীর জীবকে গর্ভবাস কালে বীজরূপী জীবই ভগবান আহার করিতে দেন; সেইজন্য গর্ভস্থ শিশুর ভোজনসুখাদির কোন অভাব থাকে না। যে মানব এই গর্ভস্থ শিশুর অনুকরণ পূর্ব্বক ভোজনাদি করিতে থাকেন, তিনিই পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভকারী ও সুখভোগী হন। যিনি যত দূর এই বীজরূপী অবিকৃত জীবের ভোজন করেন, তিনি তত দূরই ঈশ্বরের প্রেম লাভ করিতে সমর্থ হন। এইরূপ অবিকৃত বীজরূপী জীবকে ভোজন না করিয়া যারা বিকৃত লীলা-শক্তিবিশিষ্ট জীবকে বা জীবদেহকে সংহার পূর্ব্বক ভোজনাদি করে, তাহারাই ভক্তবর প্রহ্লাদের মতে চর্ব্বিতচর্ব্বণকারী গৃহব্রতী অন্ধকার প্রবিষ্ট হিংসাদি পরায়ণ মানবরূপী পশু অথবা ইতর শ্রেণীর সিংহাদি জীবগণ। কুক্কুরাদি পশুজীবের কিছু কিছু গুণ থাকা নিবন্ধন তত্ত্বদর্শী মানবকুল সাধারণ মানবকে সেই গুণ শিক্ষা দিতে ও তাহাদের প্রতি হিংসাদি বর্জ্জন করিতে আদেশ দেন; কদাচ কুক্কুরাদির খাদ্য খাইয়া কুকুর সাজিতে আদেশ করেন না, কেননা কুক্কুরাদির দেহে কিছুমাত্র গুণ থাকে, আর মনুষ্য দেহে সম্পূর্ণরূপ গুণ থাকে; এই হেতু মানব দেহ সর্ব্ব জীবদেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত। কুক্কুর যেমন প্রভুভক্ত হইয়া মানবের দুয়ারে পড়িয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তিজ্ঞানবিশিষ্ট নরকুল বিশ্বপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের দুয়ারে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। তাহারা কুক্কুরের গুণ মাত্র গ্রহণ করে, খাদ্যাদি গ্রহণ করে না; কেন না সেইরূপ খাদ্যাদিতে মানবের অধঃপতন ভিন্ন উচ্চগামী হইবার কোন উপায় নাই। মানুষ বিচারপূর্ব্বক নিরামিষভোজী হইলে ঈশ্বরভক্ত হন এবং তাঁহার সঙ্গ-গুণে আমিষভোজীরা ঈশ্বরভক্তি লাভ পূর্ব্বক আমিষকেও ত্যাগ করিতে থাকে। ভগবদ্‌ভক্তিহীন হইয়া কেহ নিরামিষভোজী হইলে কাম-ক্রোধকে জয় করিতে পারে না এবং

তাহাতে নিরামিষ ভোজনের গুরুত্বও থাকে না। ঈশ্বরভক্ত নিরামিষ ভোজীরও কাম-ক্রোধাদি যে নাশ হইবে তাহা নহে; কাম-ক্রোধাদি বশীভূত হইবে মাত্র। স্বেচ্ছায় প্রয়োজনানুসারে কৃষ্ণভক্ত নিরামিষ-ভোজীগণ কাম ক্রোধাদির যথাযোগ্য প্রয়োগ পূর্ব্বক সত্য সংসারের সৃষ্টি করেন। সেইজন্য কুবের পুত্রদ্বয়ের প্রতি নারদের অভিশাপ ও অন্যান্য ঋষিগণের স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসার কথিত আছে। বুদ্ধিমান মানব যেমন হিংস্র পশুকে বাধ্য করিয়া লোক বিনোদন ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেইরূপ কৃষ্ণভক্ত কামাদিকে বাধ্য করিয়া বিনোদ সংসারের সৃষ্টি পূর্ব্বক কামাদিকেও ধন্য করিতে থাকেন।

অতএব অবিকৃত বীজরূপী জীব মানবের ভোজন করা কর্ত্তব্য। শাকাদি ভোজনে হিংসা হয় বলিয়া, আর্য্য ঋষিগণ শাক ভোজনে শরীরের অপকার বলিয়া একপক্ষে শাক ভোজন নিষেধ করিয়াছেন। তবে জীবকে অস্ত্রাদি দ্বারা সংহার করা অপেক্ষা ধীরে ধীরে সমবেদনা প্রকাশ পূর্ব্বক পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ভোজন গৌণভাবে অহিংসার মধ্যে; একারণ তপস্বী বৈষ্ণবগণ শাক ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদিও বা শ্রীমদ্ভাগবতে "জীব জীবস্য জীবনম্"—অর্থাৎ জীবই জীবের আহার, এরূপ কথিত আছে, তাহা ওই বীজরূপী জীবই জানিবে। যদি ভাগবতের উদ্দেশ্য ভালরূপে জানিতে কারও ইচ্ছা হয়, তবে মহারাজ মুচুকুন্দের দৃষ্টান্তে সে উদ্দেশ্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ হইবে। মহারাজ মুচুকুন্দ বাল্যে কৃষ্ণসেবানন্দে বিভোর থাকিতেন, 'হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ' বলিয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার অসীম বৈষ্ণব-তেজ সন্দর্শন পূর্ব্বক অসুরভয়ত্রস্ত দেবগণ দৈত্যগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার আশায় তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ মানবও স্বর্গসুখভোগী দেবগণের রক্ষক,

সেই কারণ পরম বৈষ্ণব মহামনা দশরথ, যিনি ভগবানকে পুত্ররূপে পাইয়াছেন, তাঁহার দ্বারা স্বর্গে উপদ্রবকারী দৈত্যসংহার, কৃষ্ণগতপ্রাণ অর্জ্জুনের দ্বারা নিবাত-কবচ সংহার—এই সব শাস্ত্রে লিখিত আছে। মহারাজ মুচুকুন্দ বহুদিন যাবৎ যুদ্ধ করতঃ দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন,—তখন কৃষ্ণেচ্ছায় তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই পরলোকগামী হইলে দেবগণ পরমানন্দে তাঁহাকে স্বর্গের আধিপত্য ও এক বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণই জীবের প্রধান আশ্রয় বলিয়া বর দিতে চাহিলে, সেই ভক্তপ্রবর কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে 'আমি বহুদিন জাগরিত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছি, এই জন্য কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে বাসনা করি এবং যে আমার এই নিদ্রা ভঙ্গ করিবে সে যেন তৎক্ষণাৎ আমার রোষদৃষ্টিরূপ অনলে ভস্মসাৎ হয়'—এই বর প্রার্থনা করিলেন। দেবগণ 'তথাস্তু' বলিয়া বর দিলেন। মহারাজ তখন নির্জ্জন গিরিগুহায় গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। ভগবান কৃষ্ণ ভক্তের এই নিদ্রা ভাঙ্গিবার জন্য, কৃষ্ণভক্তের অসীম তেজ জগৎ সমক্ষে দেখাইবার জন্য, কাল যবন নিধন উপলক্ষে সেই গিরি গহ্বরে উপস্থিত হইলেন। গহ্বরে প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় নিদ্রিত ভক্তকে নিজের পীতাম্বর দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক গূঢ় যুক্তিপূর্ণ মানসে সেস্থান হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। দুষ্ট নারকী কাল যবন গুহার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক 'কৃষ্ণ আমার ভয়ে আমার হস্ত হইতে রক্ষা পাবার আশায় এখানে সাধুর মত শুইয়া আছে, আমি কৃষ্ণের তুল্য ভয়ার্ত্তকে ক্ষমা করি না'—এই বলিয়া 'ওরে মূঢ়' কথন পূর্ব্বক যেমন সেই নিদ্রিত বিষধরের ন্যায় রাজর্ষিকে পদাঘাত করিলেন, অমনি জাগ্রত সেই কৃষ্ণভক্ত নিদ্রাভঙ্গজনিত-আরক্ত-রোষদৃষ্টি পতন দ্বারা কাল যবন ভস্মসাৎ হইল! ভগবান করুণানিধি কৃষ্ণ এই ছলে জগতে কি শিক্ষা দিলেন? তিনি জানাইলেন যে, 'ভক্ত ভক্তিযোগে আমাকে

প্রাপ্ত হইয়া কত অসীম তেজ প্রাপ্ত হয়, যে ভক্তের রোষদৃষ্টিতে কাল যবনের তুল্য মহাবলশালী দস্যুও ভস্মাকারে পরিণত হয়। যারা আমার ভক্তের সামান্য তেজে ছাই হইয়া যায়, তারা আমার অনন্ত তেজকে দেখিয়া আমাকে সম্মুখে পাইয়াও ভক্তিযোগে আরাধনা ভিন্ন অন্ধের কাছে মণিখণ্ডের ন্যায় আমাকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না।' পরে ভগবান যখন ভক্তের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন, তখন নারকী কাল যবন যাঁহাকে ভয়াতুর ভাবে পলায়নপর মনে করিয়াছিল, সেই কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁর দাস অভিমানকারী কাল যবন ভস্মকারী মুচুকুন্দ বলিয়াছিলেন—

"তেজসা তেঽবিষহ্যেন ভূরি দ্রষ্টুং ন শক্নুমঃ।
হতৌজসো মহাভাগ মাননীয়োঽসি দেহিনাম্॥"

'হে দেহধারীদের মধ্যে মাননীয়! হে মহান! হে মহাভাগ! অসহনীয় তেজের দ্বারা দীপ্ত তোমার দেহের প্রতি আমি ভাল করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিতেছি না; আমার তেজ তোমাকে দেখিয়া যেন লুক্কায়িত হইয়াছে!' ইহার দ্বারা প্রতীতি হয় ভক্তি ভিন্ন ভগবানের তেজকে কেহই অবগত হইতে সক্ষম নয়। ভক্তিবিহীন কাল যবন ভগবানের তেজকে অবগত হইল না; ভগবানকে সংহার করিতে তার প্রবৃত্তি হইল। সেই কিন্তু ভগবদ্দাসের রোষদৃষ্টিভঙ্গীতে ভস্ম হইল! পরে ভগবানকে বহু স্তুতিনতি করার পর, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণানন্দ পাবার উপায় মুচুকুন্দকে ভগবান নিজেই কহিয়াছিলেন। ঘুম-ভাঙ্গান ঠাকুরকে বাল্যকালের ভক্তিসাগরসিঞ্চিত হারাণ মাণিককে কপটভাবে নমস্কার করিলে যে নিজকে দিয়াও উপকার করিতে প্রবৃত্ত সেই পরম বন্ধু করুণানিধি কৃষ্ণকে স্বয়ং আগত ও বর

দানে উদ্যত দেখিয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী মুচুকুন্দ কহিয়াছিলেন, 'ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনাৎ' ইত্যাদি।—'হে প্রভু তোমার চরণসেবা ভিন্ন আর আমি কিছুই চাহি না। সার্ব্বভৌম রাজা হ'লাম, নবযৌবনা কামিনীবৃন্দের ক্রীড়ামৃগ হ'লাম, নরদেহ অভিমানী দুষ্টদলনকারী হ'লাম, কিন্তু এখন দেখ্‌লাম হে গোবিন্দ! তোমা ভিন্ন সুখদাতা শান্তির ধাম এ জগতে আর কেহই নাই; পুরাতন বন্ধুর মধ্যে একমাত্র তুমিই আছ প্রভু। মায়ার কুহকে পতিত মূঢ় আমি মধ্য সময়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি কত স্বার্থপর বন্ধুকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; কালের অব্যাহত প্রভাবে তারা প্রত্যেকে আমাকে ফেলে চলে গেছে; কিন্তু ফেলে যাও নাই তুমি কৃষ্ণ! মাঝখানে তোমাকে ভুলে থাকা সত্ত্বেও তুমি আমাকে ভুলো নাই। সংসার সুখ-মত্ত মূঢ় মুষিক যেমন ধান্যাদি খাদ্য সংগ্রহপূর্ব্বক নিজ সৃষ্ট গর্ত্ত মধ্যে স্ত্রী-পুত্রাদি সহ চিরসুখে কাল যাপন চিন্তায় নির্ভয়ে অবস্থান করে, পশ্চাতে সংহারকারী যে বিষধর সর্প বিদ্যমান তাহা একবার মনেও করে না, এবং শেষে সেই সর্পের উদরস্থ হইয়া স্ত্রী-পুত্র সহিত পাগল মুষিক সুখের স্বপ্ন যেমন জন্মের মত হারায়, সাধের রচিত গর্ত্ত কোথায় পড়ে থাকে—সংহারকারী সেই সর্পের বাসভূমি হয়, সেইরূপ সংসার-সুখ-পাগল মানব শৃগালকুক্কুর ভোগ্য শ্মশানের ভস্ম, অথবা পচিয়া গলিয়া যে দেহ কীটাকারে পরিণত হইবে, সেই দেহকে লইয়া বাসগৃহাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজন সহ জীবহত্যা-চৌর্য্য-মিথ্যা প্রভৃতি বৃত্তি আশ্রয় করতঃ দূর্ব্বল জ্ঞানহীন জনের নিকট 'আমি মহাবীর জ্ঞানী' হইয়া বিশেষতঃ নারী জাতির কাছে বশীভূত ক্রীড়াশীল শাখামৃগের তুল্য হইয়া, পরম সুখে মুর্খ ইন্দুরের ন্যায় কাল যাপন করিতে থাকে, অন্তকরূপ মহাকাল মৃত্যু যে পশ্চাতে দণ্ডায়মান, ক্ষণ

পরে তাহাকে যে গ্রাস করিবে, তাহার সাধের স্ত্রী-পুত্র বাসগৃহ প্রভৃতি কোথায় পড়িয়া থাকিবে, সে চিন্তা সে মূর্খের নাই! হে কালাতীত নিত্য নিরঞ্জন সনাতন মূর্ত্তে! এই মানব জন্মের উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন জন্য নয়, স্ত্রীসম্ভোগাদি সুখ ভোগ জন্য নয়, অন্য জীবকে সংহার পূর্ব্বক দেহ পোষণ বল বৃদ্ধি নয়,—উদ্দেশ্য জন্য ভক্তি-জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা তোমার চিন্ময় সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে অবগত হওয়া। হে মুক্তিদ! হে বরদ! এই ভক্তি-জ্ঞান সংসারমার্গে ভ্রমণকারী তাপিত জীবের হৃদয়ে আপনা হ'তে উৎপন্ন হয় না। তোমার চিন্ময় রূপকে বিশ্বব্যাপী দর্শন পূর্ব্বক পুলকিত হৃদয়ে ভক্তি-শৃঙ্খলে তোমার চরণকমল বন্ধন করতঃ, যিনি উন্মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় সংসারের সকল বাধাবিঘ্নকে বিদলন করিয়া, নির্ভয়ে কি গৃহে কি বনে সর্ব্বত্রই পরমানন্দ ভোগ করিতেছেন তিনিই সাধু; তাহার সঙ্গগুণে এই ভক্তি-জ্ঞান সংসারী মূঢ় জীবের হইয়া থাকে। এখন হে ভববন্ধন মোচনকারিন! তোমাকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়া সংসারের সুখদুঃখ রূপ বন্ধন কোন্ মূর্খ লইতে আর ইচ্ছা করে? এখন তোমার যে চরণরজ-কণাতে সর্ব্ব সুখ পূর্ণ আছে সেই চরণের দাস হ'তে আমার একান্ত বাসনা।" এই কথা শুনিয়া ভগবান প্রীত মনে কহিয়াছিলেন—

"বিচরস্ব মহীংকামং ময্যাবেশিতমানসঃ।
অস্ত্বেব নিত্যদাতুভ্যং ভক্তির্ময্যানপায়িনী॥
ক্ষাত্রধর্ম্মে স্থিতো জন্তূনবধীর্মৃগয়াদিভিঃ।
সমাহিত স্তত্তপসা জহ্যঘং মদুপাশ্রিতঃ॥" ইত্যাদি

—অর্থাৎ হে রাজন্! আমাতে মন নিবেশ পূর্ব্বক তুমি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করো। মৎসম্বন্ধী যে অনপায়িনী ভক্তি তোমাতে তাহাই হউক;

কিন্তু ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপালন জন্য মৃগয়াদি হেতু প্রাণীবধজনিত যে পাপ তাহা আমাতে শরণাপন্নমানসে তপস্যার দ্বারা দূরীভূত করো। ইহার দ্বারা জানা যাইতেছে যে, যে সকল বন্য সিংহ ব্যাঘ্র অথবা বন্য মত্ত শূকর গ্রামে আসিয়া প্রজালোকের প্রাণ নাশ করে তাহাদের সংহার করিয়া দুষ্ট সংহার হেতু ধর্ম্মপালন জন্য যে জীবনাশ, ভগবানকে পাইতে হইলে তাহাও ত্যাগ করিতে হইবে; আর নিজ স্বার্থ পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নিরীহ ছাগ মৎস্যাদির সংহার যে মনুষ্য মাত্রেরই একবারেই নিষিদ্ধ—ইহা আর বেশী করিয়া জানাইতে হইবে না। অতএব এই সব আলোচনার দ্বারা লীলাশক্তি বিশিষ্ট জীবদেহকে নাশ করা হিংসা, বীজরূপী জীবকে নাশ করা অহিংসা জানিবে। প্রাণহীন, রোগবীজযুক্ত, বিষদূষিত বিকৃত মৃত জীবদেহ ভোজন অহিংসার মধ্যে হইলেও তাহা ভোজনে মানবের পূর্ণরূপ অকল্যাণ সংঘটন এবং ভূত-প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় বলিয়া মৃত জীবাদি ভোজন করিতে নাই। প্রাণযুক্ত দুর্ব্বল জীবকে সংহার পূর্ব্বক যে ভোজন তাহা সিংহ-ব্যাঘ্র-শৃগাল-কুক্কুর প্রভৃতির ন্যায় পশুত্ব আনয়নকারী, অতএব ইহাও মানবের কর্ত্তব্য নহে। অন্ত্যজ শ্রেণীর অণ্ডাদি প্রথম জীবদেহের পরিণতি, তাহা নাশ করা গর্ভস্থ ভ্রূণ হত্যার ন্যায় পাপকর ও হিংসা জানিবে। কোন কৌশলে দুষ্ট জীবের হস্ত হইতে প্রাণরক্ষা করিয়া নির্জ্জনে কৃষ্ণ-চরণ-চিন্তা, অথবা কৌশলে লোকসমাজে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা, মানবত্বদানের পূর্ণ হেতু। সচল জীব সচল জীবের জাতীয় ভাই, অচল জীব বিজাতীয় ভাই। এই হেতু সচল জীবকে সংহার না করিয়া অচল জীব শ্রেণীভুক্ত শাকাদি ভোজনের প্রবৃত্তি দান পূর্ব্বক জাতীয় ভ্রাতৃপ্রেমরূপ সাধারণ ধর্ম্ম প্রচার আর্য্য তপস্বীগণের অনুমোদিত। প্রথম অবস্থায় শাকাদি ভোজনে

সাধারণ ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়, অন্যথা জীব জীবানুপূর্ণ জগতে বিশ্বপ্রেম ধর্ম্ম পালন করিবার উপায় আর নাই। সমবেদনা প্রকাশ পূর্ব্বক অচল জীব বা বীজরূপী জীব ভোজন দ্বারা ভগবৎ ধ্যানে মগ্ন হইলে, অন্তর্য্যামী কৃষ্ণ তাহার মনের অভিপ্রায় জানিয়া তাহাকে নিজ তুল্য চিন্ময় দেহ দিয়া থাকেন। যখন মানব চিন্ময় দেহ লাভ করে, তখন তাহার দ্বারা কোন প্রকার হিংসা সাধিত হয় না। ধর্ম্মাদি পালন জন্য মুচুকুন্দের ন্যায় সচল জীবকে নাশ করা—ইহাও আর একটী সাধারণ ধর্ম্ম। যে সকল আমিষভোজী, শাক-ফল-মূল-শস্যাদিতে জীবত্বের অস্তিত্ব দেখিয়া 'তাহাদিগকে নাশ জীবহত্যা' ইহা জ্ঞাপন করতঃ আমিষ নিরামিষ উভয় শ্রেণীর জীবদিগকে সংহার পূর্ব্বক ভোজন করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষেই কঠোর হৃদয় ঘাতকের মধ্যে গণ্য জানিবে। কেন না, সচল শ্রেণীর জাতীয় ভাইকে হত্যা করিয়া জীবহত্যাকর গ্লানি যাহার মনে উদয় হয় না, সে যে শাক-ফল-মূলাদিতে দয়া দেখাইবার জন্য জীব নাশের আরোপ করিতেছে তাহা নয়; বিশ্বব্যাপী হিংসা বৃত্তি চরিতার্থের কৌশলমাত্র সে করিতেছে—ইহাই জানিবে। তাহাদের মতে সবকে মার নিজের প্রাণ রাখ—এইমাত্র ভাব দেখা যায়। ভগবানের রাজ্যে যে পাঁচজনকে ভালবাসিবে সে পাঁচজনের ভালবাসা পাইবে। আমিষ নিরামিষ ভোজীরা কাহারও ভালবাসা পাইল না, ঈশ্বরের নেত্রে তাহারা নিষ্ঠুর ভিন্ন আর কি বলিয়া বা পরিচিত হইবে? মানবহৃদয়ে জীবদয়া-হিরন্ময়ী-প্রতিমার বিশুদ্ধত্ব পরীক্ষার জন্য ধর্ম্ম ব্যাধরূপ কষ্টি পাথরের সৃষ্টি মহামুনি বেদব্যাসই করিয়াছেন; যে ঘটনার দ্বারা আমিষ ভোজীরা নরকে যাইতেছে এবং নিরামিষ ভোজীরা প্রেমস্বর্গের আধিপত্য লাভ করিতেছে।

ভগবানের ভক্ত হইয়া সাধারণ ধর্ম্ম পালন করিলে ভগবান সহায়

হইয়া মুচুকুন্দের ন্যায় সাধারণ ধর্ম্মীকে বিশেষ ধর্ম্মের পথে চালিত করেন। আর সাধারণ ধর্ম্ম না করিয়া পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য খাদ্যরূপে যে জীবনাশ, তাহা বিশ্বপ্রেমময় ভগবৎ ভক্তের কর্ত্তব্য নয়। বিশ্ব প্রেমময় যে ধর্ম্ম তাহাই বিশেষ ধর্ম্ম—যে ধর্ম্মের পালনকারী মানবকুল "আব্রহ্ম তৃণস্তম্ব মায়য়া কল্পিতং জগৎ" ব্রহ্ম হইতে একটি তৃণ পর্য্যন্ত মায়ার দ্বারা সৃষ্টি ইহা অবগত হইয়া, অথবা "খল্বিদং ব্রহ্ম" এ সংসারে সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম বস্তু বিদ্যমান দর্শন পূর্ব্বক অবিনশ্বর আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হন। এই বিশ্বপ্রেমময় ধর্ম্মে মানবের সর্ব্বশক্তিমানত্ব, খাদ্যখাদকে প্রণয় সঞ্চার ও সর্ব্ব শক্তিমান ভগবানের সাক্ষাৎকার সংঘটিত হয়,—যে বিশ্বপ্রেমময় বিশেষ ধর্ম্ম পালনকারী পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুব সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতিকে "আমার পদ্মপলাশ-লোচন হরি, তুমি কোথায়" এই বলিয়া কাঁদাইয়াছিলেন, অতি দুরাচার হিংস্র পশুর হৃদয়েও খাদ্যখাদকে প্রণয়-সঞ্চার তাহা সাক্ষাতে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, যে ধর্ম্মপালনকারী শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীপাদ রসিকানন্দ ঠাকুর বন্য উন্মত্ত হস্তীকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তণ শ্রবণে আনন্দ নর্ত্তন বৈষ্ণবের সেবায় মনুষ্যবৎ আজ্ঞাপালনকারী করিয়াছিলেন। আর আমার গৌরাঙ্গ গুণ-নিধির কথা চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে; প্রভুর আদেশে—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল।"—ইত্যাদি

যাঁহার আদেশে ব্যাঘ্র নাচিয়াছে স্থাবরজঙ্গম কীটপতঙ্গ নাচিয়াছে, শুষ্ক মরুভূমিতে প্রেমের নদী বহিয়াছে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাবতারী ভগবান। সুতরাং এ কার্য্য তাঁহার দাসগণ যে করিবেন তাহাও কিছু আশ্চর্য্য নয়; কেননা—'কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলই সঞ্চরে।' কৃষ্ণভক্তের মহিমামণ্ডিত পুরাণকাব্যাদি জগতকেও প্রেমময়

করিতেছেন। বিশ্বপ্রেম ধর্ম্মাবলম্বনকারী সেই বৈষ্ণব ঠাকুরগণ সর্ব্বোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুপত্নী পৃথিবীর বক্ষ শীতল করুক। সর্ব্ব জ্বালা দূরকারী বিশ্বপ্রেমময় কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবগণ জাতি মর্য্যাদার অতীত ভগবৎ শরীরে অবস্থান করেন ইহা নিত্য; অতএব গঙ্গা নদী তুল্য দৃষ্ট হইলেও তিনি সাধারণ নদীর তুল্য না হইয়া যেমন বিষ্ণু চরণামৃত, গরুড় পক্ষী হইলেও সাধারণ পক্ষীর তুল্য না হইয়া যেমন বিষ্ণুপার্ষদ, গোবর্দ্ধন-গিরি সাধারণ পর্ব্বত সঙ্গে তুলিত না হইয়া তিনি যেমন ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ, সেইরূপ মনুষ্যাকারে পরিণত হরিদাস বৈষ্ণবগণ সাধারণ মানবের তুল্য নহে, অপ্রাকৃত চিন্ময় শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদরূপে কথিত। এই কারণ কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবের জাতি নির্দ্দেশ করা পাপজনক পাগলামি মাত্র। এখন কৃষ্ণের জাতি ঠিক করিতে গেলে যেমন কোনটাই ঠিক হয় না, যেহেতু কৃষ্ণ মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-আভীর প্রভৃতি সর্ব্বরূপ ধারণ করেন, অতএব কৃষ্ণ কোন্ জাতি আর কোন্ জাতি নয়! সেইরূপ কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগণ সব জাতি, আর সব জাতি নয়। শেষ কথা—কৃষ্ণের ন্যায় কৃষ্ণভক্তেরা সর্ব্ব পূজ্য, কেননা কৃষ্ণের ন্যায় তাহারা উচ্চ নীচ কূলে অবতীর্ণ হইয়া আপন প্রভুর মহিমা প্রকাশ করিতে থাকেন। কৃষ্ণের পার্ষদ ভিন্ন এবং কৃষ্ণের অংশ ভিন্ন কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব উৎপন্ন হয় না। অন্ধকার মলিন খনির মধ্যে যেমন চিরসুন্দর স্বর্ণ থাকে, সেইরূপ কুসংস্কারাপন্ন নীচকুলে কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বোচ বৈষ্ণবের আবির্ভাব ভগবানের নিত্য অভিপ্রায়। কেননা একটু নীচ না হইলে কোন প্রকারের ভক্ত অভিমান আসে না। পবিত্র গঙ্গাধারার ন্যায় ভক্তি দেবী স্বাভাবিকই নীচ মুখগামিনী। এই কারণ রাম অবতারে ভগবান হইলেন নর, তাহার ভক্তেরা একটু নীচ—বানর। কৃষ্ণলীলা স্বয়ং ভগবানের লীলা, এই জন্য এ অবতারে নীচ কুলের গৌরব

দেখাইবার জন্য ব্রাহ্মণাদি উচ্চ কুল ত্যাগ করিয়া গোপকুলে ভগবানের আবির্ভাব। তাঁহার ভক্তগণ গোপ জাতি হইয়াছে। হে জীব! যে ছোটকে বড় করিতে পারে, সেই করুণানিধি জগৎস্বামী কৃষ্ণকে কায়মনোবাক্যে আরাধনা কর। "কৃষ্ণার্থে নিখিল চেষ্টা", কৃষ্ণকে পাবার জন্য সকল চেষ্টাকে রাখিতে হইবে। একারণ প্রেমময় করুণানিধিকে পাইতে হইলে হিংসাদ্বেষাদি বর্জ্জিত হইয়া—

"সর্ব্ব দেবে পূজিবে না হইবে তৎপর ;
সব কাছে মেগে লবে কৃষ্ণভক্তি বর ॥"

—দেবসকলকে পূজা করিবে কৃষ্ণকে পাবার জন্য, যে ভাব লইয়া ব্রজদেবীগণ কাত্যায়নী অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ব্রজদেবীগণ কৃষ্ণ পাবার জন্য দেবীকে নমস্কার করিতেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"নন্দগোপসুতং দেবী পতিং মে কুরুতে নমঃ !"

—অর্থাৎ হে দেবি কাত্যায়নি ! হে জগদম্বে ! ঐ যে নন্দনন্দন শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ উঁহাকে আমাদের পতি করিয়া দাও। দেবী তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, ব্রজগোপীদের মনের মত জগৎস্বামী, ভুবনমোহন মৃত্যুজরা-রহিত চিন্ময় দেহ নবকিশোর নটবর স্বামী মিলিয়াছিল। দেবীকে পূজা করিতে হইলে ইঁহাকে পাবার জন্য পূজা করিবে ; তাহা হইলে তোমার সব সুখ হইবে। নতুবা 'কিসে আমার অর্থাদি আসিবে, সকলের সর্ব্বনাশ করিয়া আমি রাজা হইব' এই ভাব লইয়া দেবী পূজা করিলে, তোমার ওই রাক্ষস রাবণের মত সর্ব্বনাশ হইবে। জীব! চিরদিন তোমার বর্হিমুখী অবস্থা ; তুমি দেবদেবীকে পূজা করিবে অর্থের জন্য, দেখিতে দেখিতে মরণশীল পরিবর্ত্তনশীল স্বার্থপর স্বামী-পুত্রাদির জন্য, নিত্য

সমভাবে অবস্থানকারী সর্ব্ব সুখদাতা কিশোর বয়স বাঁশী বাজান ঠাকুরের জন্য নহে ; সেই কারণ তোমার যত দুঃখ। এই হেতু তোমার দুঃখে দুঃখিত করুণানিধি কৃষ্ণের দাস করুণাপূর্ণ হৃদয় বৈষ্ণব ঠাকুর তোমার সুখের উপায় বলিতেছেন—

"হৃষিকেন হৃষিকেশং সেবনং ভক্তিরুত্তমা।"

অথবা—

"হৃষিকে গোবিন্দসেবা, না পূজিব দেবীদেবা<br>এই ভক্তি পরম কারণ ॥"

—অর্থাৎ তোমাকে কোন দেবদেবীর পূজা করিতে হইবে না। হৃষিক—অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা গোবিন্দসেবা করিলে পরম ভক্তির কারণ হয় ; পরম ভক্তির কারণ হইলে, ভক্তের ভগবান ; এই কারণ বশতঃ ভক্তি আসিলে ভক্ত, ভক্ত হইলে সর্ব্ব সুখদাতা ভগবান গোবিন্দ মিলিবে ; আর দেবদেবীর পূজা করিতে হইবে না, এক কৃষ্ণকে পূজা করিলে সকলের পূজা করা হয়—এই হেতু শ্রীমদ্ভাগবতে "যথা তরুমূল নিসেচনেন" ইত্যাদি শ্লোক আছে, অর্থাৎ বৃক্ষের মূলে জল দিলে শাখাপ্রশাখা পুষ্পপল্লব প্রভৃতিতে যেমন দিতে হয় না, সেইরূপ জগৎ মূল "অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব্ব কারণকারণম্" অর্থাৎ অনাদি যে অনন্ত সঙ্কর্ষণ তাহার আদি যে বৃন্দাবনবিহারী শুদ্ধ গোপবেশ বেণুধারী রাধারমণ কৃষ্ণ গোবিন্দ, তিনি সংসারের সকল কারণের হেতু স্বরূপ, তাঁহাকে পূজা করিলে সকলের পূজা করা হইবে। কৃষ্ণরূপী প্রাণকে রক্ষা করিলে হাত পা রূপী দেবগণের কার্য্য আপনিই চলিবে ; নতুবা হাতপায়ে খুব আলতা পরাও স্বর্ণমণি ভূষণ সজ্জিত করো, প্রাণের সেবা যে ভোজন তা কিছু করিও না—দেখিবে তোমার হাতপাও শুষ্ক

হইয়া কার্য্যকরী বৃত্তি ছাড়িয়া দিবে; আর হাত পাকে সাজাতে হবে না, প্রাণ যে শুধু ভোজন চায় তাই তাকে দাও, দেখিবে হাতপা ঠিক নিয়ম মত কার্য্য করিবে নিস্তেজ হইবে না। সেইরূপ কৃষ্ণসেবা করিলে সকলের সেবা করা হইবে। তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে দেবগণ কৃষ্ণের ভক্ত বা অঙ্গ তাহাতে প্রাণরূপী কৃষ্ণ। প্রাণরূপী কৃষ্ণকে রাখিতে হইলে, হাত পা রূপী দেব দ্বারা কার্য্য করো, অর্থাৎ প্রাণকে রাখিবার জন্য হাতের দ্বারা কার্য্য করিতেছি, পায়ের দ্বারা চলিতেছি ইত্যাকার শিবকে পূজিতেছি, শিবের প্রিয় আরাধ্য বস্তু কৃষ্ণকে পাবার জন্য—এই ভাবে সব দেবকে পূজিবে; কদাচ শিবাদিকে নিন্দা করিবে না তাহা হইলে কৃষ্ণের নিন্দা করা হইবে। কেন না নিখিল ভক্ত দেব অঙ্গ বিশিষ্ট কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ; যদি কোন পুরুষকে সম্মান করিয়া তাহার কোন অঙ্গকে নিন্দা করা যায়—লোকটী ভাল বটে, কিন্তু চোখ দুটো তত ভাল নয়, বানরের মত মিটিমিটি ক রয়া দেখে—তাহা হইলে দুঃখ হয়ত সেই পুরুষেরই হইবে, চক্ষুর হইবে না। কৃষ্ণভক্ত শিবাদির নিন্দা করিলে, দুঃখ হয়ত কৃষ্ণেরই হইবে শিবাদির হইবে না, সেই কারণ কৃষ্ণনিন্দা জনিত দুঃখ তোমাকে পাইতেই হইবে। প্রজাসৃষ্টি রত অভিমানী প্রজাপতি দক্ষ অভিমানে কৃষ্ণপ্রেম ভুলিয়া 'আমি শ্রেষ্ঠ' এই অহঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক শিবনিন্দা করিয়া কৃষ্ণকেই নিন্দা করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই কৃষ্ণ নিন্দা পাপে তাঁহার ছাগমুণ্ড হইয়াছিল। ভগবান করুণানিধি, শেষে দক্ষ যজ্ঞ অবসানকালে নিজে তথায় উপস্থিত হইয়া অভিমানী দক্ষকে তত্ত্ব শিখাইয়াছিলেন; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"যথা পুমান্নস্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষুঃ ক্বচিৎ।
পারক্য বুদ্ধিং কুরুতেবং ভুতেষু মৎপরঃ॥

—অর্থাৎ পুরুষ যেমন নিজের মস্তক হস্ত প্রভৃতি অঙ্গকে পরের বলিয়া ঘৃণা বা নিন্দা করে না, সেইরূপ মদাশ্রিত জনগণ সর্ব্ব পঞ্চ ভূতাত্মক জগৎকে আমার অঙ্গ জানিয়া ঘৃণা বা নিন্দা করে না। এই কারণ হে দক্ষ! তুমি শিবনিন্দা করিয়া আমাকেই নিন্দা করিয়াছ এবং তজ্জনিত পাপে তোমার যজ্ঞ ভঙ্গ, ছাগমুণ্ড, দাক্ষায়নী সতীকন্যার দেহত্যাগ ঘটিয়াছে! অতএব দেবাদির নিন্দা করিতে নাই, অথবা কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহাদের সমজ্ঞান করিতে নাই। হাতকে হাত, পাকে পা, মাথাকে মথা, এ সমুদয় লইয়া যেমন একটী শরীর বলা হয়, সেইরূপ শিবকে শিব, ব্রহ্মাকে ব্রহ্মা, জীবকে জীব, আর এই সমুদয় লইয়া কৃষ্ণের শরীর বলা হয়। হাতকে মাথা, বা হাতকে দেখিয়া 'সব শরীর দেখিলাম' একথা বলিলে যেমন পাগলামি করা হয়, সেইরূপ শিবকে কৃষ্ণ বা জীবাত্মা কৃষ্ণ এ বলিলে পাগলামি করা হয়। তবে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বলিয়া উপনিষদের যে "আমি সেই ব্রহ্ম হই" বিচার, তাহা গৌণ অর্থে জীব পক্ষে করা হইয়াছে। গৌণ অর্থের বিচার এইরূপভাবে গৃহীত হইয়াছে—যেমন 'দেবদত্ত সিংহ' বলিলে, কেহ লোম লাঙ্গুল বিশিষ্ট পশুরাজ সিংহকে বুঝিবে না, 'দেবদত্ত একজন মানুষ, সিংহের মত তেজ তাহাতে কিছু আছে' এইরূপ বুঝিবে, সেইরূপ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যে 'সর্ব্বশক্তিমান নির্ব্বিকার ব্রহ্ম কৃষ্ণই আমি' তাহা বুঝাইবে না; আমি তাঁর কিছু শক্তিধারী অনুচৈতন্য জীব, কৃষ্ণের দাস মাত্র, এই বুঝাইবে। কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব কৃষ্ণের অঙ্গ, তাঁহার নিন্দা বা ঘৃণা করা কত মহাপাপ তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণব-অপরাধকে সব অপরাধের মধ্যে গুরুতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্য সর্ব্বপাপকারী কেবল বৈষ্ণব-অপরাধহীন জগাই মাধাইকে তিনি উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব-

নিন্দুক মহাপাপকারী পণ্ডিত চপল গোপালকে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত করিয়া বৈষ্ণব-অপরাধীর যে কি ভীষণ নরক যন্ত্রণা তাহা জগৎ চক্ষে দেখাইয়াছিলেন। শাস্ত্রকার বলিতেছেন,

"বৈষ্ণব নিন্দন্তি শূকরা গ্রাম শুধ্যন্তি-শূকরা"

—অর্থাৎ এক প্রকার শূকর বিষ্ঠাদি ভোজী গ্রাম শোধনকারী, আর এক প্রকার শূকর কৃষ্ণভক্ত নিন্দাকারী মানুষরূপী। মহাপুণ্যবান না হইলে বৈষ্ণবে বিশ্বাসভাজন হয় না, এই কারণ পদ্মপুরাণ কহিতেছেন—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্প পুণ্যবতাং রাজন বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

—হে রাজন্, মহাপুণ্যবান ব্যতীত অল্প পুণ্যকারীদের মহাপ্রসাদে কৃষ্ণে, তারকব্রহ্ম নামে এবং কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় না। কৃষ্ণ যেমন উচ্চ, কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবও তেমনি উচ্চ। বৈষ্ণবত্ব উচ্চ বলিয়া বৈষ্ণব হওয়া বড় কঠিন, এই সন্দেহ অনেকের আসিতে পারে, তৎমিমাংসা সূচক কথা প্রহ্লাদ দৈত্যবালকদিগকে কহিয়াছিলেন—

"নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বা সুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥" (ইত্যাদি)

—হে দৈত্যবালকগণ! সর্ব্বসুখদাতা মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ জন্য, ব্রাহ্মণ হ'তে হ'বে না, ঋষি বা দেবতা হ'তে হ'বে না এবং গোবিন্দ অর্চ্চণার জন্য পণ্ডিত হওয়া বা বহু কিছু জান্‌বার আবশ্যক নাই; দান করিতে হইবে না, তপস্যা, যজ্ঞ, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ-ব্রতাদি জনিত

যে পবিত্রতা, ব্রত করিতে হইবে না, কেননা এসব অন্য রকম ভাবে বিড়ম্বনা (বাধা) উৎপন্নকারী; একমাত্র প্রাণঢালা ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন। ব্রাহ্মণ, ঋষি, দেব প্রভৃতি অভিমান, 'আমি উচ্চ' এই ভাব আনয়ন করতঃ দ্বিতীয় কর্ত্তা সূচক সাংসারিক শোক-দুঃখ মোহাদির কারণ হইয়া থাকে। 'এই আমি একজন দ্বিতীয় কর্ত্তা, ইহাকে আমাকে রক্ষা করিতে হইবে, আমি ভিন্ন ইহার সুখদাতা আর কে আছে' এইরূপ যে দ্বিতীয় অভিমান সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্ব রক্ষক কৃষ্ণের আশ্রয় হইতে পৃথক করিয়া সংসার ভয়ের কারণ হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে নব যোগীন্দ্র সংবাদ উপলক্ষে বলিতেছেন, "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" অর্থাৎ 'কৃষ্ণ হইতে আমি একজন দ্বিতীয় কর্ত্তা' রূঢ়ভাবে এই চিন্তাবশতঃ জীবের সংসার ভয় আসিয়াছে। জীবের এমন ভাবে সর্ব্ব সুখের উদয় হয়; সমুদ্রের ভিতর যেমন মৎস্য, গর্ভের ভিতর যেমন বালক, সেইরূপ সর্ব্বসুখদাতা গোবিন্দের ভিতর আমি। সেই সুখনিধি কৃষ্ণের আশ্রয় ত্যাগ করিলে সমুদ্র-মৎস্যাদির ন্যায় আমার দুঃখ হইবে। দ্বিতীয় অভিমানকারী শ্রীমান অর্জ্জুন 'আমি কুরুকুলকে কি করিয়া সংহার করিব, এরা যে আমার আত্মীয় বান্ধব' এই বলিয়া অস্ত্রাদি ত্যাগ করিলে অমনি শ্রীগোবিন্দ গীতারূপ বংশীধ্বনি দ্বারা "ও অর্জ্জুন! আমাকে সারথী তোমার চালকরূপে নিযুক্ত করিয়াও তুমি আবার কর্ত্তা সাজিতেছ কেন? ইহাদের যে আমিই সংহার-কারক, তুমি সংহারকারী নও" এই বলিয়া সকলকে কালগ্রাসে পতিত দেখাইলে, অর্জ্জুনের বিস্ময় আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং তাঁহাকে সর্ব্বেশ্বররূপে সমাশ্রয় পূর্ব্বক সংসার মোহাদির হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন। এই সব কারণে ব্রাহ্মণাদি অভিমানকে 'বাচীশতন্ত্যা-

মুকুন্দাম্নিবদ্ধাঃ'—অর্থাৎ বাক্য মাত্রই যার নিয়মরজ্জু (আমি ব্রাহ্মণ ঋষি সকলের পূজ্য, তোমাদিগকে আমাদের সেবক রূপে জানিবে—এই যে বাক্যরূপ নিয়মরজ্জু) এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব সূচক দড়িতে বাঁধা জীবকুল অন্ধকারে ভ্রমণ করিতে থাকে, কৃষ্ণরূপ সুখনিধিকে দর্শন করিতে সক্ষম হয় না। অতএব হে দৈত্যবালকগণ! এইরূপ ব্রাহ্মণ ঋষি বা দেবভাব তোমাদের ধরিতে হইবে না। 'আমি কৃষ্ণদাস বা তাঁর দাসানুদাস' এই অভিমান এই ধ্রুবপদবীরূপ বৈষ্ণব অভিমান ধারণ কর। ইহাতে কোন বন্ধনের কারণ নাই; কেননা 'অখিলস্বামী কৃষ্ণই আমার প্রভু, আমি তাঁর সেবক' এই অভিমানে কৃষ্ণসেবা করিতে করিতে, বিশ্বব্যাপী গোবিন্দের আনন্দময় মোহনমূর্ত্তি যখন জীবের নেত্রে পতিত হয়, তখন সে সকলেই কৃষ্ণদাস জানিয়া সকলকে কৃষ্ণদাস তাঁর দাসের দাস হইতে চেষ্টা করে; আঁধারের জীবকে আলোকের ঘরে লইয়া যাবার চেষ্টা করে। নিজের তুল্য সবকে মনে করে, এই কারণ কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবদাস অভিমানকারী ভজননিরত জনগণের কোন বন্ধনভয়ের কারণ থাকে না। তবে বৈষ্ণবীয় শাসন আচরণ সকলকে এক কৃষ্ণদাস করিবার প্রধান উপায়, এই কারণ সেই সব পালন করিতে হইবেই হইবে। এইরূপ শাসন আচরণ পালনকারীরা বৈষ্ণব, তদ্ভিন্ন সকলেই অবৈষ্ণব। এই বৈষ্ণব তত্ত্বে প্রবেশকারী জনগণের সমীপে ব্রাহ্মণত্ব-ঋষিত্ব-দেবত্ব আপনা হতে সব আসিয়া যায়। বৃক্ষকে অধিকার করিলে যেমন তার পত্র-পুষ্প-ফল-ছায়া ইত্যাদি সব পাওয়া যায়, সেইরূপ ভগবদ্দাস বৈষ্ণবতত্ত্ব অধিকারের ভিতরে যাবতীয় উচ্চ ভাব আপনা হ'তে এসে যায়। হে বালকগণ! এমন কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব অভিমান ত্যাগ করিয়া দুঃখ বন্ধন আনয়নকারী 'আমি শূদ্র ও ব্রাহ্মণ বা আমি দৈত্য ও দেবতা' এই অভিমান

বশতঃ 'দুঃখ দায়ক স্বার্থপর বন্ধনাবদ্ধ জীবের দাস আমি' এ অভিমান মনে আনিও না। তাহাকে স্বার্থপর বা মায়াপরায়ণ বলে, যে নিজে যে সুখভোগ করে সেই সুখ অপরকে ভোগ করিতে দেয় না বা দিতে ইচ্ছা করে না। প্রেমময় বৈষ্ণবধর্ম্ম জগৎকে আপন ও এক সূত্রে বাঁধিবার প্রধান উপায় জানিয়া করুণানিধি ভগবান এই ধর্ম্মকে অত্যন্ত ভালবাসেন। ভগবানের পূর্ণ সমাশ্রিত এই বৈষ্ণব বা ভক্ত ধর্ম্ম বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ এই ধর্ম্মাবলম্বীকে সাংসারিক পাপাশ্রিত মানুষের জন্য যে কষ্টকর প্রায়শ্চিত্ত-ব্রত-দান-যজ্ঞের বিধান তাহা বৈষ্ণবের নাই, এইরূপ বিধান করেন। তবে শ্রীহরির সন্তোষ জন্য যে হরিবাসর-একাদশী-ব্রতাদি তাহাই বৈষ্ণবের পালনীয়। যজ্ঞের জন্য বহু বস্তুর প্রয়োজন, গোবিন্দ ভজনের জন্য সে সবের প্রয়োজন নাই। তুলসীপত্র-জল গোবিন্দের প্রিয়, তাহা সর্ব্বত্র সুলভ; যদি বা তাহার অভাব হয়, তবে মন-তুলসীর ত কাহারও অভাব নাই; মন দিয়া 'হা গোবিন্দ' বলিয়া ডাকিলে তিনি পরম সন্তোষ লাভ পূর্ব্বক ভক্তের সমীপে আপনাকে বিক্রয় করিয়া দেন। কঠোর তপস্যার প্রয়োজন নাই; যুক্তি পূর্ব্বক আহারবিহার করতঃ প্রাণ ভরিয়া কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিলে কৃষ্ণ তোমারই হইবে। দানের জন্য অর্থাদির প্রয়োজন, কৃষ্ণভক্তির জন্য অর্থাদির প্রয়োজন হয় না, কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ করিলে মনে যে চৈতন্যের উদয় হয়, তাহাতে কৃষ্ণের ভজনকারিণী প্রবৃত্তি বা ভক্তি আসে। যে কৃষ্ণভক্তি পাবার আশায় মানবের দান করিবার বিধান করা হইয়াছে, তাহা যদি কৃষ্ণভক্তের সঙ্গগুণে আসিল, তবে আর দানের আবশ্যক কি? তবে যে অর্থাদি দানে কৃষ্ণভক্তের সমাগম ও কৃষ্ণভক্তি উদয় হইবার উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, দান করিতে হয়ত সেইরূপ দান বিধেয়। অনেক কপট সংসারী নারকী

সংসার সুখভোগের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, কৃষ্ণভক্তের কার্য্যার্থে সেই তুলনায় কপর্দ্দক মাত্র দিয়া যথাসাধ্য বলিয়া দীনতা প্রকাশ করিতে থাকে। এইরূপ মানবের শুদ্ধ ভক্তি হওয়া অনেক জন্মের গতাগতির দ্বারা হইবে। হে বালকগণ! আরও বলি কৃষ্ণনাম গুণকীর্ত্তনকারীর মত দাতা আর নাই—এই বলিয়া প্রহ্লাদ ভক্তজনের চিরভাব্য ব্রজ সুন্দরীদের সেই গোপীগীতার শ্লোক শুনাইলেন—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতঃ কল্মষাপহম্।
শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাদতং ভুবি গৃণন্তিতে ভূরিদা জনাঃ॥"

নিত্য সিদ্ধ ব্রজগোপীগণ বলিয়াছিলেন—হে প্রাণনাথ! এজগতে প্রচুর দানকারী জন তাঁহারা যাঁহারা ব্রহ্মাদিস্তুত পাপনাশকারী শ্রবণের মঙ্গলদায়ক, সর্ব্ব ঐশ্বয্য দানকারী তাপিত জীবের শীতল সলিলের ন্যায় পরামৃত স্বরূপ তোমার লীলাকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীমান প্রহ্লাদের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক দৈত্য-বালকগণ শ্রীকৃষ্ণচরণে মনোনিবেশ করিলেন। অতএব এই সব আলোচনার দ্বারা কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব হওয়া সহজ, কদাচারী পাপী ক্ষণিক সুখভোগী ভ্রান্ত জীবের কাছে ইহা কঠিন বলিয়া প্রতীত হয় বটে; কিন্তু হে জীব! সে ভ্রান্তিকে দূর কর। কঠিন বলিয়া ভৃত্য তুমি প্রভুর কার্য্য করিবে না! কঠিন বলিয়া পুত্র তুমি পিতার কার্য্য করিবে না! কঠিন বলিয়া নারী তুমি স্বামীর সেবা করিবে না! আচরণ কর নাই বলিয়া যে কার্য্য তোমার কাছে কঠিন হইয়াছে, আচরণ কর, সেই কাজ তোমার কাছে সুখদ বলিয়া প্রতীত হইবে। কৃষক বৃষ্টি-রৌদ্র তাপযুক্ত দিনে আনন্দমনে ক্ষেত্রে কাজ করে, তখন অজ্ঞান বালক তাহাকে কতই কষ্টকর বলিয়া

মনে করে; পরে সে যখন ওই কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তখন কৃষিকার্য্য তার কাছে অতি সহজ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে থাকে। তদ্রূপ ভাগবত ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম আচরণ করিলে সহজ সুখকর, আচরণ না করিলে কঠিন ও দুঃখদায়ক। এই বৈষ্ণবধর্ম্ম বাল্যকাল হইতে সর্ব্ব মানবের পালনীয়; তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তবর শ্রীমান প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে যাহা কহিয়াছিলেন তাহা এই—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্য ধ্রুবমর্থদম্॥"

—অর্থাৎ হে দৈত্যবালকগণ! হে ভ্রাতৃগণ! জগতের মধ্যে পরম জ্ঞানী মানব যাঁরা তারা কৌমার বয়সের (ভূমিষ্ঠ বৎসর বয়সের) সময় হইতে এই ভাগবতধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম আচরণ করেন; কেননা মানব জন্ম দুর্ল্লভ হইলেও অনিশ্চয় অর্থদায়ী ক্ষণভঙ্গুর। অর্থাৎ সংকল্প পূর্ণ হইতে না হইতে মানবের মরণ হওয়া সর্ব্বদা সম্ভব, যাঁর কাছে সুখ পাবার আশা থাকে তাহার কাছে দুঃখ পাবার আশা সম্পূর্ণ সম্ভব এবং বিষয়সুখ-বাসনাতে অতি নিকৃষ্ট যোনী প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব। কৃষ্ণচিন্তাতে নিযুক্ত থাকিলে এই সকল বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। তিনি মানবের সুখদুঃখ ও পরমায়ু সম্বন্ধে আরও কহিলেন—

"সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহ যোগেন দেহিনাম্।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাৎ যথা দুঃখমযত্নতঃ॥
তৎ প্রয়াসো ন কর্ত্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্॥
পুংসো বর্ষ শতং হ্যায়ুস্তদর্দ্ধং চাজিতাত্মনঃ।
নিষ্ফলং যদসৌ রাত্র্যাং শেতেঽন্ধং প্রাপিতস্তমঃ॥

মুগ্ধস্য বাল্যে কৌমারে ক্রীড়তো যাতি বিংশতিঃ।
জরয়া গ্রস্ত দেহস্য যাত্যকল্পস্য বিংশতিঃ॥
দূরাপূরেণ কামেন মোহেন চ বলীয়সা।
শেষং গৃহেষু সক্তস্য প্রমত্তস্যাপ যাতি হি॥"

—ইতি শ্রীমদ্ভাগবত।

হে দৈত্যবালকগণ! চেষ্টা না করিলে যেমন দুঃখ আপনা হ'তে জীবের কাছে আসে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সুখ চেষ্টা না করিলেও দৈবাৎ আসিয়া থাকে। চেষ্টা না করিলে যখন ইন্দ্রিয়সুখ আপনা হতে দৈবাৎ আসিয়া যায়, তখন সেই সুখের চেষ্টা করিয়া বৃথা পরমায়ু নষ্ট করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু মঙ্গলধাম মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল দৈবাৎ আপনা হতে জীব প্রাপ্ত হয় না; অতএব শ্রীকৃষ্ণচরণ পাইবার জন্য সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। জগতে মানবের পরমায়ু শত বৎসর। অজিতেন্দ্রিয় মানুষের পঞ্চাশ বৎসর মাত্র। শত বৎসর মধ্যে রাত্রিতে নিদ্রার জন্য অর্দ্ধেক পরমায়ু নষ্ট হয়; বাল্য খেলাদিতে বিংশ বৎসর, বৃদ্ধত্ব রোগ যন্ত্রণাদিতে বিংশ বৎসর, বাকী দশ বৎসর নারী সঙ্গে ভোগ-বিলাসাদিতে নিষেবিত হইল; জীবনের গণা দিন এই ত ফুরাইল, পরমায়ুর সমুদয় সময় যদি এই সব কাজে বিভক্ত করিলে, তবে আর কৃষ্ণভজন কোন সময় করিবে? কৃষ্ণ ভজন না করিলে বারবার গর্ভ-নরক-যন্ত্রণা ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতে হইবে; অতএব খাওয়াপরা শিক্ষার সময় হইতে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করা সকল মানবের কর্ত্তব্য।

অনেকে গলায় তুলসীর মালা, দেহে তিলক ধারণ, ডোর-কৌপিন ধারণ প্রভৃতিকে 'ধর্ম্মধ্বজীর লক্ষণ গোঁড়ামি মাত্র অহার উপকারিতা কিছুই নাই' বলিয়া তত্তৎ চিহ্নধারী মানবদিগকে উপহাস ও অবজ্ঞার

দৃষ্টিতে দেখেন। অহো! তাদের মত নারকী নরপশু জগতের কলঙ্ক স্বরূপ। মহাজন আচরিত রীতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা সর্ব্বনাশের মূল বলিয়া জানিবে। রাজবেশ রাজসৈন্য সঙ্গে না থাকিলে রাজা যেমন সাধারণ মনুষ্যপ্রায় বলহীন হয়, সেইরূপ বৈষ্ণববেশ তিলকাদি ধারণ না করিলে ঈশ্বর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানহারা মানব ভিন্ন অন্য মানব-কুল ইতর জীব তুল্য ঈশ্বর-শক্তি হীন হইতে থাকে। চৈতন্যভাগবতে ব্যাসাবতার শ্রীপাদ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় আমার গৌরসুন্দরের, যিনি 'আমার ভক্তি আমি না শিখাইলে জীবকে আর কে শিক্ষা দিবে' এই মনে করিয়া রাধার অঙ্গ-কান্তি অঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—সাধারণ জীব দূরে থাক, ব্রাহ্মণ হইয়া যদি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক (নাসিকার অগ্রভাগ, নাসিকার তিন ভাগকে নাসিকার অগ্র ভাগ কহে; তথা হইতে কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত গোপীচন্দনাদি অঙ্কিত মধ্য স্থলে ফাঁকযুক্ত সরু বা মোটা যে তিলক) কপালে ধারণ না করে, তবে তাহার কপাল শ্মশান সদৃশ হয়। ইহা ভগবানের আদেশ। যে ভগবানের এই আদেশকে অমান্য করে, তাহারাই মৃত্যুর পর ভীষণ নরক-যন্ত্রণা পাইতে থাকে। স্বার্থপর কপট ধার্ম্মিকদের কুশিক্ষায় অনেক অজ্ঞ সরলপ্রাণ স্বধর্ম্মে বিশ্বাসকারী নরকুল 'তুলসীমালা পরিয়া তিলক করিয়া সংসারী মানব ঠিক পথে চলিতে পারিব না, মিথ্যা কথা বলি, হিংসা করি, তাহলে পাপ আরও অধিক হইবে, অতএব মালা পরা তিলক করা আমাদের এখন কর্ত্তব্য নহে' এইরূপ বিশ্বাস করে। এই ধারণা যে কতদূর ভ্রান্তিমূলক তাহা অকথ্য। যাহার দ্বারা পাপ কাজ করিতে মনে ভয় আসে, সেইরূপ বস্তু নিকটে রাখাই বুদ্ধিমানগণের কর্ত্তব্য, তুলসী-

মালা তিলকাদি ধারণের দ্বারা পাপ কর্ম্ম গমনোদ্যত মানবের মনে ভয়ের উদয় হয়; আর এইরূপ ভয় আনিবার জন্যই ত এই সমুদয় করিবার বিধি। পাপ নাশের জন্য যখন তিলক তুলসীমালা ধারণ বিধি, তখন তাহা প্রতি মনুষ্যের ধারণ করা কর্ত্তব্য। মেঘ-শূন্য দিনে উদিত সূর্য্যকে কুজ্‌ঝটিকা বেশী ক্ষণ আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না, সেইরূপ সাধুচিহ্ন তিলকমালাদি ধারণের দ্বারা মানবের পাপইচ্ছা স্থায়ী ভাবে মনে থাকিতে পারে না। 'পাপ কাজ করিবার জন্য পাপ-নাশক তুলসীমালা-তিলক ধরিব না, ইচ্ছা করিয়া পাপী সাজিয়া সংসার সুখে সুখী হইব' এই ধারণা মূর্খ বাতুল ভিন্ন আর অন্যের সম্ভব হওয়া অসম্ভব। পুণ্যাত্মার ঘরে কি অন্ন নাই? শাস্ত্রে দেখ পরম বৈষ্ণব ধ্রুব-প্রহ্লাদ-অম্বরীষ প্রভৃতি তিলক-তুলসী-মালাদি ধারণকারীগণই পৃথিবীর রাজা। কৃষ্ণভক্তি বিহীন অসংখ্য মনুষ্য বিষ্ঠাজাত অসংখ্য কৃমির মত যেখানে জন্মিয়াছে সেইখানে মরিয়াছে; তাহাদের নাম পর্য্যন্ত কেউ জানে না; আর কৃষ্ণভক্ত পরম বৈষ্ণবগণের নাম ও চরিত্র চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় পরবর্ত্তী জনসমূহের মানসিক অন্ধকার নাশ করিতেছে ও চির দিনই করিবে। কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণববৃন্দের বহিরঙ্গ দেহ প্রভৃতি যেমন তিলক-তুলসীমালা প্রসাদী চন্দনাদির দ্বারা ভূষিত, অন্তরঙ্গ মন প্রভৃতিও তেমনি রাধাকৃষ্ণ প্রেম-ভূষণে ভূষিত; এই বাহির-ভিতর দুই অঙ্গ সুখদায়ক ভূষণে ভূষিত হওয়ার কারণ সর্ব্বাবস্থায় ইঁহারা সমান সুখী। মানবজীবনে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়া চারিটি দশা লক্ষিত হয়, এই চারি দশাতে কৃষ্ণভক্তের সমান ভাব; অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত জাগরণে যে কৃষ্ণকে দেখেন, স্বপ্নেও তাঁকে দেখেন; সুষুপ্তিতে যে কৃষ্ণরসে ডুবিয়া যান, তুরীয়াতে আবার তাহাতেই লীন হন। বহির্মুখী জীবের ন্যায় ইঁহাদের

কোন অবস্থার পরিবর্ত্তন বা দুঃখাদি ভোগ করিতে হয় না বলিয়া গোস্বামীপাদগণ কৃষ্ণভক্তের চারি দশার অতীত পঞ্চমী দশা যে প্রেম তাহাতেই অবস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। নিত্য সিদ্ধেরা ইহাতেই নিত্য স্থিতি করেন, সাধন সিদ্ধেরা ক্রমান্বয়ে এই প্রেমদশাতে উপস্থিত হন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। প্রেমদশায় অবস্থিত কৃষ্ণভক্তের হাসিকান্নাদি প্রাকৃত ভাব লক্ষিত হইলেও তাহা বহির্মুখী মায়ামুগ্ধ জীবের হাসিকান্নার ন্যায় অসার নয়। সুস্থ দেহে স্থিতিশীল মানবকুলের হাসিকান্নার ন্যায় নিত্য-চৈতন্যময় রাজ্যের কৃষ্ণভক্তেরা হাসেন, কাঁদেন, আর সন্নিপাত রোগগ্রস্ত অসুস্থ দেহী প্রলাপী রোগীর হাসিকান্নার ন্যায় বহির্মুখী মায়ামুগ্ধ জীবেরা হাসিকান্নাতে মগ্ন হয়। এই মানবের পঞ্চম দশা যে কৃষ্ণপ্রেম দশা, ইহাতে অবস্থানকারী সর্ব্ব মানব স্বরাজশক্তি লাভ পূর্ব্বক ইহ-পরলোকের অবিনশ্বর সুখরাজ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়। যে মানব এই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরূপ পঞ্চম দশাতে অবস্থান করে বা সর্ব্বদাই কৃষ্ণপ্রেম লাভের জন্য উদ্যোগী হয়, সেই নর নিত্য মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিমার্গ নির্ণয় পূর্ব্বক আনন্দধামে গমন করে, সন্দেহ নাই। যে নর সুস্থ দেহে ক্ষণকাল জন্য কৃষ্ণরূপ ধ্যান করিতে সক্ষম নয়, সেই নর যে বিবেক-বুদ্ধি-হারা যন্ত্রণা প্রাপ্ত মরণকালে কৃষ্ণনাম বলিয়া ও রূপ ধ্যান করিয়া মুক্ত হইবে, মানবদেহ পাইবে, ইহা অপরিনামদর্শী মূর্খের ধারণা। অজামিল মরণকালে বিষ্ণুদূতের মুখে ভগবদ্ মহিমা শ্রবণ পূর্ব্বক পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করতঃ ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন, এই জন্য বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হন। তুমি ভগবদ্ মহিমা শ্রবণ পূর্ব্বক কৃষ্ণধ্যানে নিযুক্ত না হইয়া, চৌর্য্য-মিথ্যা-জীবহত্যাকর কার্য্যে আসক্ত হইতেছ, তুমি কোন্ পুণ্যে বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হইবে? অতএব সময় থাকিতে চৈতন্য লাভ পূর্ব্বক কৃষ্ণ চিন্তায়

রত হও, নতুবা মানবদেহ ও মুক্তি পাওয়া পূর্ণভাবে অসম্ভব। পাপী মনুষ্যগণ কপটভাবে তিলক-তুলসী-মালা-ডোর-কৌপিনাদি ধারণ পূর্ব্বক সাধু সাজিয়া কেমন ভাবে পাপ বাসনা ত্যাগ করিয়াছে, তিলক-তুলসী-মালাদি ধারণকারী ভণ্ডকেও সাধু জনোচিত পূর্ণ সম্মান দেওয়া উচিত, তাহা ভক্তমাল বর্ণিত ঘটনার দ্বারা সকলেই অবগত হউক। করোলী নামক গ্রামে যদু বংশীয় ভক্ত প্রবর চতুর্ভুজ নামধারী একজন বৈষ্ণব সাধুসেবী নরপতি ছিলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণভক্তের সেবাতে আসক্ত ও কৃষ্ণচিন্তায় দিনরাত্রি পরমানন্দে অবস্থান করিতেন। এক দিবস কতিপয় দস্যু রাজাকে সাধুপরায়ণ দেখিয়া 'সাধুবেশ ধারণ পূর্ব্বক রাজবাড়ীতে ডাকাতি করিব' এই উদ্দেশ্যে তিলক তুলসীমালাদি গ্রহণ করতঃ রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজা সমাগত বেশমাত্র কৃষ্ণভক্তদিগকে যথোচিত সম্মান, পাদ্যার্ঘ্যাদি দান পূর্ব্বক তাহাদের চরণামৃত—কৃষ্ণভক্তের চরণোদক ভুবন পাবনকারী জ্ঞানে—ধন্যবাদ দিতে দিতে সপরিবারে পান করিয়াছিলেন। সেই দুষ্টবুদ্ধিগণ তথায় ভোজনাদি নিষ্পন্ন পূর্ব্বক পাপবাসনা চরিতার্থ মানসে রাজবাড়ীতে রাত্রি যাপন, এবং অন্তঃপুরে রাজরাণীর নিকটে শয়নস্থান প্রার্থনা করিয়াছিল। সাধুসেবায় কায়মনোবাক্য উৎসর্গকারী মহারাজ তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন। সাধুবেশধারী দস্যুগণ রাজপুরী নিদ্রিত জানিয়া রজনীর শেষভাগে রাজমহিষীকে সংহার পূর্ব্বক তাঁহার অঙ্গস্থিত মণিমুক্তাকনক নির্ম্মিত অলঙ্কারাদি সমুদয় গ্রহণ করিল এবং শীঘ্র পালাইবার জন্য চেষ্টা করিলেও তাহারা রাজবাড়ীর বহির্গমন পথ খুঁজিয়া পাইল না। শেষে রাণীর হত্যা সংবাদ এবং সেই সাধুবেশী দস্যুগণ সংহার করিয়াছে, এই জানিয়া প্রহরীগণ চারিদিক যখন খুঁজিতেছে, তখন তাহারা প্রভাতকালে

অলঙ্কার সহিত কোন এক দ্বারদেশে প্রহরী দ্বারা ধৃত হইল। পরে প্রহরীরা উপযুক্ত প্রহার ও বন্ধন করিয়া তাহাদিগকে যখন মহারাজের সম্মুখে আনিয়াছিল, তখন রাজা প্রহরীদিগকে যথোচিত শাসন, সাধুবেশী দস্যুদের বন্ধন মোচন পূর্ব্বক তাঁহাদের চরণ ধারণ করতঃ "প্রভুগণ! অপরাধ ক্ষমা করুন" বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অন্যান্য রাজ-কর্ম্মচারীগণ মহারাজের এই অভাবনীয় ব্যবহার কপট সাধুগণের প্রতি প্রয়োগ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "মহারাজ! এরা যে ভণ্ড, দস্যু! রাজবাড়ীর মহামূল্য ধনরত্ন অপহরণ মানসে বেশমাত্র সাধু হইয়াছে এবং এরাইত মহিষীকে হত্যা করিয়া তাঁর অঙ্গস্থিত অলঙ্কার গ্রহণ করিয়াছে। আপনি সাক্ষাতে ত সকলই দেখিতে পাইতেছেন, তবে এ ব্যবহার কেন করিতেছেন?" শুনিয়া রাজা বলিলেন, "তোমরা মহামূর্খ ও তোমরাই দস্যু; ইহাদিগকে আমি বিশেষরূপে জানি, এদের তুল্য সাধু আর নাই; তবে অপার সাধুমহিমা, কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবের অপূর্ব্ব শক্তি আমাদের তুল্য সংসারী মায়ামুগ্ধ জীবকে জানাইবার জন্য ইহারা রাণীকে খণ্ড খণ্ড করতঃ তাঁহার অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিয়াছেন। ওহে অজ্ঞান-কুল! কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবের কি অপূর্ব্ব শক্তি একবার সন্দর্শন কর।" এই বলিয়া মহারাজ স্বহস্তে সেই কপট বৈষ্ণববেশী দস্যুগণের চরণ ধৌত পূর্ব্বক সেই জল ছিন্নস্কন্ধ স্বীয় মহিষীর উপরে যেমন ছড়াইলেন, তখনই ছিন্নস্কন্ধ খণ্ডবিভক্ত রাণীর দেহ পূর্ব্বাকারে পরিণত হইল; তিনি সুপ্তোত্থিতার ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। রাজসভাসদ্ প্রহরীগণ এই সব রহস্য অবলোকন পূর্ব্বক সকলেই সেই সাধুবেশী দস্যুদের চরণতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তখন দস্যুরা "হায়! আমরা কি অজ্ঞান! কপট কৃষ্ণভক্ত বেশের যখন এই ক্ষমতা, তখন প্রকৃত ভক্ত হইলে না জানি কতই ক্ষমতা" এই চিন্তা করতঃ সর্ব্বশক্তিমান সেই করুণানিধি

কর্ত্তা এই কৃষ্ণকে দেখিতে পায় না, তাই নিজে কর্ত্তা সাজিয়া পাপ কর্ম্মাদিতে লিপ্ত হয়, এই ভাবে তিনি দেবাহুতিকে কহিয়াছিলেন—

"করোত্যবিরতং মূঢ়ো দুরিতানি দুরাশয়ঃ ॥
আক্ষিপ্তাত্মেন্দ্রিয়ঃ স্ত্রীনামসতীনাং চ মায়য়া।
রহো রচিতয়া লাপৈঃ শিশুনাং কলভাষিনাম্ ॥"

—ইত্যাদি।

—অর্থাৎ সংসার মায়মুগ্ধ মূঢ় নরকুল সর্ব্বদা পাপকার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদের চিত্ত মন্দভাবে পূর্ণ থাকার কারণ তাহারা কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ বিচার করিতে পারে না। যে হেতু তাহাদের চিত্ত সংসারের বহু কার্য্য সাধন জন্য চঞ্চল, অসতী (কৃষ্ণভক্তি-ধর্ম্মজ্ঞান হীনা কুলটার ন্যায় আত্মসুখভোগিনী) নারীর সহিত নির্জ্জনে বসিয়া যে সম্ভোগ বার্ত্তাদি আলাপ এবং সেই মায়াবিনীদের হইতে শিশু পুত্রাদির মুখে উচ্চারিত আধ আধ মিষ্ট বুলির দ্বারা অজ্ঞান মানুষ ইন্দ্রিয়-চঞ্চল হইয়া অচল কৃষ্ণপ্রেম গ্রহণ করিতে পারে না, সেই জন্য ত্রিতাপ জ্বালাময় সংসারের যাতায়াতও ঘোচে না। কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণভক্তগণ যে চঞ্চলতা প্রকাশ করেন, তাহা কুসুমে সৌরভের ন্যায় মানব জীবনের সুমহান গুণ মাত্র বলিয়া জানিবে।

যে মৃত্যুর ভয়ে সমগ্র সংসার কম্পমান হয়, কঠোর বীর পুরুষের রোষপ্রদীপ্ত বদনমণ্ডল যাহার নাম শুনিলে বিষাদ কালিমার ম্লান কান্তি ধারণ করে, ভগবদ্ভক্তগণ হাসিতে হাসিতে সেই মৃত্যুকে চরণ দ্বারা দলন পূর্ব্বক আনন্দময় ভগবদ্ধামে গমন করেন। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তবর ধ্রুবের চির সুখধাম গমনকালীন বলিতেছেন—

"তদোত্তান পদঃ পুত্রো দদর্শান্তকমাগতম্ ।
মৃত্যোর্মূর্দ্ধ্নি পদং দত্ত্বা আরুরোহাদ্ভুতং গৃহম্ ॥"

—অর্থাৎ সেই উত্তানপাদের পুত্র, যিনি বাল্যে পিতার কোলে বসিবার জন্য, রাজাসন পাইবার জন্য, দুঃখিনী মায়ের দুঃখ দূর মানসে মায়ের আদেশে মধুবনে পদ্মপলাশলোচন হরির আরাধনা করিয়াছিলেন এবং হরিকে প্রাপ্ত হইয়া যিনি ছত্রিশ হাজার বৎসর কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর রাজা হইয়াছিলেন, সেই ধ্রুব আজ মৃত্যুকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া তাহার মস্তকে চরণ স্থাপন পূর্ব্বক বিষ্ণুদূত আনীত চিন্ময় হৈম রথে আরোহন করিলেন। এই সব আলোচনার দ্বারা করুণাময়ের অপার করুণা ভক্তদিগকে যে কেমন প্রাণ দিয়া রক্ষা করে কেবল তাহাই আমরা দেখিতে পাই। কৃষ্ণভক্তি হীন পাপী মানবকুলের মরণ সময়ে যে কি ভীষণ দূর্দ্দশা, তাহাও শ্রীকপিল দেব নিজ জননী দেবহুতিকে শুনাইতেছেন, যথা—

"শয়ানঃ পরিশোচদ্ভিঃ পরিবীতঃ স্ববন্ধুভিঃ ।
বাচ্যমানোঽপি ন ব্রুতে কাল পাশবশং গতঃ ॥
এবং কুটুম্বভরনে ব্যাপৃতাত্মাজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরু বেদনয়াঽস্তধীঃ ॥
যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভ সেক্ষণৌ ।
স দৃষ্ট্বা ত্রস্ত হৃদয়ঃ শকৃম্মূত্রঃ বিমুঞ্চতি ॥
যাতনা দেহ আবৃত্য পাশৈর্বদ্ধ্বা গলে বলাৎ ।
নয়তো দীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভটা যথা ॥

অর্থাৎ সেই পাপ কর্ম্মে জীবন যাপনকারীগণ মৃত্যুশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণ বেষ্টিত হইয়া অতীত জীবনের পাপ কর্ম্মাবলী

চিন্তা করিতে থাকে ; সেই কর্ম্মাবলী যে অধিক যন্ত্রণাদায়ক, ইহা সে বলিতে সমর্থ হইয়াও যমদূতের পাশবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার হেতু যদি তাহাদের প্রদত্ত যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাই—এই জন্য গোপন করে বলিতে ইচ্ছা করে না। আবার সেই অজিতেন্দ্রিয় কুটুম্বদের সুখের জন্য যে সারা জীবন সমর্পণ করিয়াছে, সেই মহামূর্খ মানব এই মরণকালেও কৃষ্ণচিন্তা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক 'তোদের সুখ আমি কিছুই দিতে পারিলাম না, হা অদৃষ্ট!' এই ভাব প্রকাশ করতঃ রোদন নিরত আত্মীয়বৃন্দ বেষ্টিত হইয়া সেই হতবুদ্ধি ঘোর যন্ত্রণায় ওষ্ঠাগত প্রাণ হইতে থাকে। তাহার দুই পার্শ্বে অবস্থিত বিকটাকার যমদূতদ্বয় যখন সেই পাপী মনুষ্যের দিকে অট্টহাস পূর্ব্বক রহস্য পূর্ণ ভয়ঙ্কর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন সে অত্যন্ত ভীত হইয়া শয্যাতে মলমূত্র ত্যাগ করিতে থাকে। শেষে সেই শমনকিঙ্করদ্বয় সেই পাপী মানুষের যাতনাময় দেহকে বস্ত্রের দ্বারা ঢাকিয়া, তাহার গলে রজ্জু বন্ধন করতঃ বল পূর্ব্বক রাজদূত যেমন অন্যায়কারীগণকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায় সেইরূপ বহুদূর পর্য্যন্ত রাস্তায় টানিয়া লইতে থাকে। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত ধ্রুব মৃত্যুর মাথায় পা দিয়া উপর দিকে উত্থান পূর্ব্বক হরিদাসগণের সহিত আনন্দধামে গমন করিলেন ; অতএব ধর্ম্মপথাবলম্বী কৃষ্ণভক্তগণের সহায় হন সুখদায়ক কৃষ্ণ বা কৃষ্ণদাসগণ ; আর পাপপথগামী কৃষ্ণভক্তিহীনগণের সহায় হন যন্ত্রণাদায়ক যমদূতগণ ও যম। ভগবদ্ভক্তিবিমুখ জনগণ যতই তেজস্বী যতই মাননীয় যতই পূজ্য হউক না কেন, করুণানিধি কৃষ্ণ ভক্তের কাছে তার অবনতি স্বীকার করিতে হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যোগমার্গগামী মহাতপস্বী ঋষিবর দুর্ব্বাসা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগে কৃষ্ণ আরাধনাকারী মহারাজ অম্বরীষকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন ; কিন্তু সকল সংসার রাজর্ষি অম্বরীষের যশগানে নিযুক্ত

দেখিয়া, তিনি অম্বরীষকে স্বীয় তেজ প্রদর্শন জন্য যাটি হাজার শিষ্য সহিত দ্বাদশীর দিন প্রভাতে রাজসমীপে গমন করিয়াছিলেন। রাজা সমাগত পূজ্য অথিতিকে শিষ্য সমেত দেখিয়া পাদ্যার্ঘ্যাদি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। দুর্ব্বাসা তাহাই স্বীকার পূর্ব্বক স্নানাদি করিয়া 'এখনই আসিতেছি' বলিয়া শিষ্য সহিত কালিন্দী কূলে গমন করিলেন এবং ইচ্ছা করিয়া তথায় দেরী করিয়াছিলেন। এদিকে মহারাজ অম্বরীষ যিনি ত্রিরাত্রি উপবাস (দশমীর দিন মধ্যাহ্নে ভোজন রাত্রিতে উপবাস, পরদিন একাদশীর রাত্রি, পরে দ্বাদশীর দিন পূর্ব্বাহ্নে একবার ভোজন রাত্রিতে উপবাস, এই ত্রিরাত্রি উপবাস) নিয়মানুসারে একাদশী করেন। তিনি দ্বাদশীতে পারণা করিবেন বলিয়া উৎসুক; পল মাত্র দ্বাদশী আছে; এই দ্বাদশীতে পারণা না করিলে কৃষ্ণ সন্তোষ জন্য যে একাদশী হরিবাসর ব্রত তাহা নষ্ট হইবে; এখনও সশিষ্য দুর্ব্বাসা কেন আসিতেছেন না, কি করিয়া ব্রত রক্ষা করা যায়, এই উদ্দেশ্যে সমীপস্থ কৃষ্ণভক্ত পার্ষদ-গণকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা সকলেই পারণা করাই যুক্তিসঙ্গত কহাতেই রাজা 'কৃষ্ণ সন্তোষকর কার্য্যের জন্য যদি দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহাও মঙ্গলজনক' চিন্তা করতঃ তুলসীপত্রাগ্রে বিষ্ণুচরণামৃত ধারণ পূর্ব্বক পান করিলেন। পারণা করিয়া বহির্দ্বারে আসিয়া দেখিলেন সশিষ্য দুর্ব্বাসা সমাগত। কথাপ্রসঙ্গে দুর্ব্বাসা রাজা পারণা করিয়াছেন জানিয়া, ক্রোধে কম্পমান দেহে কহিলেন, "আমার ন্যায় অতিথিকে অগ্রাহ্য পূর্ব্বক মূঢ় কপটী ভক্ত বেশ মাত্র দাম্ভিক রাজা অগ্রেই পারণা করিয়াছ! তার প্রতিফল উপযুক্ত রূপে ভোগ কর। দেখি তোর ভক্তের ভগবান কেমন করিয়া তোকে রক্ষা করে!" এই বলিয়া রোষকষায়িত নেত্র কম্পিতদেহ দুর্ব্বাসা নিজের মস্তক হইতে

দীর্ঘ জটাদ্বয় উৎপাটন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। সেই জটাদ্বয় হইতে বিশাল ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তি আবিভূত হইয়া অম্বরীষকে নাশ করিবার জন্য ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণগত প্রাণ অম্বরীষ দাঁড়াইয়াছিলেন, দুর্ব্বাসার অকারণ ক্রোধ নিবারণ জন্য বিনয় করিতেছিলেন। এই সময় সমাগত ব্রহ্মতেজ তাঁহাকে নাশ করিতে ধাবমান দেখিয়া ভক্তবৎসল ভগবান বৈষ্ণবতেজ স্বরূপ সুদর্শন চক্রকে রক্ষকরূপে প্রেরণ করিলেন। নিখিল তেজ সংহারকর কোটি সূর্য্য সম দীপ্যমান সুদর্শন চক্র অম্বরীষের শীর্ষ দেশে ঘূর্ণায়মান হইতে দেখিয়া ব্রহ্মতেজ আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, দুর্ব্বাসার শরীরে পুনঃ প্রবেশ জন্য দুর্ব্বাসার দিকে ধাবমান হইলেন; সুদর্শন চক্রও পিছে পিছে আসিয়া তেজদ্বয়কে সংহার পূর্ব্বক অসীম তেজে দুর্ব্বাসাকে নাশ করিতে উদ্যত হইলেন। সেই তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্ব্বাসা ভয়ে দাবানল বেষ্টিত ক্রুদ্ধ বিষধরের ন্যায় পলাইতে লাগিলেন। তিনলোক ছুটিতেছেন, চক্রও পিছে পিছে যাইতেছেন, কৃষ্ণভক্তদ্বেষী বলিয়া কেহই ঋষিবরকে আশ্রয় দিতেছেন না। চন্দ্র শীতলতার আধার বলিয়া জ্বালাময় সুদর্শনতেজের জ্বালা হইতে রক্ষা পাবার আশায় তিনি তথায় গমন করিলেন; অমনি চন্দ্রমা কহিলেন, "ঋষিবর! যাঁর নখচন্দ্রমার কণামাত্র জ্যোতি লইয়া আমি সংসারের তাপজ্বালাকে দূর করিতে সমর্থ, সেই সর্ব্বজ্বালা নিবারণকারী সুখনিধি যে কৃষ্ণ তিনি ভক্তের হৃদয়ে যেমন কলসীতে জল থাকে সেইরূপ অবস্থান করেন, তুমি সেই কৃষ্ণের আশ্রয়রূপী ভক্তকে পীড়ন করিয়াছ, তোমাকে আমি আশ্রয় দিতে পারিব না। বৃক্ষের মূলোৎপাটন করিয়া ছায়াসুখ কে লাভ করিতে সমর্থ হয়?" অমনি হতমান দুর্ব্বাসা সূর্য্যলোকে পলাইলেন; তাঁহার কাছে আশ্রয় মাগিলে সূর্য্য কহিলেন, "ঋষিবর! আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে অক্ষম। যাঁর কিঞ্চিন্মাত্র

তেজে তেজবান আমি জগতের অন্ধকার নাশ করিতেছি, সেই অখিল তেজধারী কৃষ্ণের আশ্রয়স্বরূপ রাজর্ষি অম্বরীষকে তুমি পীড়ন করিয়াছ, তোমার শান্তি আমি দিতে পারিব না। অগ্নিকুণ্ড ত্যাগ করিয়া শীতার্ত্ত জন প্রদীপের আলোতে শীত নিবারণ কেমন করিয়া করিবে?" অমনি দুর্ব্বাসা নক্ষত্রলোকে পলাইলেন। তাঁহারা ত্রস্তভাবে কহিলেন, "না না, ঋষি ঠাকুর, আমরা আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব না; এমন বড় বড় চন্দ্রসূর্য্য পারিল না, আমরা ত তাঁদের তুলনায় তোমাদের কাছে অতি ক্ষুদ্র। গুণবান পৃথিবীপতি রাজ্যেশ্বরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া দুঃখী প্রজার গৃহে সুখ পাওয়া অসম্ভব।" পরে ইন্দ্রলোকে পলায়নকারী আশ্রয় পার্থী দুর্ব্বাসাকে দেখিয়া ইন্দ্র কহিলেন, "হে ঋষিবর! ভক্ত-পীড়ন-রূপ আগুনের দ্বারা তুমি কি আমার বৈজয়ন্তী-পুরী, নন্দন কানন, অপ্সরাবৃন্দ, পরিবারবর্গ সহিত আমাকে দাহন করিতে আসিয়াছ? কৃষ্ণভক্তদ্বেষীকে কে আশ্রয় দিবে?" দুর্ব্বাসা বায়ুর কাছে আশ্রয় মাগিলেন, বায়ু বলিলেন, "ঋষে! সত্যই আমি তাপিতজীবকে শীতল করি, কিন্তু ঠাকুর! তোমার পিছে যে ওই কোটী সূর্য্যতেজ সুদর্শন চক্র আসিতেছেন, উনি এখানে আসিলে আমি ভীষণ উতপ্ত হইয়া শীতলতার পরিবর্ত্তে তোমার আরও তাপজ্বালার কারণ হইব।" ভয়ে কম্পিতদেহ দুর্ব্বাসা যমলোক, বরুণলোক, নদনদী, গহনকানন, কুঞ্জ প্রভৃতির কাছে আশ্রয় না পাইয়া বেদগীতিমুখরিত যজ্ঞাগ্নি তুল্য তেজরূপময় ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, অমনি সপ্তর্ষিবেষ্টিত ব্রহ্মা কহিলেন—"বৎস! যাঁর ভ্রূভঙ্গীতে অখিল জগৎ মহাপ্রলয়ের সংহার গর্ভে পতিত হয় এবং আমি, শিব, দক্ষ, ভৃগু, প্রজাপতি, ভূতপতি, সুরপতিগণ যাঁর নিয়মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া লোকহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত আছি, যাঁর ইচ্ছায় তোমার এই উৎপীড়ন আরম্ভ, সেই

করুণানিধি সর্ব্বশক্তিমান কৃষ্ণের ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করিয়া কে তোমাকে আশ্রয় দিবে!" তখন দুর্ব্বাসা আশ্রয় জন্য আরাধ্য শঙ্করের দেব-যক্ষ-রক্ষ-কিন্নর-উপদেব প্রভৃতি সমভোগ্য হিমগিরির গৌরববর্দ্ধনকারী রজতশুভ্র শিবময় ধাম কৈলাসাচলে গমন করিলেন। যেথানে মণিকুট্টিমে অলকানন্দা তটিনী উৎসাকারে উত্থিত হইয়া শীত শীকরদ্বারা হরগৌরীর রাজীবচরণ ধৌত করিতেছে, সেই ধামে শশব্যস্তে প্রবেশকারী আশ্রয়প্রার্থী দুর্ব্বাসাকে দেখিয়া চক্রপীড়ন কারণ বেত্তা উমাপতি কহিলেন, "হে তাত! অখিল ব্রহ্মাণ্ডনায়ক শ্রীকৃষ্ণের অসহনীয় চক্রতাপ জ্বালা হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। আমার ন্যায় সহস্র সহস্র শিবব্রহ্মা প্রভৃতি যাঁর ইচ্ছায় হইয়াছে না হইবে এমন কত, আমি যাঁর আজ্ঞাপালনকারীরূপে নিযুক্ত আছি, তাঁর ভক্তপীড়ন হেতু তোমার যন্ত্রণা, তাহা দূর করিবার ক্ষমতা আমার নাই। এখন সর্ব্বেশ্বর সেই বৈকুণ্ঠপতির কাছে তুমি গমন কর; তিনি ভিন্ন তোমার শান্তিদাতা আর কেহই নাই।" অমনি দুর্ব্বাসা কম্পিত কলেবরে আকুল মনে বৈকুণ্ঠের দিকে সেই পূর্ণ-জ্যোতির দেশের দিকে ছুটিলেন। যেথানে সদল তুলসী-কমল ভূষিত রত্নাসনে তুলসীমল্লিকাদাম ভূষিত বৈকুণ্ঠনায়ক কমলার সহিত বিরাজ করিতেছেন, যেথানে বিরজানদীর জ্যোতির্ম্ময় কূলে পুষ্পপরিমলাবৃত মণিময় ঘট্টে কুসুমালঙ্কার ভূষিত কিশোর বয়সের প্রেমিক প্রেমিকাবৃন্দ হরি প্রেম-মত্ত হইয়া তৌর্য্যত্রিকে মগ্ন, সেই আনন্দপূর্ণ ধামে দুর্ব্বাসা প্রবেশ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে "ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষো সর্ব্ব পাপ হরো হরিঃ" বলিয়া শ্রীহরির চরণপঙ্কজে পতিত হইলেন। আর কহিলেন, "হে প্রভো! না বুঝিয়া তোমার ভক্তকে দ্বেষদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি, তোমার চক্র আমাকে জ্বালাইয়া

মারিতে চেষ্টা করিতেছে ; প্রভু হে ! তিনলোকে কেহই আমাকে স্থান দিল না, সকল স্থান হইতে ফিরিয়া সকলের কর্ত্তা বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন এখন তোমার স্থানে এসেছি ; আমাকে চক্রতাপ হইতে রক্ষা কর।” অমনি ভগবান কহিলেন, “না ঠাকুর ! আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। আমি ত সকলের কর্ত্তা নই, আমার কর্ত্তা যে আছে ঠাকুর !” দুর্ব্বসা বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া কহিলেন, “সেকি প্রভু ? তোমার উপর আবার কর্ত্তা কে? আমি ত তিন লোক ঘুরিয়া আসিলাম, সকলেই একবাক্যে কহিলেন, আমার উপাস্য শঙ্করও কহিলেন, যে বৈকুণ্ঠপতি সকলের কর্ত্তা ; এখন তুমি বলিতেছ তোমার উপর কর্ত্তা আছে। কে সে কর্ত্তা প্রভু ?” ভগবান বলিলেন, “আমার উপরে কর্ত্তা আমার ভক্ত ! আমার আমিত্ব আমি ভক্তের কাছে ভক্তিমূল্যে বেচিয়া দিয়াছি ; আমার কাছে আমার কিছুই ত নাই, থাকিলে বোধহয় তোমার শান্তি বিধান করিতে পারিতাম। আমি স্বাধীন নই, ভক্তের অধীন ; সুতরাং পরাধীন ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারে কেমন করিয়া অপরের সুখ বিধান করিবে ? হে দ্বিজ ! ভক্তপ্রিয় আমার হৃদয় ভক্ত সাধুজন গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। একজন যাহাকে গ্রাস করিয়াছে, সে অন্যের গ্রাসপতিত অন্যকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ? আমি ভগবান হইলেও ভক্ত আমার এতই প্রিয় যে, সে তুলনায় আমার প্রাণ আমার কমলাও সমান হয় না। হে ঋষে ! কি জন্য ভক্তগণ আমার প্রিয় হইয়াছে শ্রবণ কর।” এই বলিয়া কহিলেন—

“যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বামাং শরণং যাতাঃ কথং তাং স্ত্যক্তুমুৎসহে॥
ময়ি নির্ব্বদ্ধ হৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

মৎ সেবয়া প্রতীতং চ সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্য কাল বিদ্রুতম্॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ং ত্বহম্ ;
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

—ইতি শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থাৎ যে সকল ভক্ত আমাকে ভালবাসিয়া সংসারের যাবতীয় সুখ (স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, আত্মীয় স্বজন, অর্থাদি—মায়ামুগ্ধ জীব সে সকলকে পরম সুখের হেতু বলিয়া জানে) ত্যাগ করিয়াছে অথবা সেই সব সুখকে আমার ভক্তি কার্য্যে নিযুক্ত করতঃ কমলপত্রে জলের মত নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছে, এমন ভক্তগণকে কেমন করিয়া আমি ত্যাগ করিব! সতী স্ত্রী যেমন সৎ স্বামীকে ভক্তির দ্বারা বশীভূত করেন, সেইরূপ সর্ব্বভূতে সমদর্শী সাধুগণ, আমাতে যাঁহাদের মন বাঁধা আছে, তাঁহারা ভক্তিযোগে আমাকে বশীকরণের ন্যায় বশীভূত করিয়াছেন। তাঁহারা আমার দাস হইয়া আমার চরণ সেবা পূর্ব্বক এতই আনন্দ পাইতে থাকেন যে—সালোক্য (সমান লোক বৈকুণ্ঠাদিতে বাস), সাযুজ্য (আমার শরীরে লয় হওয়া), সারূপ্য (আমার সমান রূপ হওয়া), সার্ষ্টি (আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য ভোগ করা) এই চারি বিধ মুক্তিকে ইচ্ছা করেন না; তাঁহারা আমার প্রেমের ভিখারী সাজিয়া এমন ভাবে অবস্থান করেন যে, কালের প্রভাব অনুসারে মায়া-মুগ্ধ জীবের যেমন বুদ্ধি লোপ হয় তেমন আমার ভক্তের বুদ্ধি লোপ হয় না। কালের প্রভাবে মায়ামুগ্ধ জীব যেমন পশু-যোনি প্রাপ্ত হয়, তখন পশুর মত বুদ্ধি তাহাতে আসিয়া থাকে; কিন্তু আমার ভক্তের সেইরূপ বুদ্ধি হয় না। রাজর্ষি ভরত যদিও কালপ্রভাবে হরিণ-যোনি পাইয়াছিলেন, তথাপি তিনি আমার প্রতি যে ভক্তি তাহা হারা হন নাই; গরুড়

কাক ভূশুণ্ডী পক্ষী-যোনি গত হইলেও আমার ভক্তি তাঁহারা হারা হন নাই ; সেবক অভিমান থাকাতে গরুড় প্রভৃতি আমার পার্ষদরূপে গণ্য ; অতএব আমার ভক্ত কালের ধর্ম্মকে গ্রহণ করেন না, চিরদিন সম ভাবে অবস্থান করিয়া গোমুখীর গঙ্গাজল আর তথা হইতে নীত স্বর্ণ বা মৃৎ কলসে স্থিত গঙ্গাজলের ন্যায় সমান পবিত্র থাকেন। আমার দাস অভিমানী ভক্ত শুধু ইহাই প্রার্থনা করেন—

"কিয়ে মানুষ পশু পাখিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতি রহু তুয়া পর সঙ্গ ॥
গণয়িতে দোষ গুণলেশ না পায়বি
যব তুহু করবি বিচার।
তুহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগবাহির নহি মুই ছার ॥"
(ইতি বিদ্যাপতি)

—হে নাথ! আমি অনন্ত দোষে দোষী, যদি বিচার করো তবে কণা মাত্র গুণ আমাতে পাইবে না ; কিন্তু তুমি যখন জগৎস্বামী আর আমি যখন জগৎ ছাড়া নই, তখন তুমি যে আমার পতি ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। অতএব হে স্বামিন্! হে মাধব! আমি তোমার সালোক্যাদি মুক্তি চাহি না। হে প্রিয়তম! অখণ্ডনীয় যে কর্ম্মফল, তোমার ভজন করিয়া তাহাও নষ্ট করিতে চাহি না। তোমার ভজন করিয়া তোমার চরণে যে নাশরহিতা ভক্তি তাই যেন আমার থাকে ; এবং কর্ম্মফল জন্য যদি মানুষ-পশু-পাখী-কীট বা পতঙ্গ হই

তাহাতেও আমি সুখী, যদি তোমার পুণ্য-স্মৃতিতে তুমি যে আমার পরম গুণনিধি জানিয়া তোমার ভক্ত মনোহারিণী লীলাকথা আমার মনে থাকে, তবেই যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন তাহাতেই আমার সুখ, বাহিরের দুঃখের দিকে দৃষ্টি করি না; কাঙ্গাল সেজে যদি হে মনের মানুষ! তোমাকে আমি পাই তবে তাতেই আমার আনন্দ; কেননা ধনরত্ন লাভ করে বিলাসী হয়ে তোমার সেবাভক্তি অনেকেই ভুলে যায়, যদি তোমার ধন-অর্থ পেয়ে তোমাকে ভুলে যাই তাহলে তার চেয়ে অধিক দুঃখ আর কি আছে? তাই বলি আমি ধন অর্থ চাহি না, কাঙ্গাল ভিখারী সেজে বুকের মাণিক তোমাকেই যেন বুকে পাই, তাহলে আমার সব সুখ পাওয়া হইবে। এই বলিয়া ভক্ত আবার ব্রজকামিনী-মণির ভাবে বলিতে থাকেন—

"আঁচল ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তবু হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই॥"

আঁচল ভরে ধন-অর্থ পাবার জন্য প্রাণবন্ধুকে দূর দেশে আমি পাঠাইব না। মায়ামুগ্ধ সংসারী জীব, এই ধন-অর্থকে লইবার জন্য ঘরের মানুষ প্রাণবন্ধু আমাকে দূরদেশে পাঠিয়েছে; আমি তাদের নিজের. কিন্তু এখন তারা আমাকে আর চেনে না, আমি যেন তাদের কত অজানা অচেনা বিদেশী লোকের মত হয়ে পড়েছি। 'হা অর্থ! হা অর্থ!' করে তারা রাত্রিদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করে ঘুরে বেড়াচ্ছে; কিন্তু আমার জন্য এক দণ্ড তারা বসে বসে নামটি ধরে ডাকে না। স্বার্থপর ধনমদমত্ত ধনী মানুষেরা মানবসমাজের কলঙ্ক স্বরূপ। তাহাদের দ্বারা সাধারণ নরকুল যে পশু ভাবাপন্ন হইবে, ইহা একটু মাত্র বিচার. করিলে জানিতে পারা যায়। যেহেতু ওই মনুষ্যগণ অবিদ্যার পণ্ডিত হইয়া, আত্ম-

সুখের জন্য মিথ্যা কপটতাকে আশ্রয় পূর্ব্বক 'আমি ও আমার পুত্র-কন্যাদি কিসে সুখে থাকিবে, অপরের সুখ না হইয়া আমার সুখ হউক, অপরে দুঃখ পাউক বা মরুক তাহাতে আমার কি' এইভাবে অর্থাদি সংগ্রহ করিতে থাকে; সাধারণ বুদ্ধি সংসারী জীব আমার ভক্তি না করিয়া এই সকল ধনী মানুষের ন্যায় মিথ্যা কপট হিংসাদি ভাব ধারণ করতঃ ধন সঞ্চয়ের দিকে ধাবিত হয়। এই সব কারণে শান্তিময় নর-সমাজে হিংসা-ক্রোধ-স্বার্থপরতাময়ী বিভীষিকা মূর্ত্তি উপস্থিত হইয়া অশান্তি অন্ধকার আনয়ন করে। ভক্তি বিদ্যার পণ্ডিত যাঁরা সেই ভক্তগণ ধন-অর্থ না চাহিলেও আমি মাথায় করে ধনরত্ন বহন পূর্ব্বক তাহাদিগকে ধনাদি-জনিত সুখ ভোগ করাই। নরজগতে সুদামা ব্রাহ্মণের মুষ্টি মাত্র তণ্ডুলকণা ভোজন পূর্ব্বক তাঁহাকে দ্বারকা পুরীর ঐশ্বর্য্য দিয়াছি—ইহা কে না জানে; কিন্তু এই সব জানিয়া শুনিয়া সুদা-মার ন্যায় গরীব সাজিয়া কয়জনে বা আমার প্রতি ভক্তি করে! অনাদিকাল হইতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য্যের উদয়াস্তের ন্যায় আমার পূর্ণতম কৃষ্ণরূপের ভক্ত বিনোদন লীলা চলিতেছে, কেবল ভক্তকে সুখী করিবার জন্য। আমি ভক্তকে কেন ভালবাসি, ভক্ত আমার এতই প্রিয় কেন তাহা বলি শুন। ভক্ত ত ধন-অর্থ কিছুই চাহে না; আমি তাঁর কাছে এতই সুন্দর এতই সুখ দাতা বলে প্রকাশিত হইল যে—তিনি সারা জগৎময় শুধু আমাকে দেখ্‌তে থাকেন, পাছে এমন সুখদাতা আমি ফেলে চলে যাই বা অন্তর্দ্ধান হই, সেই জন্য তিনি পতির কাছে সতী স্ত্রীর ন্যায় 'আমার ত তোমাকে দেবার কিছুই নাই, তুমি কৃপা করে আমায় ছেড়ে যেও না' এই ভাবে কহিতে থাকেন—

"কি দিব কি দিব বলে মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥"

এই সব কারণে ভক্ত সাধুগণের হৃদয় হয়েছি আমি, এবং আমার হৃদয় হইয়াছে ভক্ত সাধুগণ। ভক্ত পাবে আমাকে আমি পাব ভক্তকে। অতএব হে ঋষে! পূর্ণরূপে ভক্তের অধীনতার কারণ আমি ভক্ত ছাড়া কোন কার্য্য করিতে পারি না, তোমার অপরাধ ভক্ত প্রবর অম্বরীষ যিনি আমার জন্য সর্ব্ব ইন্দ্রিয় নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁর কাছে হইয়াছে। এই অপরাধ বা চক্র-তাপজ্বালা হতে তোমাকে রক্ষা অম্বরীষ ভিন্ন আমি দূর করিতে পারিব না। সংসারে থাকিয়া কেমন ভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়কে আমার সেবায় অম্বরীষ নিযুক্ত করিয়াছেন, ঋষিবর তাহা শ্রবণ কর—

"বাসুদেবে ভগবতি তদ্ভক্তেষু চ সাধুষু।
প্রাপ্তো ভাবং পরং বিশ্বং যেনেদং লোষ্ট্রবৎস্মৃতম্॥"

সেই মহারাজ অম্বরীষ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ভগবানে এবং তাঁকে ভক্তি-যোগে আরাধনাকারী ভক্ত সাধুগণে পরম ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া, যাহার দ্বারা তিনি এ বিশ্ব সংসারকে লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছ মনে করিতে থাকেন; এবং তাহা অসার জানিয়া সর্ব্বসুখনিধি করুণানিধি যে আমার কৃষ্ণরূপ তাঁহাকে এই ভাবে আশ্রয় করিয়াছেন—

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণ পদারবিন্দয়ো র্বচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দির মার্জ্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনে দৃশৌ, তদ্ভৃত্য গাত্র স্পর্শেঽঙ্গসঙ্গম্।
ঘ্রাণং তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র পদানুসর্পণে শিরো হৃষিকেশ পাদাভিবন্দনে।
কামং চ দাস্যে ন তু কাম কাম্যয়া যথোত্তম শ্লোক জনাশ্রয়ারতিঃ॥"

—ইতি শ্রীমদ্ভাগবত।

সেই মহারাজ অম্বরীষ উত্তম শ্লোক যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণের ভগবানের প্রতি যে ভালবাসা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেইজন্য অন্য চিন্তা না করিয়া তিনি মনকে শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত রাঙ্গা চরণের চিন্তাতে নিযুক্ত, অন্য কথা না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুণ বর্ণনে বচনকে, হস্তকে হরিমন্দির মার্জ্জনে, শ্রবণকে মঙ্গল আনয়নকারী শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণে, চক্ষুকে হরিমন্দির বা কৃষ্ণচিহ্ন তিলকাদি ধারী ভক্তমূর্ত্তি দর্শনে, কৃষ্ণভক্তকে আলিঙ্গন করিয়া স্পর্শেন্দ্রিয়যুক্ত দেহকে, তুলসী-অর্পিত চরণকমলের সৌরভে নাসিকাকে, শ্রীকৃষ্ণ-অর্পিত অন্নাদি মহাপ্রসাদ দ্বারা রসনাকে, চরণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণধাম ব্রজভূমি মথুরা-মণ্ডল প্রভৃতি পরিক্রম, আর মস্তকের দ্বারা কৃষ্ণের চরণে দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া ইন্দ্রিয় সকলকে সুখী পূর্ব্বক যাবতীয় বাসনা 'শ্রীকৃষ্ণের দাস আমি' এই ভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন, সংসারের ঐহিক সুখের কামনার জন্য নয়। এই জন্য তিনি আমার অতি প্রিয়। হে ব্রাহ্মণ! তোমার জন্য তিনি আজ সংবৎসর কাল পারণাদি না করিয়া সেই ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, তুমি সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক তাঁর চরণে অপরাধ স্বীকার কর; আমার ভক্ত আমার অপেক্ষা দয়ালু, সুদর্শন চক্রের জ্বালা হতে তিনিই তোমাকে রক্ষা করিবেন, আমি পারিব না। এই কথা বলিলে দুর্ব্বাসা 'অহো ভক্ত মহিমা এত! ধন্য ভক্তের ভগবান' এই চিন্তা করতঃ ভগবানকে প্রণাম পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে রাজর্ষি অম্বরীষ সকাশে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দণ্ডবৎ স্তুতি পূর্ব্বক "বৈষ্ণব তেজ সুদর্শন চক্রাগ্নি হইতে রক্ষা করুন" এই প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ অম্বরীষ "আমার জন্য আপনার এই দুর্দ্দশা।" এই বলিতে বলিতে ভক্তি গদগদকণ্ঠে সুদর্শন চক্রকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। ভক্তের ইচ্ছা ভগবান খণ্ডন করিতে পারেন না। সুতরাং চক্র শান্ত

ভাব ধারণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, দুর্ব্বাসাও অব্যাহতি পাইলেন। পরে মহারাজ সেই এক বৎসর পরে দুর্ব্বাসার ভোজনাদি দান পূর্ব্বক পশ্চাতে বিষ্ণুপ্রসাদ ভোজন করিলেন। এইরূপ কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব মহিমাতে পুরাণাদি পূর্ণ। এমন করুণানিধি কৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত-বৃন্দের বৈষ্ণবীয় বেশভূষা তিলক-ডোর-কৌপিন প্রভৃতিকে মূর্খ নারকী কলিসর্পগ্রস্ত জীবকুল হেয়াস্পদ বলিয়া মনে করে। তাহারা এতই অজ্ঞান যে, এমন ভক্ত-ভগবানের বেশভূষা কীর্ত্তি, শক্তি, শাস্ত্র পুরাণা-দিতে পড়িয়া শুনিয়া মৃত্যু সম্মুখে আগত রোগীর তুল্য কুপথ্য অন্বেষণ-কারী বৈষ্ণব-নিন্দুক। তাহারা চোখ থাকিতে অন্ধ, কাণ থাকিতে বধির ; দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শোনে না। এই সব মূঢ় জীবের এই সব সংসার বিষয়রূপ বিষ্ঠাগর্ত্তের কৃমি তুল্য জীবের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্বীয় চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"দেখিয়া না দেখে যত পাষণ্ডেরগণ।
উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥"

'উলুক' অর্থাৎ 'পেঁচা' বলিয়া যে জীব আছে,তাহারা দিনের বেলায়ও অন্ধকারে লুকাইয়া থাকে, সূর্য্যের কিরণকে দেখিতে সমর্থ হয় না। সেইরূপ মানবাকারে পেঁচার ন্যায় জীব বৈষ্ণবীয় বেশভূষা তিলক-ডোর-কৌপিনাদির প্রভাব না জানিলেও তাহার যে অসীম শক্তি আছে তাহা চির সত্য। তিলক করুণানিধি কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ; আমরা বাহিরের জগতে দেখি কোন কৃষ্ণমূর্ত্তি সাজাইতে হইলে ( শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি অথবা নাট্যাদিতে কোন নরমূর্ত্তিকে কৃষ্ণ সাজাইতে হইলে ) তাঁহাকে উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক করিয়া না দিলে যেন মূর্ত্তির কোন সাজই হয় না ; উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক করিয়া দিলে যেন সব সাজ হইয়া যায়। এই সব

কারণে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, তিলকই ভগবানের পরম প্রিয় এবং তিলকই তাঁহার স্বরূপ। ভগবানকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে তাঁহার প্রিয় জিনিষ বা তাঁর স্বরূপ অঙ্গে ধারণ করিতে হয়। ভগবান তিলককেই ভালবাসেন; এইজন্য তিলককে অঙ্গে ধারণ করেন। আমরা বহির্জগতে দেখি, যে কেউ যে বস্তু ভালবাসে, সেই বস্তুকে অপর কেউ ভালবাসিয়া ব্যবহার করিলে, প্রথম বস্তু ব্যবহারকারী দ্বিতীয় বস্তু ব্যবহারকারীকে ভালবাসিতে থাকে ও তাকে নিজের দলভুক্ত করিয়া লয়; সেইরূপ ঈশ্বরের ভালবাসার বস্তু তিলক, নিরামিষ-ভোজন প্রভৃতি যে মানবকুল ব্যবহার করেন, ভগবান তাহাদিগকে ভালবাসিবেন বা নিজের দলভুক্ত করিয়া লইবেন —ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই কারণ কৃষ্ণ-সন্তোষে সকলের সন্তোষ, সকল সুখের হেতু বলিয়া ভগবানের ভক্তগণ দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশ উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ধারণ করেন। এই দ্বাদশ স্থানে দ্বাদশরূপে ভগবান তিলকমূর্ত্তিতে অবস্থান করেন। তিলকের এতই মহিমা—যদি স্বপ্নে কোন মানব কেবলমাত্র তিলকধারী কোন মানবকে দর্শন করে, তাহা হইলে স্বপ্নদ্রষ্টার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন, অশুভ নাশ প্রভৃতি সৌভাগ্যের উদয় হয়।—ইহা শাস্ত্রসঙ্গত। স্বপ্নে তিলকধারী মূর্ত্তি দর্শন করিলে জীবের যখন এত ভাগ্যোদয়, তখন সাক্ষাতে সেই মূর্ত্তি দর্শনে যে কতই ভাগ্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তর্পণ, আহ্নিক, শ্রাদ্ধাদি কোন প্রকার শুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে তিলক ধারণ না করিলে হয় না। তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে তিলক সব মঙ্গল আনিবার হেতু। মুর্খ ভিন্ন কোন্ জ্ঞানী মানব মঙ্গল আনয়নকারী এই তিলককে অঙ্গে ধারণ না করে? অনেকে উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক না করিয়া কেবলমাত্র ফোটা দিয়া তিলক করে। তাহারা গুরু-ত্যাগী, মুর্খ, শাস্ত্রবিরোধী পাষণ্ড বা পন্থীর দল; কেননা জগৎগুরু

বৈষ্ণবের চারি সম্প্রদায়, তাঁহাদের সকলেরই উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকই ব্যবস্থা। এই সম্প্রদায়ের তিলকাদি না করিয়া যাহারা গুরু সাজে, মন্ত্র দেয়, শিষ্য করে, তারা জীবকে নরকে ডুবায় বই উঠায় না, কেন না তাদের প্রদত্ত মন্ত্রাদি নিস্ফল। এই সম্বন্ধে গোবিন্দভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণের মত এই—

"সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রা স্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বার সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি পাবনাঃ"॥

—ইতি গোবিন্দভাষ্যে সম্প্রদায় পরিচয়।

অর্থাৎ সম্প্রদায় বিহীন (সম্প্রদায়ের তিলক বৈষ্ণবাচারাদি রহিত) যাহারা, তাহাদের প্রদত্ত মন্ত্রে ভগবানের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব। এই কারণে করুণানিধি কৃষ্ণের ইচ্ছায় কলিযুগে জগৎ পবিত্রকর চারি-প্রকারের—শ্রী (রামানন্দ সম্প্রদায়), ব্রহ্ম (মধ্বাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু সম্মত গৌড়ীয় সম্প্রদায়), রুদ্র (বিষ্ণু স্বামী সম্প্রদায়), সনক (নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়) বৈষ্ণবকুল অবতীর্ণ হইবেন। এই চারি সম্প্রদায় ছাড়া বৈষ্ণব আর ভুবনে নাই। ইহাদের সকলেরই উর্দ্ধ-পুণ্ড্র তিলক-ডোর-কৌপিন-শিখা ও তুলসীকণ্ঠি ধারণের বিধান। ডোরকৌপিনের দ্বারা বাহিরের দিক্ দেখিলে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবার ইহা প্রধান উপায়। এই কারণে গঞ্জিকাসেবী পাগল, ঈশ্বর দর্শনে বাহ্যজ্ঞানহারা সিদ্ধ ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণ এই ডোর-কৌপিন ধারণ করেন। অনেক সংসারী বুদ্ধিমান মনুষ্য বল বাড়াইতে ও ব্রহ্মচর্য্য রাখিবার জন্য এই ডোরকৌপিন অথবা সেই রকম ভাবে কাছা আটিয়া থাকে। ডোর-কৌপিনের অন্যান্য তত্ত্ব সাধুগুরু মুখে জ্ঞেয়। জগতের

মধ্যে যত প্রকারের ধর্ম্মাচরণ বিভাগ আছে, তন্মধ্যে বৈষ্ণবের আচার ব্যবহার বিশেষরূপে সকল মানবের সর্ব্বকল্যাণকর ও মানবত্বদানের হেতু; ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয়, পূজনীয় হ'বার জন্য নয়, মানবজীবনের কর্ত্তব্যবোধে এই বিশ্বপ্রেমময় বৈষ্ণবধর্ম্ম পালন করা উচিত। করুণানিধি কৃষ্ণের দাস বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণের ন্যায় দয়ালু; তাঁহারা জীবের পরম সুখ দেবার জন্য ভিখারীর বেশে সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান। এই কারণ নারদ-বসুদেব সংবাদ উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত কহিতেছেন—

"ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলা॥"

বসুদেব কহিলেন—হে দেবর্ষে। সংসারী জীবকুল দেবগণকে যে উদ্দেশ্যে পূজা করে, দেবকুল তাদের সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন, করুণাময় কৃষ্ণভক্ত সাধুগণের যে উদ্দেশ্যে পূজা করা যায়, তাঁহারা তাহা না দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ছায়ার ন্যায় ( তুমি স্বমূর্ত্তিতে দক্ষিণ হস্ত তুলিলে তোমার ছায়ামূর্ত্তি বামহস্ত তুলিবে ) তাঁহারা সংসারী জীবের অসুখ-কর বিপরীত ফল 'ভগবানের ভজন কর' এই কহিতে থাকেন। এই হেতু কৃষ্ণভক্ত সাধুগণ পরম দয়ালু, তাঁহারা অবিনশ্বর পরম সুখের পথ ভগবানে ভক্তি এই দিতে থাকেন, আর দেবগণ ক্ষণস্থায়ী নশ্বর সুখ জীবগণকে দিয়া তাদের ভবচক্রে ঘুরাইবার ও দুঃখ দেবার পথ প্রদর্শন করেন। অতএব দেব অপেক্ষা ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। কত অজ্ঞানী মায়ামুগ্ধ জীবকুল নশ্বর সংসারসুখের জন্য দেব পূজা করিতেছে, সাধ করিয়া দুঃখের রজ্জু গলায় পরিতেছে, দেবতার কাছে কত বলিদান ( জীব হত্যা ) হইতেছে, নরকে যাবার প্রশস্ত পথ প্রকট করিতেছে!

কোন সাধুবেশী রাক্ষস আসিল; মাথায় বড় জটা, গায় ছাই মাখা, দণ্ডে অন্ততঃ তিনবার গাঁজা সেবা করেন, হাতে বড় লোহার চিমটা, দেখিয়া সংসারী মূঢ় জীবকুল ছুটিল,—কার বা পুত্র হয় নাই পুত্র দিতে হবে, কারও রোগ হয়েছে রোগ নাশ কর্‌তে হবে, কার বা মিথ্যা কথা বলিয়া কিসে সম্পত্তি রক্ষা হয় তাহার উপায় কর্‌তে হবে। সাধু মহাশয় পূর্ব্ব হইতে এসব বিষয়ে বিশেষ সাবধানী। আয়ুর্ব্বেদ, যাদু বিদ্যার (সংসারী মূর্খ লোক ভুলান বিদ্যার) চর্চ্চা করিয়া ঠিক হইয়া আসিয়াছেন—ছেলে হবার ঔষধ দিলেন, রোগের ঔষধ দিলেন, লোক মোহনের কৌশল বলিলেন। সব ঠিক হইল—ছেলে হইল, রোগ সারিল, মিথ্যা কথা বলিয়া সম্পত্তি রক্ষা পাইল, কলির মূঢ় পাপী নরকুলের আনন্দ আর দেখে কে? সাধু মহারাজের চারি দিকে লোক আর ধরে না। যজ্ঞধুমের ন্যায় সাধুর কুটীর গাঁজার ধূমে অন্ধকারময়। এই সাধুকে দেখিয়া বৈষ্ণবকুলমণি রামগত প্রাণ তুলসীদাসজী মহারাজ হাসি করিয়া কহিতেছেন—

"জাকো নখ শিখ জটা বিশালা :
তিহোসন্ত পূজিত কলিকালা॥"

—ইতি তুলসীরামায়ণ।

এই কলিকালে মূর্খ জীবের কাছে বড় বড় জটা-নখধারী সাধুর আদর হইয়া থাকে। কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব এই সব দেখিয়া প্রকৃত সাধুর কর্ত্তব্য করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"এই সাধু সাধু নয়, তোমাদের সংসার-যন্ত্রণাদানকারী ব্যাধ; যেহেতু বন্ধ্যা দোষ রোগ প্রভৃতি দৈহিক ক্লেশ নাশের জন্য অয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসক, লোক মোহন জন্য কৌশলী যাদুকর, মায়াব্যাধি-বিনাশ, কৃষ্ণপ্রেম সুধা দানের জন্য কৃষ্ণ-

ভক্ত সাধু। কৃষ্ণভক্ত সাধুর বেশ ধরিয়া যে তাহার বিপরীত চিকিৎসাদি কার্য্যের দ্বারা মায়ামুগ্ধ জীবের কাছে পূজনীয় হইতে লাগিল, সে মানবজীবনের পূর্ণত্ব সম্পাদনকর প্রেমময় বৈষ্ণবধর্ম্ম বিমুখ, স্বধর্ম্মচ্যুত ব্যাধ ভিন্ন কোন্ পদবাচ্য হইবে? তোমাকে পুত্রাদি দিয়া দুঃখময় স্বপ্নসুখের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী সুখরূপ সংসারের বন্ধন দিয়াছে; তোমার বন্ধন মোচন হ'বার উপায় হ'তেছিল, ওই সাধুবেশী ব্যাধ আসিয়া আরও বন্ধন আঁটিয়া দিয়া গেল; আমি কিন্তু ওই পুত্রাদি দানরূপ সুখ দিতে পারিব না, আমি তোমার অবিনশ্বর নিত্য নব সুখের পথ বলিয়া দিব, যে পথে গেলে জীবের আর কোন কষ্ট থাকে না।" এই বলিয়া জীবদুঃখে করুণ হৃদয় বৈষ্ণব ঠাকুর গাহিলেন—

"কৃষ্ণ নাম জপ ভাই আর সব মিছে।
পলাবার পথ নাই যম আছে পিছে॥"

অথবা

"রাজার এ রাজপাট, যেন নাটুয়ার নাট—
দেখিতে দেখিতে কিছু নয় হে।
স্ত্রী-পুত্র-বান্ধব যত মরে যাবে শত শত
আপনারে হও সাবধান হে॥" —ইত্যাদি।

সত্যই ত! আজ আছে কাল নাই এমন বস্তুতে আসক্ত হইয়া যাহারা থাকে, তারাই ত মায়ার দাস। এই মায়ার দাস হইয়া ত তোমার দুঃখ; তুমি অজ্ঞান বলিয়া মায়া বুঝিবে না। তুমি অন্ধ বলিয়া গর্ত্তে পড়িতে গেলে সে সেই পথে যাইতে বলিবে, কখন তোমাকে যে পথে গর্ত্ত নাই সে পথে যাইতে বলিবে না। আর আমার করুণানিধি কৃষ্ণ তা করেন না; তিনি বলেন—

"আমি বিজ্ঞ এই অজ্ঞ বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়ে বিষয় ভুলাইব॥"

—ইতি চৈতন্যচরিতামৃত।

ওরে জীব! আমি সব তত্ত্ব জানি, তুমি সব তত্ত্ব জান না; সেই কারণবশতঃ যদি আমার কাছে সংসার সুখ রূপ দুঃখের হেতুকে সুখের হেতু বলিয়া প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তাহা কিন্তু দেব না, আমি তোমাকে আমার চরণে স্থান দিয়ে তোমার বিষয়বাসনা দূর করিয়া দিব। আমার চরণই অমৃতস্বরূপ সুখদায়ক। তাই হইয়াছে। সংসারের বিষয় রাজাসন পাইবার জন্য বালক ধ্রুব শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন এবং সেই করুণানিধি ধ্রুবের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ধ্রুবকে বরদান করিয়া যখন চলিয়া যাইলেন, তখন ধ্রুবের সেই বিষয়বাসনা দূর হইয়াছিল। তিনি দুঃখিতভাবে বলিয়াছিলেন—

"ময়ৈতৎপ্রার্থিতং ব্যর্থং চিকিৎসেব গতায়ুষি।
প্রসাদ্য জগদাত্মানং তপসা দুষ্প্রসাদনম্॥"

—ইতি শ্রীমদ্ভাগবত।

অহো! বহুদিন কঠোর তপস্যার দ্বারা ঋষি তপস্বীগণ যে চরণরজ দর্শনে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিতে থাকেন, আমি সেই সর্ব্বসুখদাতা প্রাণবন্ধুকে অত্যল্প কালমধ্যে পাইয়াছিলাম। আমায় বালক দেখে ওই ক্ষয়রহিত চাঁদ আনন্দাকাশ হতে নেমে এসেছিলেন। ওই ত চলে গেলেন! আমি কেন ওই চাঁদের সঙ্গে চিরদিন থাকিবার প্রার্থনা করিলাম না! আয়ুহীনের বৃথা চিকিৎসার ন্যায় কেন বৃথা রাজ্য-সুখ ভোগের কামনা করিয়াছিলাম! আজ সেই কামনার জন্য আমাকে নশ্বর সুখ মত্ত সংসার রাজ্যে গমন করিতে হইল। অহো কি দুর্ভাগ্য!

করুণানিধি কৃষ্ণ আমার এমন সুন্দর যে তাঁকে দর্শন করিলে সংসার-বাসনা সব তিরোহিত হইয়া যায়। এই জন্য ভাগবত বলিতেছেন—

"অকাম মোক্ষ কাম বা সর্ব্বকাম উদারধী।
তীব্রেন ভক্তিযোগেন যজতে পুরুষং পরম্॥"

কামনাহীন হইয়া, মোক্ষ পাবার আশায় অথবা সকল কামনা মনে লইয়া সরল চিত্ত বিশ্বাসবান মানবকুল অত্যন্ত ভক্তির সহিত সুখনিধি পরমপুরুষ সেই কৃষ্ণকে যদি ভজন করে, তবে তাহারা সর্ব্ব সুখ প্রাপ্ত হইতে থাকে। এখানে অনেকের এই সন্দেহ আসিতে পারে যে সকল কামনা মনে লইয়া যদি কৃষ্ণ ভজন করে, তবে সংসার-বাসনা থাকার জন্য তাহাকে ত সংসারে আসিতে হইল। আসিবে সত্য, কিন্তু সাধারণ সংসারীর মত তাহার সাংসার-মোহ জনিত দুঃখাদি ভোগ করিতে হইবে না। সাপুড়ের হাতের সাপ যদি কাহাকেও কামড়ায়, তবে সেই সর্প বিষদন্তহীন বলিয়া, দংশন জনিত বিষজ্বালা বা মৃত্যু তাহার হয় না; আর গর্ত্তস্থিত সর্প যদি কাহাকেও দংশন করে, তবে সে বিষজ্বালা ভোগ বা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ মায়াপতি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের কাছে যে মায়া আসে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিতা ভক্তের সংসারসুখদায়িনী মায়া, সে মায়ার দ্বারা কিছু দিন পরে সংসারবন্ধন নাশ হইতে থাকে—ঠিক ওই বিষদন্তহীন সর্পের ন্যায়। আর যারা কৃষ্ণের ভজন না করিয়া সংসারসুখে লিপ্ত থাকে, তাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের বহির্মুখী মায়া বিষধরী গর্ত্তস্থিতা সর্পিনীর ন্যায় জীবকে সংসারমোহ বিষে জর্জ্জরিত করিতে থাকে। যেমন দেহ ও ছায়া চিরদিন আছে, সেইরূপ সত্য ও মিথ্যা চিরদিন আছে। সত্য কৃষ্ণের প্রেরিত মায়া, মিথ্যা কৃষ্ণবিমুখ সংসার মায়া। সাধু লোক সত্যকে

আশ্রয় করেন, চোর-দস্যু মিথ্যাকে আশ্রয় করে। স্বর্ণ যেমন বিষ্ঠার কাছে থাকিলেও তাঁর গৌরব নষ্ট হয় না; সেইরূপ ভক্তি যোগে গোবিন্দ আরাধনা দ্বারা যাহার মনশুদ্ধি হইয়াছে, তিনি সংসারে থাকুন বা বনে থাকুন তাঁর গুরুত্ব কিছু নষ্ট হয় না। ধ্রুব-প্রহ্লাদ-অম্বরীষ, ব্রজবাসিগণ যাঁরা কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য জানেন না, তাঁদের মত কৃষ্ণভক্ত হইয়া সংসারে থাকিতে পারিলে সব সুখ লাভ হয়। এই সব শ্রেণীর ভক্ত-কুল পূর্ণ ভাবে কৃষ্ণকে অধিকার করিতে পারিলেও এবং সকলের পূজনীয় হইলেও ইহাদের উচ্চাভিমান নাই। ঠিক পতিপ্রাণা সতী কামিনীর ন্যায় ইহাদের স্বভাব। সতী নারী যেমন নীচ জাতির মুখে স্বামীর গুণগান শুনিয়া তাহাকে ভালবাসিতে থাকেন এবং সেই নীচ জাতির মনোগত ভাবানুসারে অর্থাদি দেন বা 'নিজ স্বামীর দাসত্ব কর' এই সব আদেশ করেন, বিশ্ব-স্বামী কৃষ্ণ ভক্তগণের স্বভাব ঠিক এইরূপ। হউক না কেন নীচ জাতি—আমি যাহাকে ভালবাসি তাঁহাকে যে ভালবাসিবে, সেই ভালবাসার গুণ যে গাহিবে, সেই আমার আদরের বস্তুঃ। মনের কথা কহিতে হয়ত তাহার সঙ্গে কহাই উচিত। কেননা তাহার সঙ্গে থাকিলে আমার সতীত্ব থাকিবে; নতুবা আমার নিজ সংসারের উচ্চ জাতির লোক হইয়া যদি আমার পতিকে কেউ নিন্দা করে বা তাঁহাকে কপট ভক্তি করে সে আমার নিজের হইলেও আমার পরম শত্রু। তাহার সঙ্গগুণে আমার সতীত্ব নষ্ট হওয়ার সম্ভব। অতএব স্বামীনিন্দুক আত্মীয় শত্রুকে ত্যাগ করিয়া যে নীচ জাতি আমার স্বামীর ভক্ত, তাহাদের সহিত বাস করা আমার কর্ত্তব্য। এই সব কারণে কৃষ্ণভক্তের জাতিভেদ জ্ঞান নাই। যে জাতি জগৎ-স্বামী কৃষ্ণের ভক্ত হইবে সে আমার প্রিয় বান্ধব হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। এই সব ভক্তবৃন্দ দিন-রাত্রি কৃষ্ণ কথা কীর্ত্তনাদি

করিয়া বা শুনিয়া বিরক্ত হন না, অধিক উল্লাসসাগরে ভাসিতে থাকেন। কেন না জগতে যে সতী নারী নির্জ্জনে স্বামীসঙ্গসুখ ভোগ করিয়াছেন, তিনি নিজ সহচরী সঙ্গে সেই সব কথা আলোচনা বা গান করিয়া যে সুখীনী হইবেন, ইহাতে কোন অন্যথা ভাব নাই। বেশ্যা নারী যেমন উপপতি সঙ্গে দিন-রাত্রি আনন্দ উপভোগ করিয়া যখন উপপতি কাছে না রহিল, তখনই হয়ত নিজ স্বামীর কথা একবার মনে করে কেউ হয় ত করে না, সেইরূপ সংসারমায়া-বদ্ধ মানব ছয় রিপুর তুল্য উপপতির জন্যে দিন-রাত্রি প্রাণ দিতেছে, কেউ হয় ত দিনান্তে—জগৎ পতি কৃষ্ণের কথা মনে করে, কেউ হয় ত তাও করে না। অতএব সংসার মায়ামুগ্ধ জীব বেশ্যা নারীর ন্যায় ঘৃণাস্পদ দুঃখ ভোগী কেন না হইবে; কিন্তু চিরানন্দ-মধু-মত্ত-ভৃঙ্গ-সদৃশ-কৃষ্ণভক্তকুল বালকের ন্যায় চঞ্চল ও সুখ-প্রয়াসী হইয়া পাপ ভারাক্রান্ত বসুন্ধরার ভার সমূহ যে দূর করিতেছেন, ইহা মায়ামুগ্ধ মানব কয়জনই বা অনুভব করিবে? এইরূপ কৃষ্ণভক্ত সংসারে থাকিলে তাঁদের সঙ্গগুণে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় বলিয়া শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কহিতেছেন—

"গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' বলে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।"

অখিল কলাবিদ্যার আদি গুরু আমার করুণানিধি ভগবান কৃষ্ণকে যাঁরা ভক্তিযোগে আরাধনা করেন, তাঁরাই পণ্ডিত বা মহাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে থাকেন। নতুবা কুভক্ষ্যভোজী কদাচারী আত্মসুখ রত মিথ্যা প্রবঞ্চনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহক জনগণ যতই শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করুক না কেন, কিছুতেই তাঁহারা পণ্ডিত বা মহাত্মা পদবাচ্য হইতে পারে না। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ভগবদ্ভক্ত পুত্র প্রহ্লাদকে যখন

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হে পুত্র! জগতের মধ্যে উত্তম শাস্ত্র পারদর্শী বিদ্বান্ কে?" তখন ভক্তবর প্রহ্লাদ ভক্তি গদগদ কণ্ঠে কহিয়াছিলেন:—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিচেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥"

যদি এই জগতে কোন পুরুষের দ্বারা শ্রবণ (কৃষ্ণের লীলাগুণ শুনা), কীর্ত্তন (কৃষ্ণের লীলাগুণ ভাগবত গ্রন্থাদিতে পাঠ বা গান করা), স্মরণ (মনে মনে কৃষ্ণরূপ চিন্তা), পাদসেবন (দাস ভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে, ধ্যানে বা বিগ্রহ মূর্ত্তিতে তুলসীচন্দনাদি অর্পণ), অর্চ্চন (পঞ্চ উপচার বা ষোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণের পূজন), বন্দনা (শ্রীকৃষ্ণের চরণোদ্দেশে দণ্ডবৎ), দাস্য (আমি কৃষ্ণের দাস এই অভিমান), সখ্য (শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণের সখা এই ভাবে প্রাণের মত ভক্তি), আত্মনিবেদন (এ প্রাণ হে কৃষ্ণ তোমার চরণে বিক্রয় করিলাম, আমি তোমা ভিন্ন আর কারও নই এই ভাব), যদি এই প্রকার ভক্তি বিষ্ণুরূপী ভগবান করুণানিধি কৃষ্ণে অর্পিত হয়, তবে সেই পুরুষই সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী উত্তম বিদ্বান্ রূপে জগতে কীর্ত্তিত হইতে থাকে—ইহাই আমি জানি। এই শ্রবণাদি ভক্তিযোগে ভগবানকে আরাধনা করিতে করিতে অতি পাষাণ হৃদয় ব্যাধপ্রবৃত্তি মানুষের চিত্তও দ্রবীভূত হইয়া যায়। তিনি তখন প্রেম বিগ্রহ রূপে পূজিত হন। সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত কহিতেছেন:—

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগ দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

ভগবানের ভজন যাহাদের ব্রত হইয়াছে, এমন ভক্তি আচরণকারী মানবকুল নিজ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে, ভগবান তাঁহাদের পরম প্রিয় স্বজন এই ভাবে তাহাতে অনুরাগ উৎপন্ন হয়। এইভাবে কৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে অবশচিত্ত ভক্ত করুণানিধি ভগবান কৃষ্ণের লীলা রহস্য জানিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে থাকেন। হাসিবার কারণ এই—যিনি সর্ব্বশক্তিমান ভগবান, যিনি ভবভয়হারী, যাঁর নামে যাবতীয় ভবভয় দূর হইয়া যায়—তিনি জরাসন্ধের বা কাল যবনের ভয়ে পালাইলেন, যার লোমকূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ধূলিকণার ন্যায় রহিয়াছে, তিনি সাগর বন্ধন জন্য সুগ্রীবাদির সাহায্য গ্রহণ করিলেন, অহো কৃপাময়ের কি লোক রহস্য! এই চিন্তাকরতঃ সাধক হাসিতে থাকেন, কখন বা কাঁদিতে থাকেন। কাঁদিবার কারণ এই—অখিল জগতের স্বামী ভক্তিপাশে আবদ্ধ হইয়া চোর সাজিয়াছেন—মা যশোদার কাল ছেলেটিকে দেখে ব্রজগোপীদের ইচ্ছা হইত যশোদা যেমন কৃষ্ণকে ননী ছানা খাওয়ায়, আমরা তেমন খাওয়াব। "এই অভিলাষ যশোদার কাছে ব্যক্ত করিলে, মা যশোদা না করিতেন, বলিতেন 'আমার ঘরে কি ননী-ছানা নাই, তোদের ঘরে খেতে যাবে; আমি ব্রজ রাজ-মহিষী, আমার ছেলের আবার ননী-ছানার অভাব!" শুনিয়া ব্রজগোপী-গণ একান্ত মনে প্রার্থনা করিতেন—"হে বিধাতা, ওই যে নন্দনন্দন কৃষ্ণ, যদি চুরি করবার ছলে একবার আমাদের গৃহে নিত্য আসে তা হলে কৃষ্ণের চাঁদ বদন দেখে আমরা নয়ন-মন-প্রাণ শীতল করি, আর যশোদার কাছে 'তাঁর ছেলে মোদের ঘরে দধি দুগ্ধ মাখন ছানা চুরি করে' বলিয়া অভিযোগ কর্ত্তে যাবার সময় শ্যামসুন্দরের মধুর হাসি মাখা বদনখানিও দেখে আসি।" অন্তর্য্যামী ভগবান কৃষ্ণ মধুর রসের ভক্ত গোপকামিনীগণের জন্য বাৎসল্য রসের ভক্ত মা যশোদার অভাব দেখাই-

লেন। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—এইবাক্য সফল করণার্থ তিনি চোর সাজিলেন, ননী ছানা প্রভৃতি চুরি করিয়া ব্রজসুন্দরীদের মনবাঞ্ছা সফল করিলেন। মানুষ! তোমার স্বার্থপর মানুষ বন্ধুর সঙ্গে মানুষাকারে পরিণত অমানুষ সর্ব্বসুখদাতা করুণানিধি বিশ্ববন্ধু কৃষ্ণের একবার তুলনা কর। তোমার স্বার্থপর নর-বন্ধু চুরি করিয়াছে; তাকে তুমি চোর বল, সে কিছুতেই চুরি করা স্বীকার করিবে না, তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে বরং সে চোর সাজাইবে। কেননা চোর সাজিলে তার যে মানহানী হইবে, মিথ্যা বলিয়া তোমার গলায় ফাঁস বাঁধিয়া সে জগতে মানী সাজিবে! আর যে অখিল বিশ্বের মাননীয়, যাঁর চরণরজ ব্রহ্মা-শঙ্কর পাবার জন্য লালায়িত, সেই সর্ব্ব মাননীয় পুরুষোত্তম, প্রিয় ভক্তের বাসনাপূর্ণ জন্য মান ছাড়িয়া চোর সাজিল! এমন প্রাণবন্ধু ভগবান কৃষ্ণকে তুমি বন্ধুরূপে ভাবিলে না ত তোমার যে চিরদিন হাহাকার করিয়া মরিতে হইবে! কৃষ্ণবন্ধু ভিন্ন লজ্জা-কুল-মান-ধর্ম্ম কোন মানুষ-বন্ধু রাখিতে সমর্থ হয় না। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী মহাবলবান; রাজসভাতে বসিয়া আছে। দুষ্ট বুদ্ধি দুঃশাসন একবস্ত্রা রজস্বলা ধর্ম্মিনী দ্রৌপদীর কেশে ধরিয়া টানিয়া রাজসভাতে আনয়নপূর্ব্বক তাঁকে উলঙ্গিনী করিতে চেষ্টা করিতেছে। দ্রৌপদী সজল নয়নে পাঁচটী স্বামীর প্রতি চাহিতেছেন, মনের ইচ্ছা তাঁরাই রক্ষা করিবেন। কিন্তু তারা কিছু করিতেছেন না দেখিয়া ভীষ্ম পিতামহ ও আচার্য্য দ্রোণের দিকে চাহিলেন। তাঁরাও রক্ষার কোন চেষ্টা করিলেন না। এদিকে দুঃশাসন মাথার ও পিঠের কাপড় সরাইয়া বুকের কাপড় সরাইতে চেষ্টা করিল। দ্রৌপদী নিরুপায় দেখিয়া 'লজ্জা ত রাখিতে হইবে' এই মনে করিয়া দাঁতের দ্বারা বস্ত্র কামড়াইয়া ধরিলেন; ভাবিয়াছে দাঁতের দ্বারা লজ্জা

রাখিবেন। কিন্তু তাহাও পারিল না। দুষ্ট যখন দাঁত হইতে কাপড় সরাইয়া নিল, তখন দ্রৌপদীর মনে পড়িল এ বিপদে লজ্জা রক্ষা করিতে প্রাণসখা কৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহই নাই, এই ভাবিয়া, 'হা লজ্জা নিবারণকারী প্রাণসখা কৃষ্ণ! কোথায় তুমি! এ বিপদে আমাকে রক্ষা কর' এই বলিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। রাজ-সভার শিষ্ট মানবগণ কাঁদিয়া ফেলিলেন, অচিন্ত্য-ভাবে দুষ্টগণ কাঁপিতে লাগিল। সেই সময় এক স্বর্গীয় মধুমাখা প্রাণজুড়ান বাণী দ্রৌপদী শুনিলেন—"এতক্ষণ পরে বুঝি আমাকে মনে পড়েছে। এই দেখ সখি আমি এসেছি, আর ভয় নাই!" তিনি উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—নয় কাল নয় গোরো এমনরূপে আকাশমার্গ আলো করে হাসি মাখা মুখে রঙ্গিন সাড়ী হাতে করে প্রাণের ঠাকুর দাঁড়য়ে আছেন। অমনি দ্রৌপদী নির্ভয় মনে, সেই প্রাণবন্ধু মনের মানুষের রাঙা চরণ দুটী মনে মনে বুকের উপর রেখে নয়ন গোমুখীর অশ্রু সুরধুনির ধারায় ধোয়াইতে লাগিলেন। দুঃশাসনের পাপবাসনা মিটিল না। সেই কণ্ঠ দেশের কাপড় যতই টানিতেছে, ততই বাড়িতেছে; গলার নীচের কাপড় আর সরাইতে পারিল না। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বড় বীর দুঃশাসন পুঞ্জীকৃত বস্ত্রের মধ্যে বসিয়া নিজেই ঢাকা পড়িয়া গেল। দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষা পাইল প্রাণবন্ধু কৃষ্ণের কৃপায়। এমন সখাকে আমি কেমন করিয়া সন্তোষ করিব?—এই ভাবিয়া ভগবানের করুণা ও গুণে মত্ত-মন ভক্ত কাঁদিতে থাকেন। এই সব ভগবানের অপার গুণের কথা ভাবিয়া ভক্ত অজ্ঞাতসারে অব্যক্ত ভাব, কখন চীৎকার পূর্ব্বক, কখন বা অব্যক্ত ভাবে প্রকাশ করেন। বিভুর প্রেমে পাগল ভক্ত কখন বা "হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ" বলিয়া প্রিয়তমের নামগুণাদি গাহিতে থাকেন, কখন বা নির্জ্জন স্থানে 'প্রভুকে আজ কাছে পেয়েছি' বলে

সাক্ষাতে কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করতঃ পাগলের মত নাচিতে থাকেন। ভক্তের এই ভাব ভক্ত ভিন্ন কেহই বুঝিতে পারেন না। দুষ্ট বুদ্ধি পাপী মানবকুল 'এ পাগল হইয়াছে' বলিয়া উপহাস করে। সেই জন্য সাধু ভক্তগণ নির্জ্জন স্থানে বা ভক্তের স্থানে থাকিতে ভালবাসেন; কেননা পাপী লোকের কাছে সাধুর উল্লাস ভাব কম হইয়া যায়, বা দুষ্টগণ সেই ভাব কমাইতে চেষ্টা করে। এ সম্বন্ধে ভক্তমাল গ্রন্থ বর্ণিত একটী ঘটনা আছে। এক দিন একটি বিড়াল বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদকণিকা মুখে লাগিয়া আছে এমন অবস্থায়, সে কোন কামার বৌয়ের ভোজনপাত্রে মুখ দিয়া পাত্রস্থিত বস্তু ভোজন পূর্ব্বক গুপ্তভাবে পালাইয়া যায়। পরে কামার বধু অজ্ঞাতসারে সেই পাত্রের বস্তু ভোজন করিয়া প্রেমিক ভক্তের যে সমুদয় লক্ষণ তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে কখন কাঁদিতেছে, কখন বা হাসিতেছে, কখন বা নির্জ্জনে গিয়া বসিয়া চোখ মুদিয়া কার যেন ধ্যান করিতেছে। এই সব দেখিয়া নির্ব্বোধ কামার-কুল 'হায় হায় আমাদের কি সর্ব্বনাশ! আমাদের বৌ-টির ঘাড়ে যে ভুত চাপিয়াছে'—এই বলিয়া গোলমাল করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবেশ অবতার শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু জীব উদ্ধার করিতে করিতে তত্র উপস্থিত ছিলেন। সাংসারিক লোকের রীত্যনুসারে—সাধু পুরুষের কাছে ভুতঝাড়ান, ছেলে হওয়া, রোগ সারা প্রভৃতির ঔষধ আছে জানিয়া তাহারা আচার্য্য প্রভুর নিকট আসিয়া "প্রভুহে বৌটির ভুত ছাড়ায়ে আমাদের রক্ষা করুন" বলিয়া বিনয় করিতে লাগিল। আচার্য্য প্রভু কৌতুহলপরবশ হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে অজ্ঞাতসারে কামার বধুর মহাভাগ্যোদয় হইয়াছে। বহু ভাগ্যক্রমে যে কৃষ্ণপ্রেম আসে, সেই প্রেম বিড়ালের মুখস্থিত বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট খাইয়া কামার

বৌয়ের হয়েছে ! সে কৃষ্ণ-প্রেম-পাগলিনী হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "তোমরা কোন চিন্তা করিও না ; এ মহাভাগ্যবতী ! এর ভূত চাপে নাই। ভক্তগণ যে কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়া নাচিতে থাকে, হাসিতে থাকে, কাঁদে, তোমাদের বৌটীর সেই কৃষ্ণপ্রেম মহাভাগ্য গুণে আসিয়াছে।" অমনি সেই মূঢ়কুল কহিল—"প্রভু আমরা ওসব চাহি না। যাতে এ পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয় সেই ব্যবস্থা করুন। আমরা সংসারী মানুষ, ওসব কৃষ্ণপ্রেম লইয়া কি করিব ?" আচার্য্য প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তবে এক কাজ কর, এখন বৈষ্ণবনিন্দুক শ্রাদ্ধ-অন্নভোজী ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট বৌকে খাওয়ায়ে দে। গো-দুগ্ধে গোমূত্র পতনের ন্যায় প্রেমময় কোমল দেহ পাষণ্ডের কঠোর দেহে পরিণত হইবে।" কামারকুল তাই করিল। বৌটির কৃষ্ণ-প্রেম নষ্ট হইল। অহো দুষ্ট সঙ্গের প্রভাবে সুমহান ঈশ্বর প্রেমরূপ কল্প-তরু নষ্ট হইল ! সুফলা ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হইল। ধীমানকুল ! সঙ্গদোষ ও সঙ্গগুণ এই স্থলে বুঝিয়া লও ! যদি কামার-বধূ সাধুগণের মধ্যে এই সাধুর ভাব গ্রহণ করিত, তবে তাহার কিছুমাত্র নষ্ট না হইয়া শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় তাহার বৃদ্ধি পাইত ; কিন্তু অসাধু কামার কুলের মধ্যে থাকার জন্য উৎপন্ন সাধুভাবাঙ্কুর পূর্ণ মাত্রায় নষ্ট হইয়া গেল। সাধুভাব যদিও অসাধু ভাবকে নাশ করিতে সমর্থ, তথাপি বহু অসাধুর স্থানে একটি সাধুর প্রভাব তাহা বিনাশ করিতে সক্ষম নয়। বহু বর্ষার জলধারা বালুকাপূর্ণ নদীর বাঁধকে ভিজাইয়া ভাঙ্গিতে পারে নিত্য সত্য ; কিন্তু একটি মাত্র জলধারা বালির বাঁধে নিজেই শুষ্ক হইয়া লুকাইয়া যাইবে। মল্লিকাগুচ্ছ দুর্গন্ধ নাশ করে সত্য ; কিন্তু বিষ্ঠাপূর্ণ স্থানে একটি মল্লিকা ফুল সে সুখদানে ক্ষমতাহীন। আবার সুগন্ধ ফুল দুর্গন্ধহীন নিজ কুঞ্জে যেমন মনকে প্রফুল্ল করে,

দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে সেরূপ আনন্দ দিতে সমর্থ হয় না। সেইরূপ সাধু বহু অসাধুর স্থানে নিজ শক্তি নাশ করে, অসাধুর দোষ বিনাশ করিতে পারেন না। অতএব সঙ্গের দোষ ও গুণ প্রাপ্তির কারণ বুদ্ধিমান মানব অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে বাস করিবে। অথবা যেস্থান দুষ্ট জনহীন, সেই স্থানে একটী দুর্গন্ধহীন কুঞ্জে একটী সুগন্ধ ফুলের তুল্য স্বেচ্ছায় হাসিতে থাকিবে। পান-ভোজনাদি দ্বারা অসৎসঙ্গও সুজন মানবের অতীব অমঙ্গল জনক। কুভক্ষ্য ভোজী মন্দ প্রবৃত্তি দুষ্টজনের সহিত পান-ভোজন অথবা তাহাদের হস্ত-পৃষ্ট অন্ন জলাদিও ভাল মনে কুবাসনা জাগাইয়া দেয়। এই জন্য সাধু সাবধান হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে যেখানে নিজের ভাব ধরাইতে পারিবেন, সেইখানে বই আর কোন স্থানে বহুদিন থাকিবেন না। ফুলের তুল্য সাধু মরুভূমি তুল্য দুষ্ট-জন-কোলাহলপূর্ণ স্থানে বিকশিত না হইয়া দুষ্টজন-রবশূন্য-রূপ-নির্জ্জন-কাননকুঞ্জে বিকশিত হয়—ইহা ঈশ্বরের চির স্বতঃসিদ্ধ অভিপ্রায়। এই জন্য সাধুগণ সুজন পূর্ণ স্থানে অথবা নির্জ্জন স্থানে আপন ভাবে মগ্ন থাকেন। বর্ষাকালের মেঘসমূহ যেমন চির সুন্দর পূর্ণচন্দ্রকেও মলিন করে, সেইরূপ বহু দুষ্ট মানব সাধু মানবকে যে দুষ্টাকারে পরিণত করিবে, তাহাতে কোন আশ্চর্য্যকর ভাব নাই। প্রদীপ নিজ সমীপে অন্ধকার রাখিয়া অপরের নেত্রান্ধকার নাশ, সমুদ্র হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ হইয়াও মুক্তা রত্নদানে উত্তাল-তরঙ্গময় ফেনপুঞ্জ মণ্ডিত সৌন্দর্য্য দর্শনে অপরকে সুখী, চন্দ্রমা বক্ষে মালিন্য রাখিয়া মলিনা নিশিকেও উজ্জল, গিরিকুল কঠিন হইয়াও নির্ঝরামৃত ধারায় জগতের হিত-সাধন করেন, সেইরূপ ঈশ্বরভক্ত সাধুগণ নিজের দোষ নিজের কাছে রাখিয়া অপরকে সদ্গুণে ভূষিত করেন—ইহা বিজ্ঞ মানবই জানেন। এই সব কারণে কৃষ্ণ ভক্ত সাধুর ক্রিয়া মুদ্রা (দেহ নয়নের

ভঙ্গী হাস্য প্রভৃতি ) কৃষ্ণ ভক্ত ভিন্ন সংসার মায়ামুগ্ধ অথচ নাম মাত্র শাস্ত্র গ্রন্থ পাখীর কৃষ্ণ বলার মত কণ্ঠস্থ করিয়াছে, মূঢ় জীব যাহাকে বিজ্ঞ বলে, তেমন মনুষ্য বুঝিতে সমর্থ হয় না।—এই জন্য চৈতন্যচরিতামৃত-কার বলিতেছেন—

"বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রাবিজ্ঞে না বুঝায়।"

কেমন করিয়া বুঝিবে! সংসার মায়ামুগ্ধ জীব, অদ্ভুত শক্তিসহ ভগবানকে সাক্ষাতে দেখিয়াও তাঁহাকে যখন মানে না, তখন তার ভক্তগণকে যে মানিবে না এতে আর আশ্চর্য্য কি? জরাসন্ধ তেইশ অক্ষৌহিনী সৈন্য লইয়া কৃষ্ণ-বলরামকে মারিতে গেল; রামকৃষ্ণ পলকের মধ্যে সেই সব সৈন্যকে সংহার করিলেন। একবার দুবার নয় সতেরো বার এই রকমে সংহার করিলেন; তবুও বাহিরের মায়াতে মুগ্ধ জরাসন্ধ সর্ব্বশক্তিমান কৃষ্ণকে চিনিতে পারিল না। সে জানিত কৃষ্ণ একজন মায়াবী বুদ্ধিমান ধৃষ্ট যদুকুলজাত, তাহার চেয়ে একটু মাত্র বলে নয় চাতুরীতে বেশী একজন মানব। ইহাই বহিরঙ্গ মায়া! যত দিন জীব এই মায়াতে মুগ্ধ থাকিবে তত দিন কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবকে চিনিবে না; শ্রীমদ্ভাগবত কহিতেছেন—

"রজসা ঘোরসংকল্পা কামুকা অহিমন্যবঃ।
দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্॥"

রজঃগুণী পাপ বাসনা পোষণকারী, স্ত্রী-কামুক, সর্পের ন্যায় ক্রোধী, অহঙ্কারী ( নিজে বড় বলিয়া অভিমানকারী ), মূর্তিমান পাপের তুল্য জীবকুল অচ্যুতপ্রিয় বৈষ্ণবকে দেখিয়া হাস্য করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় মানবকুল জগৎ পবিত্রকারী বলিয়া সাংসারিক মায়ামুগ্ধ জীবের

যে ধর্ম্মাচরণ রীতি তাহা বৈষ্ণবের নাই—এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

"দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং, ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং, গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥"

হে রাজন্! যে কায়মনোবাক্যের দ্বারা সকলের আশ্রয় মুক্তি দাতা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিতে শিখিয়াছে, সাংসারিক নিয়ম কার্য্যকে তুচ্ছ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে, তাঁর দেবঋষি আত্মীয় পিতৃলোকের যে ঋণ তাহা নাই, তাঁহাকে কেহ ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাবহ করিতে সক্ষম হয় না, কেন না সে নিত্য মুক্ত কৃষ্ণদাস, জগতের পূজনীয়। কি ভাবে সংসারী জীব এমন কৃষ্ণদাস হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে কহিতেছেন—

"ইষ্টং দত্তং তপোজপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্ ॥"
—ইত্যাদি।

তোমার মঙ্গলকারী বস্তু, দানকরা বস্তু, তপ, যাহা জপকরিবে, জানিবার যাহা আছে তাহা, নিজের প্রিয় বস্তু, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, প্রাণ, পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতে পারিলে নিত্য মুক্ত বৈষ্ণব হইতে পারা যায়। পূর্ব্বোক্ত নয় প্রকার ভক্তির মধ্যে সংসার মায়ামুগ্ধ চঞ্চল মন যদি এক প্রকার ভক্তি নিষ্ঠাপূর্ব্বক ( কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম, বা কৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণাদি ) করে তবে তাহাতে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে নিজের করিয়া লইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে চৈতন্য-চরিতামৃতকার কহিতেছেন—

"এক অঙ্গ সাধে কিংবা সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হইলে হয় প্রেমের তরঙ্গ ॥"

এক অঙ্গ বা এক প্রকার ভক্তি বিশ্বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যদি কেউ প্রয়োগ করে, তবে তাহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম (আত্মবৎ ভালবাসা) হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত আত্মবৎ ভালবাসা করিতে পারিলে জীব নিত্য মুক্ত বৈষ্ণব পদবাচ্য হয়। কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবের কাছে মায়ামুগ্ধ মূর্খ জীব 'কিছু আশ্চর্য্য দেখাও' (অগস্ত্য ঋষি যেমন সাত সাগরের জল এক গণ্ডুষে পান করিয়াছিলেন, তুমি ত কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব মহাশক্তিমান সেইরূপ কিছু আশ্চর্য্য দেখাও) এই বলিতে থাকে। সেইরূপ পশুরূপী জীবদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে অগস্ত্য ঋষি সাত সমুদ্রের জল পান করিয়াছেন, তাহা ত তোর মত মানুষ দেখেন নাই, দেখিয়াছেন কৃষ্ণভক্ত ঋষিগণ। তাঁরা ভক্তিবলে তাহা দেখিয়াছেন। তাই পুরাণাদিতে সেইসব ইতিহাস লিখিয়াছেন। তুমি কৃষ্ণের ভক্তি করিতে শিখ, তাহা হইলে অগস্ত্যের সমুদ্র জলপানাদি দেখিতে পাইবে। তোমার ভক্তির প্রভাবে কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবের শরীরে কৃষ্ণরূপ দেখিয়া কাঁদিতে থাকিবে। ভক্ত প্রহ্লাদের ভক্তি প্রভাবে ভগবান স্তম্ভ হইতে প্রকাশ হইয়াছেন; আর ভক্তির প্রভাবে ভক্ত বৈষ্ণবের শরীরে যে প্রকাশ হইবেন, ইহাতে কোন অদ্ভুতত্ব নাই। মূল হইয়াছে এক ভক্তি। সেই ভক্তি তুমি যতক্ষণ অধিকার করিতে না পারিবে, ততক্ষণ তোমার ভক্ত ও ভগবান চিনিবার শক্তি আসিবে না।

কেমন করিয়া সেই ভক্তি জীবের হইবে এ সম্বন্ধে ভগবান কপিল দেব নিজ মাতা দেবহুতিকে যাহা কহিয়াছেন তাহা এই—

"সতাং প্রসঙ্গান মমবীর্য্য সংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়না কথা।
তজ্জোষণাদাশ্বপর্গ বর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতি ভক্তিরনু ক্রমিষ্যতি॥"

আমার বিক্রম জানিয়াছে যে সাধুগণ এবং তাহা জানিয়া আমার উপর সম্পূর্ণ জীবনভার নির্ভরপূর্ব্বক যাঁহারা নির্ভয়ে এই বিশ্বসংসারে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁদের নিকট আমার লীলাপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিলে তাহা রসায়ন সদৃশ বলকর হইয়া মোহরোগগ্রস্ত দুর্ব্বল জীবকে আনন্দ স্বরূপ অপবর্গ ( মুক্তি ) পথে লইয়া যাইবে। এইরূপ সাধুগণের কাছে কৃষ্ণকথা শ্রবণরূপ সেবা করিতে করিতে মূঢ় জীবের বিশ্বাস ও আত্মবৎ সেবাকারিণী ভক্তি আসিবে। এই ভক্তি সকলেরই প্রার্থনীয়। কৃষ্ণ সকলেরই আরাধ্য। কৃষ্ণভক্তি ভিন্ন, কৃষ্ণ-আরাধনা ভিন্ন জীবের ভব-সমুদ্র পার হইবার উপায় নাই। মায়ার সংসারে নারী-পুরুষ এই দুই শ্রেণীর জীব দেখা যায়। ইহার মধ্যে কেবল পুরুষকে কৃষ্ণ ভজন করিতে হইবে, আর নারীকে কৃষ্ণ ভজন করিতে হইবে না—একথা স্বপ্নেও যেন কাহারও মন মধ্যে উদয় না হয়। এ সংসারে পুরুষ তুমি যে অভাবে কাঙ্গাল সাজিয়া নারীর দাস হইয়াছ, নারীও তুমি সেই অভাবে কাঙ্গালিনী সাজিয়া পুরুষের দাসী সাজিয়াছ। তোমরা উভয়েই সমান। তোমরা উভয়েই কৃষ্ণের কাছে সমান অভাবের কাঙ্গাল। এই কারণ উভয়কেই কৃষ্ণভজন দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ করিতে হইবে। সেই হেতু চৈতন্যচরিতামৃতকার কহিয়াছেন—

"কৃষ্ণ ভজনে হয় সবে অধিকারী।
কিবা শূদ্র কিবা বিপ্র কি পুরুষ নারী॥"

সত্যযুগে প্রত্যেকেরই ভক্তি জ্ঞান অর্জ্জন রূপ ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম কার্য্য করিতে হইত। সেই জন্য কাহারও চৌর্য্য মিথ্যা জীবহত্যা প্রভৃতি জীব ক্লেশকর কার্য্য করিতে হইত না; ঈশ্বর দর্শন জনিত সুখ সকলেই প্রাপ্ত হইতে থাকিত।

ঈশ্বরই সকলের রক্ষাকারী সুখদাতা—ইহা ভাবিয়া স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর জীব যদি "আমি একটী জীব" এই জ্ঞান আসা হইতে প্রাণমাত্র বৃত্তি ধারণ পূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে কৃষ্ণচিন্তায় নিরত হইত, তাহা হইলে মাতাপিতাকে পুত্রকন্যা অভাব জন্য দুঃখ, পুত্রকন্যাকে মাতাপিতা অভাব জন্য দুঃখ, স্বামীকে স্ত্রী অভাব জন্য দুঃখ ও স্ত্রীকে স্বামী অভাব জন্য দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। সত্যযুগে এইরূপ নিয়মাবদ্ধ জীবকুল কোন প্রকার সংসার ক্লেশ ভোগ করিত না। আহা! সত্যযুগের সেই সত্যসুখপূর্ণ চিন্ময় গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আজ কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবের হৃদয়ে আর শাস্ত্র পুরাণাদিতে বর্ত্তমান, কলি-মায়ামুগ্ধ অজ্ঞানী জীবের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতেছে। এই কারণ কলিযুগের পুত্রকন্যা পিতৃধনে ধনী না হইলে পিতামাতাকে তিরস্কার করে, দুঃখ দিতে কুণ্ঠিত হয় না। মাতাপিতা পুত্রকন্যার উপার্জ্জিত অর্থ সুখে সুখী হইবার জন্য তাহাদিগকে মিথ্যা চৌর্য্য অসদবৃত্তি প্রভৃতি পথে দিতে অকুণ্ঠিত চিত্ত; এবং স্ত্রী স্বামী প্রদত্ত অর্থে সুখিনী হইবার বাসনায় গুরুরূপী স্বামীকে চণ্ডালের ন্যায় জীবের দাসত্বে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছে। মা যশোদা যে পুত্রকে চিরদিন ননীখেকো গোপাল জানিয়া দুধের ধারায় বুক ভাসাইয়াছেন, কলি যুগের মা সেই পুত্রকে নিজে সুখ পাবার জন্য তাকে জ্ঞান শিক্ষা সুখ প্রভৃতি না দিয়া, পুত্রের বক্ষে জীবিকা নির্ব্বাহ কার্য্যরূপ পাষাণ চাপা দিয়া রাক্ষসী সাজিতেছে। ব্রজগোপীগণ যে স্বামীর চরণে ধন-যৌবন সমর্পণ পূর্ব্বক বিনামূল্যের দাসী হইয়াছেন, কলিযুগের নারী সেই স্বামীর কাছে যৌবনের মূল্য স্বরূপ অলঙ্কার সম্পত্তি প্রভৃতি গ্রহণ করিতেছে এবং সেই মূল্য দিতে না পারিলে স্বামীকে অপরের চাকর সাজাইতেছে। সেইজন্য ব্রজের ঠাকুর গৌরসুন্দর আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—

"কাঁহা মেরে বৃন্দাবন কাঁহা যশোদা মাই।
কাঁহা নন্দ উপানন্দ কাঁহা প্রেমময়ী রাই॥"—ইত্যাদি।

এই কান্না কে বুঝিল? যে একটু উপরের লোক সেই বুঝিল। যখন বুঝিয়াছে তখন সে ভিখারী সাজিয়া বৃন্দাবনের দিকে ছুটিল এবং কহিতে লাগিল,—সংসারের সুখ-দুঃখ দিন-রাত্রির ন্যায়, শীত-বর্ষার ন্যায় প্রার্থনা না কর্ত্তেই আপনা হতে এসে যায়। সুখের আশায় পাগল হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাওয়া কেবল মাত্র দুঃখ পাবার হেতু। আমি কারও পিতা পুত্র বা স্বামী নই। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ একাধারে পিতা পুত্র বা স্বামী এসব হন। তিনি প্রসন্ন থাকিলে স্বামী-স্ত্রী-পুত্র, পিতৃ-মাতৃ সুখ সময়ে সকলই মিলিবে। স্ত্রীসঙ্গের দ্বারা মায়াময় সংসারের সৃষ্টি। এই মায়াময় সংসারের মধ্যে থাকিয়া জীবকুল হিংসা-কপটতা অহঙ্কারযুক্ত মানসে সুখনিধি করুণানিধি কৃষ্ণকে ভুলিয়া দুঃখমালা গলায় পরিতে থাকে। এই জন্য চৈতন্যচরিতামৃতকার কহিতেছেন—

"এক স্ত্রীসঙ্গী অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর।"

ইহার অর্থ এই—জগতের মধ্যে দুইটী অসাধু; একটি স্ত্রী-সঙ্গী অসাধু, আর একটি যে করুণানিধি কৃষ্ণকে ভক্তি করে না। এখানে স্ত্রী-সঙ্গী যে অসাধু, তাহা এই প্রকার স্ত্রী-সঙ্গী বুঝিতে হইবে। যে পুরুষ সদাই নারীর রূপ গুণে আকৃষ্ট হইয়া হিংসা ক্রোধ পরায়ণ মানসে ঈশ্বর চিন্তা ত্যাগ পূর্ব্বক চৌর্য্য মিথ্যা প্রভৃতি পাপ প্রবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতঃ সেই নারীর দাসত্বে পাপী অজামিলের ন্যায় কাল যাপন করে। এইরূপ নার্য্যাশক্ত জীবই নারী বলিয়া কথিত। এই সংসারে প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, তদ্ভিন্ন সকলেই নারী বা প্রকৃতি বলিয়া কথিত। তাহা গীতার এই শ্লোকে লিখিত, যথা—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

অর্থাৎ হে মহাবাহো অর্জ্জুন! ইহা ছাড়া আমার আর একটি অপরা শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি আছে জানিবে। সে জীবময়ী প্রকৃতি, যাহার দ্বারা সংসারের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য চলিতেছে। অতএব জীবমাত্রেই প্রকৃতি বা নারী। মায়ার সংসারে যাহারা পুরুষ বলিয়া অভিমান করে, তাহারা নারী, আর নারী ত নারীই আছেন। একটি শরীরের তুটী ভাগ করিয়া সৃষ্টি কার্য্য চলিতেছে। একটি ভাগ পুরুষ বলিয়া, একটি ভাগ নারী বলিয়া মায়ার চক্ষে দেখা যাইতেছে। কিন্তু তুটীতে একটি ভিন্ন তুটী কখনই হইতে পারে না। তুটী যদি পৃথক হইত, তবে তুটিতে মিলিয়া পুত্র হক্ বা কন্যা হক্, কখনও একটি জীব সৃষ্টি হইত না। যেমন ধান্য হইতে একটি ধান গাছ হয়, সেই ধান্যটীকে সম তুই ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার দ্বারা গাছ উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ মানুষ তুই ভাগে বিভক্ত কেবল নারী ভাগের দ্বারা বা পুরুষ ভাগের দ্বার পুত্রাদি উৎপন্ন করিতে পারে না। অতএব তুটীর দ্বারা যখন একটির সৃষ্টি, তখন এই তুটিতেই একটি। প্রথমে নারী ভাগ পুরুষ ভাগ এক দেহে থাকিত; তাহার দ্বারা—একটির দ্বারা—ধান্য হইতে বৃক্ষ উৎপত্তির ন্যায় মানসী সৃষ্টি হইত। কিন্তু তাহার দ্বারা সংসারের সৃষ্টি হইতেছে না দেখিয়া ব্রহ্মা একটি দেহকে তুইভাগে বিভক্ত করিয়া পুরুষাভিমান সায়ম্ভুব মনু ও নারী অভিমান শত রূপা কন্যা সৃষ্টি করিলেন। এই সময় হইতে মৈথুনধর্ম্মের দ্বারা সৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই পুরুষ নারী একটি দেহ বলিয়া, পুরুষমাত্রেই নারী দেখিয়া, ও নারীমাত্রেই পুরুষ দেখিয়া মুগ্ধ এবং আসক্ত হইতে চেষ্টা করে। তবে স্বত্ব-রজ-তমঃ তিন গুণানুসারে নর-নারীর মিলন হইয়া থাকে। কৃষ্ণভক্তিসম্পন্ন জীব-প্রকৃতি কৃষ্ণধ্যান

নিবন্ধন অনাসক্ত হইয়া অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহারাই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া কথিত হন। কেননা লৌহ অগ্নি না হইলেও অগ্নি সংযোগে সে যেমন অগ্নি তুল্য হইয়া দাহিকা শক্তি ধারণ করে, সেইরূপ ধ্যান যোগে কৃষ্ণসহ সংযোগে কৃষ্ণভক্ত জীব-প্রকৃতি কৃষ্ণতুল্য শক্তিমান হইয়া মায়া প্রকৃতিকে পদানত করে। কৃষ্ণভক্তিহীন মানব বা জীবপ্রকৃতি নারীর দাসত্বে কাল যাপন করে বলিয়া তাহারাই নারী ভিন্ন অন্য কোন পদবাচ্য হইতে পারে না; কেননা নারীতে আসক্ত জীবই নারী। নারীতে অনাসক্ত জীবই পুরুষ। এখানে আসক্ত বলিলে অজামিলের ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইয়া যে নারীতে আসক্তি। এইরূপ আসক্তিযুক্ত জীবই বদ্ধ জীব বা অসাধু বলিয়া পরিচিত। নতুবা ক্ষণিক স্ত্রী-সহবাস পূর্ব্বক ধর্ম্মচিন্তা-কৃষ্ণধ্যান নিরত মানবকে স্ত্রী-সঙ্গী অসাধু বলা যায় না। অল্পবুদ্ধি মানবকুল এই ক্ষণকাল স্ত্রী-সঙ্গের গুণে প্রদীপে পতঙ্গ সদৃশ আকৃষ্ট হইয়া ঈশ্বরচিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্বলিয়া মরিতে থাকে। এই কারণ অল্পবুদ্ধি সাধারণ মনুষ্যের স্ত্রী-সঙ্গ করা নিষেধ। শক্তিমান বিশেষ বুদ্ধি ঈশ্বরপরায়ণ মানবের স্ত্রী-সঙ্গের নিষেধ নাই। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবৎ কহিতেছেন—"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নে সর্ব্ব ভুজো যথা।" অর্থাৎ তেজস্বী পুরুষদিগের সমীপে কোন দোষ সম্ভব হয় না। আগুণ যেমন কাঠ, খড়, ঘৃত, মল প্রভৃতি কুৎসিৎ বস্তুকেও নিজের রঙ ধরাইয়া আগুণ করিয়া লইয়া থাকে, সেরূপ শক্তিমান সাধু পুরুষেরা নারী জাতিকেও পরম পবিত্র করিয়া থাকেন। মুনি-ঋষিগণের স্ত্রীপুত্রাদি সব ছিল, কিন্তু তাঁহারা সদাই ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন বলিয়া, নারীসঙ্গজনিত যে সংসারমোহ-হিংসা-ক্রোধ প্রভৃতি তাহাদিগকে বাধ্য করিতে পারিত না। বিবাহকালীন বশিষ্ট অরুন্ধতীকে দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে 'বরকন্যা তোমরা দুজন ঋষিবর বশিষ্ট ও

সতী অরুন্ধতীর ন্যায় ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া ঋষিদিগের যে সত্য সংসার তাহাই কর।'

পরম-বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীপাদ জয়দেব গোস্বামী নিজ পত্নী পদ্মাবতীর সহিত রাধাকৃষ্ণ ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন, যাঁহার গীতগোবিন্দ শ্রবণে ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণও বিমোহিত হইতে থাকেন। আর কৃষ্ণ ভজন না করিলে সকলেই যে অসাধু তাহা চির স্বতঃসিদ্ধ। কৃষ্ণ নাম ভিন্ন কলি জীবের উদ্ধারের আর উপায় নাই। বৃহন্নারদীয় পুরাণে এ সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

এই কলি যুগে হরি নাম ভিন্ন জীবের আর কোন গতি নাই। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে ধ্যান, যজ্ঞ, পরিচর্য্যা এই তিনটি দ্বারা ক্রমান্বয়ে জীবগণ করুণানিধি কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিযুগে এক মাত্র তাঁর নাম স্মরণ দ্বারা তাঁহাকে পাইবে—নিশ্চয়তাসূচক তিনবার উদ্দেশ্য বিধেয়ের উচ্চারণ করা হইয়াছে। হে কলির জীব! দিবা-নিশি সর্ব্ব সুখদাতা সেই করুণানিধি শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ কর। কেহ যদি দিন-রাত্রি 'দুধ খাব' বলিয়া চীৎকার ও মনে মনে ধ্যান করিতে থাকে, তবে তাহার যেমন দুধ ভোজন মিলিয়া যায়, সেইরূপ সর্ব্ব সুখদাতা কৃষ্ণ নাম বাক্য ও মনের দ্বারা ডাকিতে শিখিলে কৃষ্ণবস্তুও মিলিয়া যায়। কৃষ্ণ আমার কে?—এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত কহিতেছেন—

'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥'

সেই তত্ত্ববাদীরা যাঁহাকে দ্বৈতরহিত জ্ঞান বলেন, উপনিষৎবেত্তা যাঁহাকে ব্রহ্ম, আত্মাতত্ত্ববাদী যাঁহাকে পরমাত্মা, ভক্তগণ যাঁহাকে ভগবান

বলিয়া থাকেন, কৃষ্ণ আমার সেই সর্ব্ব সুখদাতা ভক্ত প্রেম প্রয়াসী চিন্ময়, ভক্তের বাসনা পূর্ণ জন্য মনুষ্য বিগ্রহে স্থিতিশীল। এই কৃষ্ণ শব্দের যে ব্যুৎপত্তি মূলক অর্থ ব্রহ্ম সংহিতাতে লেখা আছে, তাহা এই—

'কৃষির্ভূবাচকো শব্দো নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োশৈচক্যং পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥'

অর্থাৎ 'কৃষ' ধাতুর অর্থ 'উৎপত্তি', 'ণ' কারের অর্থ 'রহিত করা' বা 'নাশ করা'; এই দুই মিশিয়া 'কৃষ্ণ' শব্দ হইয়াছে—যাঁর শরণাপন্ন হইলে জীবের আর ভবসংসারে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। জন্মিলেই ত যাবতীয় সংসার-দুঃখ জীব পাইতে থাকে, অতএব সেই জন্ম-দুঃখ খণ্ডনকারী পরম ব্রহ্ম যিনি তিনিই কৃষ্ণ। বিরজা নদীর পরপারে মায়া রাজ্যস্থিত জীবলোকের দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য "আমার ভক্তি করিলে এই মায়া-রাজ্যের ভিতরেও তোমরা সেই নিত্য সুখধাম বৃন্দাবনের সুখ প্রাপ্ত হইবে, আমি তোমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য এখানেও আসিব"—এই বাক্য পালন জন্য যিনি অষ্টবিংশ মন্বন্তরে দ্বাপর যুগের শেষভাগ সময়ে হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধার সহিত স্বপার্ষদ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং ধরাধামে ভৌম বৃন্দাবন মাথুর মণ্ডলাদি স্থাপন পূর্ব্বক ভারতখণ্ডকে পুণ্যভূমি করিয়াছেন, তিনিই আমাদের নন্দনন্দন ব্রজবিহারী রাধারমণ সর্ব্ব সুখদাতা করুণা-নিধি কৃষ্ণ! এমন যে ব্রহ্মবস্তু কৃষ্ণ—

"বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।"

অর্থাৎ যিনি সকলের অপেক্ষা বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রকে বড় করিতে সক্ষম (যাঁর ইচ্ছায় একটী সামান্য তৃণও পর্ব্বতকারে পরিণত), তিনি অপার করুণানিধি না হইলে কি ধরাধামে আসেন! সাধারণ মানবের ন্যায়

ভক্তের নিকটে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী ভক্ত ভাবের বাধ্য হইয়া কতই না লৌকিক খেলা করিয়াছেন। যে সর্ব্ব-শক্তিমান অবিজ্ঞেয় তত্ত্ব ভগবান মানুষ সাজিয়া তোমাকে সুখী করিতে উদ্যত—মায়ার দাস ইন্দ্রিয়ের দাস তুমি, শৃগাল-কক্কুর ভোগ্য ক্ষণভঙ্গুর দেহকে ভালবাসিয়া এমন সচ্চিদানন্দ নবঘন কান্তিকে ভালবসিলে না! এই জন্য ত তুমি দুঃখ পাইতেছ। শ্রীমদ্ভাগবত কহিতেছেন—

"এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকে মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥"

অর্থাৎ জগতে যত অবতার আছেন সে সব পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অংশ কলা মাত্র; আর শ্রীকৃষ্ণ আমার ষোল কলায় পূর্ণ চিরদিন পূর্ণিমার চাঁদ। যখন ইন্দ্রারি (দৈত্য) দ্বারা সংসারের লোকসকল দুঃখ পাইতে থাকে, তখন অংশ কলা অবতার দ্বারা দুষ্ট দলন পূর্ব্বক জীব-গণকে সুখ দিতে থাকেন। আমার ব্রজলীলা কেহ বুঝিল না; ব্রজ লীলাকে মায়িক সংসার লীলার তুল্য জ্ঞান করিয়া নরকুলের দুঃখ হইতেছে দেখিয়া সেই ব্রজ-বৃন্দাবন-যমুনা-পুলিন-বিহারী গৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং নিজে ভক্তি আচরণ দ্বারা 'ভক্তি ভিন্ন মধুর ব্রজ লীলা কেহ বুঝিতে সক্ষম নয়' ইহা জানাইয়াছেন। সন্ন্যাসী হইয়া ভিখারী বেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া নিজ ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। হে জীব! অপার সংসার-দুঃখ-সমুদ্র পার হইবার জন্য এই করুণানিধি শ্রীকৃষ্ণের চরণতরীকে আশ্রয় কর! অনন্ত করুণাময় ভগবানের দু'-একটা করুণার দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। হে মানব! ভক্তিনেত্রে কৃষ্ণ করুণানিধির দিকে দৃষ্টি কর, তাঁর অপার করুণার প্রমাণ পাইয়া তুমিও নির্ব্বাকভাবে কাঁদিতে থাকিবে।

শিব দেখ, ব্রহ্মা দেখ, ইন্দ্র-চন্দ্র-সূর্য্যাদি দেখ, কাহাকে দেখিয়া এমন নয়ন মনের তৃপ্তি হইবে না, যেমন তৃপ্তি চোখ জুড়ান মন মজান ব্রজের পথে যমুনাকূলে কদম্বতলে বাঁশীধরা অলকতিলকমণ্ডিত হাসিমাখা মুখ বনমালী ময়ূরপাখার মোহনমুকুটধারী এই কালো ঠাকুর কৃষ্ণকে দেখিয়া পাইবে। যাঁহার রূপেগুণে বনের পশুপাখী, তরুলতা প্রেমপুলকিত হইয়া কাঁদিতে থাকে, সেই কৃষ্ণনাম শুনিলে সব কিছু শোনা হয়, সেই কৃষ্ণরূপ দেখিলে সব কিছু দেখা হয়। ব্রজবাসকালে গোপবনিতা বৃন্দের সহিত, বস্ত্রহরণ, রাসলীলা প্রভৃতি প্রেমসুখময় সংসার-লীলা করিয়া বহুবল্লভ আখ্যা যিনি ধরিয়াছেন, মথুরাতে গমনপূর্ব্বক স্বীয় বান্ধবদেশ দুস্ত্যজ্য ব্রজভূমি ত্যাগ করিয়া যিনি অপূর্ব্ব বৈরাগ্য ভাব প্রদর্শন করাইয়াছেন, দ্বারকাতে রাজকন্যাকুলের পাণিগ্রহণ করতঃ দৈত্যসংহারকারী সেই সর্ব্বাবতার কলার পূর্ণচন্দ্র করুণানিধি কৃষ্ণকে সকল জীব আশ্রয় লও। অনেক দেবতার সঙ্গে জীবের ভালবাসা হয়, অনেক দেবতা জীবকৃত সেবাসুখাদি ভোগপূর্ব্বক শেষকালে ফিরিয়া দেখে না, কিন্তু একবার মাত্র যে কোন সময়ে যে কোন প্রকারে জীব যাহাকে দর্শন করিলে পরম মুক্তি প্রাপ্ত হয়, সেই বৃন্দাবন-বনদেব কৃষ্ণ করুণানিধিকে সকল জীব আশ্রয় কর। যিনি কুব্জ দেহকে সুন্দর করিয়া কুব্জাকে পরমা সুন্দরী ও ধন্যা করিয়াছেন, ঘৃণিত কার্য্য-কারিণী পিঙ্গলা বেশ্যাকে সহচরীত্ব দিয়াছেন, হিংসা নিরত স্বীয় চরণে বাণ বিদ্ধকারী জরা ব্যাধকে নিজ বৈকুণ্ঠ লোকে বান্ধবের ন্যায় পাঠাইয়াছেন, যিনি হিংসা ব্যভিচার বিকলাঙ্গ দোষ প্রভৃতি দেখেন না, কিন্তু চিরসুন্দর চির পবিত্র যিনি একবার মাত্র নিজকে প্রাণ ভরা দর্শনে স্মরণে সবকে সুন্দর ও পবিত্র করিতে সক্ষম, সেই সব গুণ-নিধান কৃষ্ণকে সকল জীব আশ্রয় কর। জীবের অন্তর এইভাবে

সদাই কৌতুক, আকাশ-পাতাল পর্য্যন্ত বদন ব্যাদানকারী ভুবন অশুভ কেশী দৈত্যের মুখ গহ্বরে যাঁহার হস্ত তপ্ত অয়সদণ্ড সদৃশ অসহনীয় ও তীরতুল্য অচল হইয়াছে, আবার ব্রজসুন্দরী-মণি শ্রীরাধার পুষ্পমালা সহযোগে বেণী গ্রন্থনকালে যাহার হস্ত সমীরণ-কম্পিত-কিশলয় তুল্য, সেই অদ্ভুত ক্রিয়াশীল সর্ব্বশক্তিমান রসিকশেখর করুণানিধি কৃষ্ণ জীবনে-মরণে আমার আশ্রয় হউন। যিনি স্বীয় চরণের রণিত মণি-মঞ্জীর দ্বারা কলনাদিনী কালিন্দীকে পাগলিনী করিয়া তাঁহার তরঙ্গ-করে নিজ চরণকে ধৌত করিয়াছেন, যাঁহার চরণকে নবযৌবনা গোপকামিনী কুঙ্কুম রঞ্জিত পয়োধরে লইবার সময় বেদনা লাগিবে বলিয়া কুণ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই রাতুল চরণ সর্ব্বাবতারী গোপীজনবল্লভ করুণানিধি কৃষ্ণ আমার জীবন মরণের বন্ধু হউন। যাহার সুমধুর কৃষ্ণ নাম সকল বেদনা দূর করিয়া মনকে হাসাইতে থাকেন, গোপনারীদের সঙ্গে কেলীকৌতুক করিতে যিনি সর্ব্বদা চঞ্চল, সেই নন্দগোপ পুত্র, তিনি ঈশ্বরই হউন অবতারই হউন বা কোন মানবই হউন, তিনিই আমার জীবন-মরণের সখা হইয়া শক্তি দান করুন। যাঁহার বাঁশী রাধানামসুধা উদ্গীরণ করে, যাহা শুনিয়া পাষাণ বিগলিত হয়, যাঁর লীলা গুণবাদ গীতাবলী প্রভৃতি পশুঘাতীরা শ্রবণাদিপূর্ব্বক আনন্দ পাইতে থাকে, শ্রীরাধার ললাট প্রদেশে তিলকরচনাকারী সেই গোবর্দ্ধনধারী যশোদাকুমার-শ্যামসুন্দর-রাধাদায়ত করুণানিধি কৃষ্ণ সর্ব্বদা আমার সঙ্গের সাথী হইয়া মনের ব্যথা নাশ করুন।

## পূর্ব্বার্দ্ধ শেষ

# উত্তরার্দ্ধ

## উত্তরার্দ্ধ প্রারম্ভ

যাঁহারা শয়ন, স্বপন, ভোজন, গমন, কর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ, এই সব সময়ে কৃষ্ণগত মন, কৃষ্ণ সুখের জন্য কার্য্যকারী, তাঁহারাই নিত্য সিদ্ধ ব্রজবাসী ভক্ত। জগতের মধ্যে যত শ্রেণীর ভক্ত আছে তন্মধ্যে ব্রজবাসী ভক্ত ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম আপনার জন। ইঁহাদের সুখ দেবার জন্য করুণানিধি কৃষ্ণও আকুল চিত্তে ঘুরিতে থাকেন। এই শ্রেণীর ভক্তের উল্লেখ করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত কহিতেছেন—

"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবত প্রধান উক্তঃ।"

সমূহ পাপবিনাশকারী ভগবান হরি যাঁহাদের অধীন হইয়া যাঁহাদের হৃদয়-মন্দিরে সদাই অবস্থান করেন, স্বপ্নেও ত্যাগ করিতে পারেন না, কেননা সেই ভক্তগণের ভালবাসা রূপ চন্দ্রহারের দ্বারা ভগবানের চরণকমল তাঁহারা বাঁধিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহারা তিরস্কারাদি করিলেও কৃষ্ণ তাঁহাদের ত্যাগ করিতে পারেন না। কেমন করিয়া যাইবেন। যদি কাহার চরণ রজ্জু দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহাকে 'দূর হও' বলিয়া তিরস্কার করা যায়, তবে সেই বন্ধনযুক্ত ব্যক্তি আর কতদূর যাইতে সক্ষম হয়? শেষে সেই ব্যক্তিকে বন্ধনকারী ব্যক্তির নিকট আসিয়া বিনয় করিতে হয়। এইরূপ ভালবাসার রজ্জু দ্বারা করুণানিধি কৃষ্ণকে যাঁহারা বাঁধিয়াছেন, তাঁরাই জগতে প্রধান ভক্ত। ব্রজসুন্দরীগণ এইরূপ শ্রেণীর উৎকৃষ্টতম প্রধান ভক্ত। ব্রজ কামিনীকুল-মণি নিত্য

কিশোরী শ্রীরাধা, নিখিল-মধুর-রস ভক্তের আদিগুরু যিনি, তিনি অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কৃষ্ণের গমনাদি শুনিয়া ও 'রাধে আমি চন্দ্রার কুঞ্জে ত যাই নাই' এই কথা বলিয়া আত্মগোপনকারী প্রভাত কালে সমীপাগত শ্যাম কান্তি করুণানিধিকে দেখিয়া কহিলেন—

"হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মাবদ কৈতব বাদম্।
তামনুসর সরসীরুহ লোচন যাতব হরতি বিষাদম্।

—ইতি গীতগোবিন্দম্।

হে মাধব! হে কেশব! হরি হরি! তুমি এত কপটতা জান! সারা রাত্রি তোমার অপেক্ষাতে বসিয়া আছি, নিদ্রা নাই, তোমার পথের দিকে চাহিয়া আছি, এখন আত্মসুখরত সারারাত্রি সুখে যাপন পূর্ব্বক প্রভাতকালে আসিয়া মিথ্যা কথায় আমাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিও না। আমি তোমার সব রহস্য বুঝিয়াছি! হে কমলনয়ন! আমার কাছে এলে কেন! সেইখানে যাও, যে সারারাত্রি তোমার মনের দুঃখ দূর করিয়া সুখ ঢালিয়া দিয়াছে। অথবা রসিক চণ্ডীদাসের ভাষায়—

"ভাল হৈলা আরে বঁধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে।"

অথবা—

"হে-দেহে পরাণ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আইস॥"

অথবা—

"না আইস না আইস বঁধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে"

এইরূপ বক্রোক্তি তিরস্কার ব্রজগোপী অনুগত মধুর ভক্ত করুণানিধি কৃষ্ণকে দিতে সমর্থ হয়। এইরূপ গালাগালিতে ভগবান রুষ্ট হইয়া চলিয়া যান না, অধিক ভাবে সেই ভক্তের প্রতি আসক্ত হইয়া দীনহীন কাঙালের মত সেই ভক্তের সঙ্গে মিলিতে চেষ্টা করেন। জগতকে শূন্যময় দেখিয়া সেই ভক্তের জন্য করুণানিধিও কাঁদিতে থাকেন। শ্রীপাদ জয় দেব গোস্বামীর ভাষায়—মানিনী শ্রীরাধার ক্রোধভাব "মোর প্রতি বিমুখতা।" ইহা স্মরণ পূর্ব্বক করুণানিধি কহিতেছেন—

"কিং ধনেন জনেন কিংবা কিং মম জীবিতেন।"

হায় হায় রাধা যদি মোর প্রতি বিমুখ হয়, তা হলে আমি বেঁচে থেকে বা কি করব ? ( নরলীলায় আবিষ্ট ভগবান ভক্ত ভিন্ন ভগবান থাকিতে পারেন না, আর থাকিলেও পূর্ণ গৌরবহীন ; এই জন্য রাধা রুষ্টা হইয়া থাকিলে আমার কৃষ্ণলীলাকে ধিক—আমি রাধার জন্যে যমুনার জলে ঝাঁপদিয়া প্রাণত্যাগ করিব—ইহাই জানাইতেছেন ) সংসারে আর অন্য জন বহু আছে, কিন্তু রাধার বিহনে সে সবের দ্বারা আমি কিছু সুখ পাইব না, ধনরত্নও রাধা বিহনে সারহীন। ইহার দ্বারা জানাই-তেছেন আমার ভক্ত হইয়া ধনরত্ন রাখিলে বা ভোগ করিলে সেই ধনরত্নের সারত্ব থাকে! আর ভক্তিহীনের কাছে ধনরত্ন অসার, অতি তুচ্ছ। আমার ভক্তের জন্য আমি ধনরত্ন নিজে ভোগকরি বা ভক্তকে ভোগ করায়ে সুখী হই ; সেই মধুর ভক্ত-শিরোমণি শ্রীরাধা যদি মোর প্রতি বিমুখ, তবে ধনরত্ন বা কি হইবে, কাঙাল সাজিয়া আমার মরণও ভাল। এদিকে মধুর রস ভক্ত ভগবানের সহিত বিবাদ করিয়া আকুল মনে কাঁদিতেছেন—

"আঁধল প্রেম পহিলে না হেরিনু, সো বহু বল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সনে অহনিশি জলত পরাণ॥"

হায় হায় আমার একি হল! আমি সেই কৃষ্ণকে বহুবল্লভ জানিয়া আগে যদি তাঁর সঙ্গে ভালবাসা না করিতাম, তা হলে এ দুঃখ আমার ভোগ কর্ত্তে হত না, প্রেমে অন্ধ হয়ে অর্দ্ধেক হৃদয় আসনে তাঁকে বসায়ে আমি কি উপায় করি। প্রিয়কে ত্যাগ কর্ত্তে পারছি না, ত্যাগ করেও সুখের মুখ দেখছি না! সেই সখা আমার একার ব'লে, আমি তিরস্কার করলে তিনি এইখানে থাকবেন মনে করে কত তিরস্কার করেছি, সেই জন্য ক্রোধ করে চলে গেল। কই আর ত এলো না! আমি সেই নীলকান্তি মধুর হাসিকে না দেখে জগৎকে যে অন্ধকার দেখিতেছি। প্রাণবন্ধু বোধ হয় ফিরে আসবে না। বহু আদর পাবার জন্য সখার সঙ্গে বিবাদ করে রাতদিন আমার জ্বলতে হল। তবে আমি কি করে এ দেহ রাখব! কৃষ্ণবন্ধুবিমুখ দেহ আমার তুষানল জ্বালার ন্যায় যন্ত্রণা ভোগ করছে। না, না, কৃষ্ণবন্ধুবিমুখ দেহকে আমি ত্যাগ করব, এই ভাবিয়া কহিতেছেন—

"সো মুখ চাঁদ হৃদয়ে ধরি পৈঠব, কালিদহ বিষ হ্রদ নীরে।
পামরী গোবিন্দদাস মরি যাওব সাজি আসিলা তছু তীরে॥"

এই আমার পরম সুখের পথ। প্রাণবন্ধুর বিচ্ছেদে বাঁচা কঠিন, অতএব সেই মনের মানুষের—সেই মুখচাঁদ মনের নেত্রে দেখিতে দেখিতে বিষময় কালিদহের জলে ঝাঁপ দিই। রসিকবর গোবিন্দদাস দাসী ভাবে শ্রীবৃষভানু নন্দিনীর কাছে শ্রীরাধার এই কথা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"হে রাধে! তুমি যদি মরো, তা' হলে রাধাহীন কৃষ্ণকে লইয়া বা আমরা কি করিব! তোমা ভিন্ন কৃষ্ণ মেঘসমাচ্ছন্ন অমানিশার তুল্য যে ভয়ঙ্কর। দেহ থাকিলে চৈতন্য-ময়ী ভাষা সবকে সুখ দিতে সমর্থ; দেহ না থাকিলে, সে ভাষা থাকে না। দেহরূপী তোমাতে, কৃষ্ণই প্রাণ স্বরূপ। অতএব তুমি

না থাকিলে কৃষ্ণও থাকিবে না। সুতরাং তোমা বিহনে আমরা কি সুখে আর বাঁচিব। আমরাও তোমার সঙ্গে সঙ্গে মরিব।" সখিগণ শ্রীরাধার এইভাব দেখিয়া—মধুররস ভক্তের চিরদিন জয় রাধার পদে কৃষ্ণ বাঁধা ইহা জ্ঞাপন করতঃ 'হে নিখিল বন্দিনী রাধে, কৃষ্ণ তোর অধীন' এই ভাবে কহিলেন। মধুর রসিক ভক্ত উল্লাসভরে শ্রীরাধার চরণে করুণানিধিকে লোটাইতে দেখিব ভাবিয়া গাহিলেন:—

"মান কয়লি ত কয়লি, বিরহে কাহে রোদসি বৈঠিরহো নিজ ভবনে।
সো কাঁহা যাওব আপহি আওব পুনহি লোটাওব চরণে॥"

হে কৃষ্ণ মনমোহিনী! তুমিত ভুবনমোহন কৃষ্ণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। কৃষ্ণ বিরহে তুমি কাঁদ কেন? তোমার চরণে কৃষ্ণ আসিয়া লোটাইবে। নিজ কুঞ্জ ভবনে তুমি বসিয়া থাক, এল বলে আর কি। কৃষ্ণ আসিল, রাধাকে ত্যাগ করিয়া কতক্ষণ আর থাকিতে পারেন। অমনি মধুর রস ভক্ত গাহিলেন। সর্ব্বারাধ্যা শ্রীরাধার কাছে কৃষ্ণ অপরাধীর ন্যায় গাহিতেছেন—

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি, দন্তরুচি কৌমুদী
হরতিদর তিমির মতি ঘোরং।"

অথবা—

"ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং
ত্বমসি মন ভবজলধি রত্নং॥"

অথবা—

"ভণ মসৃণবাণী, করবাণি চরণ দ্বয়ং
সরসলসদলক্তক রাগং।"

হে রাধে! তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদি দাস জ্ঞান করিয়া কিছুমাত্র বল তাহা হইলে, বাক্য কথনকালীন চন্দ্রসদৃশ দন্তের

ছটাতে—তুমি আমার উপর মানিনী, বিমুখ হইয়াছ, এই কারণ যে ভয়রূপ অন্ধকার তাহা নাশ হইবে। হে রাধে তুমিই ত আমার প্রাণ, তুমিই ত আমার গহনা স্বরূপ, এই ভব-সমুদ্রে তুমিই ত আমার রত্ন। হে প্রিয়তমে! একটু মাত্র মধুর কথা যদি বল, তাহলে তোমার শ্রীপদে সুন্দর সরস আলতা পরায়ে দিই। মধুর রসিক ভক্তচূড়ামণি শ্রীপাদ জয়দেব গোস্বামীর উল্লাস আরও অধিক বাড়িল; সর্ব্বারাধ্যার চরণ সর্ব্বারাধ্যের মস্তকের উপর না দিলে তাঁর যেন আশা কত বাকী থাকে; শ্রীরাধার চরণের গৌরব বেশী, এ চরণকে মাথার উপর না ধরিলে আর শান্তি নাই জানিয়া কহিলেন—

"স্মর গরল খণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ পল্লব মুদারম্।"

হে রাধে! সর্ব্ব কামনার অবসান হয় এমন যে তোমার রাঙা চরণ, তাহা নবোদ্গত পল্লবের ন্যায় মনোহর; কাম-বিষজ্বালা নাশকারী সেই রাঙা চরণ, মস্তকের ভূষণ স্বরূপ মোহন চূড়ার তুল্য আমার মাথার উপরে দাও। প্রেমময়ী মানিনীর মান এইবার ভাঙিল। "আহা! এমন গুণনিধি যে আমার চরণ মাথার উপর লইবার জন্য আকুল মনে কাঁদিতেছে!" সাশ্রুনয়নে হৃদয়নিধিকে হৃদয়ে লইলেন। সারা নিকুঞ্জ আনন্দ জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! স্বামী স্বামিনীর এই শুভ সম্মিলন জনিত সুখ অনুভব করিয়া মধুর রসিক ভক্ত গাহিলেন—

"কোকিল ভ্রমর করে পঞ্চস্বর
বঁধুয়া পেয়েছি কোলে।
হিয়ার মাঝারে রাখিব পিয়ারে
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে॥"

এই রাধাকৃষ্ণ একই বস্তু! জগতে মধুর লীলা সম্পাদন জন্য সেই একই বস্তু দুই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সেই কারণ গোপাল সহস্র নাম স্তোত্রে বেদব্যাস কহিতেছেন—তস্মাজ্জ্যোতিরভূদ্দ্বিধা রাধামাধবরূপকম্— অর্থাৎ সেই এক ব্রহ্ম-জ্যোতি আপন ইচ্ছায় লীলা সম্পাদন জন্য মিথুন ধর্ম্ম মানবের সুচারু রূপে ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য, রাধা ও কৃষ্ণ দুই রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ এই জগতে শ্রীরাধাই একমাত্র কৃষ্ণের আশ্রয়। শ্রীরাধাকে আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণের আনন্দময় সংসার লীলা। এই কারণ রসিকপ্রবর শ্রীপাদ জয়দেব গোস্বামী "কংসারিরপি সংসার বাসনাবদ্ধ শৃঙ্খলাম্" এই শ্লোকে শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের সংসার বাসনার শিকলরূপিনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন অথবা সম্যক প্রকারে রাসরস-লীলাসম্পাদন জন্য শৃঙ্খলরূপিনী শ্রীরাধা এইরূপ কহিয়াছেন। অতএব শ্রীরাধা আধার, কৃষ্ণ আধেয় স্বরূপ হইয়াছে। পুষ্করিণী কুম্ভে যেমন জল থাকে সেইরূপ সেই রাধার মধ্যে কৃষ্ণকে আমরা দেখিতে পাইব। রাধার নিকট যে কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণ মানবের উপভোগ্য স্বরূপ সুখদাতা বলিয়া জানিব। জলধরের নীর-ধারা সর্ব্বত্র পতিত হইলেও পুষ্করিণী কুম্ভের মধ্যে যাহা সঞ্চিত তাহাই আমাদের তৃষ্ণা ও গাত্রদাহ নিবারক। কেহ বলিতে পারিবে না যে "মেঘের জলে আমি পিপাসা নাশ করি বা স্নান করি।" সকলেই বলিবে "পুষ্করিণী, কূপ বা নদীর জলে স্নান করি, এবং কলসীর জল পান করি।" সেইরূপ ত্রিতাপজ্বালা দহ্যমান জীব আমরা শান্তি পাবার আশায় রাধা-আশ্রয়ে আশ্রিত কৃষ্ণকে আশ্রয় করি। এই সব বিচারের দ্বারা যেমন জলকে ধরিবার জন্য পুষ্করিণী বা কলসীর অগ্রেই প্রয়োজন হয়, সেইরূপ কৃষ্ণকে পাইবার জন্য শ্রীরাধাকে অগ্রেই আশ্রয় করিতে হয়। কৃষ্ণকে পূর্ণরূপে ধরিতে পারে ত শ্রীরাধাই একমাত্র তাহাতে অধিকারিণী। এই রাধার কাছে কৃষ্ণ সর্ব্বদাই বাঁধা আছে।

এই কারণ কৃষ্ণপ্রেম গুরু স্বরূপিনী এই রাধানাম কৃষ্ণনামের অগ্রেই ঋষিগণ উচ্চারণ করেন। রাধানাম না করিয়া কেবল মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে মহা নরকগামী হইতে হয়—ইহা পুরাণাদিতে কথিত আছে। রাধা ভিন্ন কৃষ্ণকেও জীব উপভোগ্য রূপে পায় না। পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিলে যেমন তাহাতে জল স্বাভাবিক সঞ্চিত হয়, সেইরূপ রাধাকে ধরিলে কৃষ্ণ স্বাভাবিক ধৃত হইবে, কোন কষ্ট করিতে হইবে না। হে জীব! কৃষ্ণকরুণানিধিকে পাইতে হইলে কৃষ্ণপ্রেমের গুরু স্বরূপা শ্রীরাধার চরণে মনপ্রাণ বিক্রয় করো। করুণাময়ী কৃষ্ণ-প্রেমরূপিণী শ্রীরাধা ভিন্ন আমাদের আর কোনও গতি নাই। পরমানন্দময়ী রাধানাম শ্রবণে কাহার মনে না আনন্দের সঞ্চার হয়! সুখ ভরা রাধানাম উচ্চারণ করিলে অখিল সংসার পরম সুখকে প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যময়ী পরমোজ্জ্বলা স্মৃতি লীলাদেবী দর্শন পূর্ব্বক হাসিতে থাকে, রসিক ভাবুকের অশ্রুপাত হয়, কৃষ্ণ আকুল মনে তত্র আগমন করেন, সংসারের অখিল পাপতিমির নাশ এবং বৃন্দাবন বিলাসিনী শ্রীরাধার চরণকমলে মধুপ হইবার চিরবাসনা জাগরিত হইতে থাকে। রাধা নামে এতই সুখ বলিয়া কৃষ্ণ বাঁশীতেই এই নাম সদাই গাহিতে থাকেন। কত দেবী সংসারে আছে, তাহাদের নাম করিলে একটু, আধটু কি সুখ আসে তা জানি না। কিন্তু প্রেমময়ী রাধানাম করিলে সেই পিপাসিত হারাসুখকে পূর্ণমাত্রায় জীবকুল যে প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

ঋগ্বেদের পরিশিষ্টে লেখা আছে—

"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।"

অর্থাৎ রাধাকে আশ্রয় করিয়া মাধবকে উপাসনা করিবে, এবং মাধবকে আশ্রয় করিয়া রাধাকে উপাসনা করিবে—তবে ঈশ্বরের পূর্ণ

প্রাপ্তি সুখ সংঘটিত হইবে। এই কারণ ভক্তকুল কখনও রাধা ভাবে কৃষ্ণের জন্য কাঁদিতেছেন, কখনও বা কৃষ্ণভাবে রাধার জন্য কাঁদিতেছেন। ভুবনমোহন সুখদাতা সেই করুণানিধি কৃষ্ণের সর্ব্বশান্তিকর বংশীধ্বনি শুনিয়া মধুর ভক্ত শ্রীরাধা ভাবে কাঁদিতেছেন—

"কালার লাগিয়া হম হব বনবাসীরে!
কালা নিল জাতিকুল আমার প্রাণ নিল বাঁশীরে ॥"

ওই যে নির্জ্জন কাননের ভিতর নির্জ্জন বিলাসী ভুবনমোহন একটি পুরুষ আছেন, তাঁর শ্যামসুন্দর কান্তিতে নয়ন-মনের শান্তি আসে। আহা, তাঁর বাঁশীর গানও এত সুন্দর যে সেই নির্জ্জনে নয়ন মুদিয়া সর্ব্বজ্বালাহর সেই বেণু গীত শুনিতে ইচ্ছা হয়। আহা তিনি সর্ব্বাভিমান শূন্য, সমভাবে সকলকে গান শুনাইতেছেন। এই কাল পুরুষের জন্য আমি বনবাসী হইব। ওই নির্জ্জনের কাল রঙের পুরুষটি আমার জাতিকুল লইয়াছে; তাঁর মোহন বাঁশীও আমার প্রাণকে আকর্ষণ করিয়াছে। ব্রজকিশোরী ভাবধারী গৌরসুন্দরও কাঁদিলেন—

'কাঁহা গোপবেশ কাঁহা নির্জ্জন কানন।"—ইত্যাদি।

কোথায় গেল! সেই নির্জ্জন কাননবিহারী গোপবেশধারী মোহন পুরুষ কোথায়! সেই পুরুষ কোথায়! আর সেই পুরুষের বিহারস্থল নির্জ্জন বৃন্দাবন বা কোথায়! সেই পুরুষ ভিন্ন সর্ব্ব জগৎ বিষাদ হিংসার কালিমাতে মলিন! নৈশ-তিমিরে উল্লসিত শৃগালনিনাদের ন্যায় সারা জগৎ স্বার্থপর হিংসাপরায়ণ মানব কোলাহলে পূর্ণ! সর্ব্বাভিমানশূন্য গোপবেশধারী কৃষ্ণের সেই সমতা স্থাপনকারী বাঁশীর রব ভিন্ন এ জগতে কি দেখিয়া, কি শুনিয়া, সুখ-পিয়াসী মনকে সুখী

করিব। মধুর রসিক ভাবিতে ভাবিতে অধিক আকুল মনে আবার কাঁদিয়া উঠিল—

"ক্ব রাসরসতাণ্ডবী! ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমা!
ক্ব মন্দ্র মুরলী রব! ক্ব শিখি চন্দ্রিকালঙ্কৃতি!"

সেই রাস-রসের তাণ্ডব নৃত্যকারী রাসবিহারী কৃষ্ণ কোথায়! কেউ ত তাঁর জন্য ভাবিতেছে না! সারা সংসার নশ্বর মাটীর পুতুলের মত কতকগুলি বস্তু নিয়ে বিকারী রোগীর হাসি-কান্নার ন্যায় হাসি-কান্নাতে মগ্ন আছে বলিয়া সেই নিত্য কিশোর সুখদাতা কৃষ্ণ দূরে কি চলে গেল! সেই নন্দকুলচন্দ্রমার—সেই ময়ূর পাখার মোহনচূড়াধারীর মধুর বংশীধ্বনি না শুনে এ বিষময় দুঃখ পূর্ণ জগতে কি লইয়া সুখী হইব; মধুর রসিক ব্রজকামিনীর ভাবে আবার কাঁদিতে লাগিলেন—

"উঠি বসি আর কত পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি॥
কত দূরে পিয়া মোর করে পরবাস।
সংবাদ লই চলু বলরাম দাস॥"

এমন সুন্দর সুখদ রাত্রি! এমন মোহিনী চাঁদিনী রাতি! কিন্তু সুখদাতা কৃষ্ণ ভিন্ন এই রাত্রি ভীষণা দুঃখদায়িনী হইয়াছে। যদি সেই প্রাণবন্ধুকে বক্ষে পেতাম, তাহলে সুখে নিদ্রা যেতাম; বিষয়বাসনারূপ বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় ছটফট করিয়া মরিতেছি! প্রাণবন্ধু কৃষ্ণ বিচ্ছেদে এ রাত্রি উঠিয়া বসিয়া কি করিয়া কাটাইব! নারী জাতির প্রাণ কি এতই কঠিন! কেন বা দেহ ত্যাগ করে চলে যায় না! সুখ-পিপাসী নারীর জন্মকেও ধিক! আমার পিয়া প্রাণবঁধু কত দূর

বিদেশে অবস্থান করিতেছেন! দাসীরূপে নিকটে অবস্থিত বলরাম দাস শ্রীরাধিকার এই রোদন শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—হে রাধে, তুমি আর রোদন করিও না; কৃষ্ণ যতদূরে থাকুক না কেন, তোমার এ বিরহ সংবাদ লইয়া আমি সেইখানেই যাইব। তাঁকে নিশ্চয় আনয়ন করিব। কৃষ্ণ ভিন্ন কোকিল-তান-মুখরিত কুসুমকুলমণ্ডিত মধুর মলয় প্রবহমান সুখময় বসন্তের সুখ বিষাদপূর্ণ ভাবিয়া মধুর রসিক আবার কাঁদিতে লাগিলেন—

"পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা গো।
পিয়া বিনে মধু না খায় উড়ি বুলে তারা গো॥"

—ইত্যাদি।

কৃষ্ণ যদি আমার সম্মুখে থাকিত, তা' হলে এ দুঃখের সংসারেও সুখ পাইতাম; কিন্তু সেই বন্ধু বিহনে এই সুখের বসন্তকালে ভোমরা পর্য্যন্তও মধু পান না করিয়া মনের দুঃখে গুণ গুণ স্বরে রোদন পূর্ব্বক উড়িয়া বেড়াইতেছে। আহা প্রিয়তমের বিরচিত এই সুখের ফুলের বন প্রিয়তম বিহনে বিষাদ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আমার বক্ষে দুঃখের শেল মারিতেছে! আমার বন্ধু এমনই সুন্দর বটে! তাঁর জন্য সকল সংসার এইরূপ পাগলই হয়। তাঁর মোহন রূপ দেখবার জন্য সকলেই এইরূপ আকুল হয়। এমন গুণনিধিকে আমি কেমন করিয়া ভুলিব! আমার প্রাণবন্ধুর জন্য ওই সৌরভ-সম্পদময় মালতী-মাধবী-কুঞ্জ-কোকিল কুজনচ্ছলে বসন্তকালে বিদেশী স্বামীর জন্য পথের দিকে চেয়ে চেয়ে বিরহিনী কামিনীকুলের ন্যায় বিলাপ গান গাহিতেছে। অশোক কিংশুক অধিক লাল বর্ণের মূর্ত্তিতে পতি বিহনে পাগলিনী যুবতীকুলের রক্তবর্ণ চক্ষুর ন্যায় আমার

মনে দুঃখ আনয়ন করিতেছে। মলয় পবন বন্ধু হীনা বিরহিনী নারীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের ন্যায় মনকে কাঁদাইতেছে। বিকশিত সৌরভে জন-মন-মোহনকারী আম্রমুকুল বকুল প্রভৃতি প্রাণনাথ বিহনে আকুল মনে ধরাতলে পতিত হইতেছে। নবোদ্গত পত্রাবলী প্রাণসখার সঙ্গসুখ স্মরণ পূর্ব্বক দুঃখে পুলকে কাঁপিতেছে। তরুলতা মধুধারা বর্ষণচ্ছলে, সরোবর হংসরবচ্ছলে, নদী তরঙ্গকর বক্ষে আঘাত পূর্ব্বক প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে দেয় পুষ্পাবলী বক্ষে বিষাদ গামিনী হইয়া কল্লোল তানে এবং নীলাকাশ মেঘবসনে দেহ আবরণ করতঃ প্রাণসখার জন্য শিশির পাত-চ্ছলে কাঁদিতেছে। লতা-গুল্ম সমাকীর্ণ গিরিবর বনস্পতিকুল উন্নত-শিরে প্রিয়তমের আগমন পথ পানে যেন আকুল মনে আগমন আকাঙ্ক্ষায় চিন্তাতুরের ন্যায় বসিয়া আছে। সখার জন্য অবনত শীর্ষ বেণু-বৃক্ষকুল ধরাতলে মস্তক লুণ্ঠন পূর্ব্বক বিযাদ সাগরে মগ্ন রহিয়াছে। ধরণী প্রাণসখার জন্য শ্যামল প্রান্তর রূপ আঁচল পাতিয়া রাখিয়াছে, এবং বন্ধু আসে নাই বলিয়া জীব কোলাহলচ্ছলে পাগলিনীর ন্যায় প্রলাপ করিতেছে। হা বন্ধু! হা প্রাণ বল্লভ! হা সখে! তোমা বিহনে সকল সংসার দুঃখ-সাগরে মজ্জমান। একবার দেখা দিয়ে, একবার ওই মন-মোহন রূপ দেখায়ে সকলকে দুঃখ-সাগর হতে পার কর। ওই গোষ্ঠ মধ্যে গোবৎসকুল হাম্বারবে আকুল প্রাণে তোমাকেই ডাকিতেছে। দূরে গাভীবৃন্দ ব্রজমধ্যে তৃণ ভোজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক হুঙ্কার করিয়া তোমারই জন্য সমবেদনা প্রকাশ ও মধ্যে মধ্যে তোমার আশাপথ দিকে যেন আকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। দলবদ্ধ বিহঙ্গকুল কিচিমিচি রবে তোমার বিচ্ছেদ বার্ত্তা কহিতে কহিতে আকাশমার্গে, উড্ডীন হইয়া এই দিকে তোমার গতি লক্ষ্য করিতেছে, এবং তাহা না দেখিয়া যেন নামিয়া পাদপ-কুঞ্জ-শিরে উপবেশন পূর্ব্বক

হা-হুতাশের তান তুলিতেছে। পুরুষ সিংহ! তোমার জন্য মৃগেন্দ্র বুঝি ওই উচ্চ হাহাকার চীৎকার এবং মৃগ-বধূগণ উদাস দৃষ্টিতে যূথে যূথে বুঝি তোমারই অন্বেষণ করিতেছে। হায় সখা! জগৎ পাগল করা ওই রূপ-গুণ নিয়ে দয়ালু হয়ে নিষ্ঠুরের তুল্য এসব ফেলে কোথায় রয়েছ! এস আমার আশা-সাগরের পরশমাণিক! তোমায় দেখে সর্ব্ব জ্বালা দূর করি। এইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মিলন যখন মধুর ভক্তের নয়ন পথে পতিত হয়, তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া তিনি গাহিতে থাকেন ঃ—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

—বিদ্যাপতি।

রাধ-গোবিন্দের এই মধুর সম্মিলন দর্শনে ভক্তের সর্ব্ব বাসনা পূর্ণ হয়। তাঁর আনন্দের সীমা থাকে না; তিনি আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া পূর্ণ মানবত্বকে পান এবং সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিতে থাকেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি ভক্তিভাবের মধ্যে মধুর ভক্তি ভাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কেননা শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই চারি ভাব, এবং নিজের যে জগৎপতির সঙ্গে স্বামী ভাবে ভালবাসা এই পাঁচটিই মধুর ভাবে বিদ্যমান। যাঁহারা বিশ্বব্যাপী ভগবানের অস্তিত্ব সন্দর্শন পূর্ব্বক তাহা ধ্যান করতঃ হিংসাদ্বেষাদি বর্জ্জন করিয়া সদানন্দে অবস্থান করেন, তাঁহারাই শান্ত ভাবের ভক্ত। নব যোগীন্দ্র এই শ্রেণীর উৎকৃষ্টতম ভক্ত। ভগবানকে সন্দর্শন পূর্ব্বক সদাই কায়মনোবাক্যে তাঁর চরণ সেবন পূজন প্রভৃতি দাস্য ভাবের ভক্তের কর্ত্তব্য। শ্রীমান্ হনুমান, ব্রজের ভিতর রক্তক প্রভৃতি কৃষ্ণ বলরামের

দাস ভাবে সেবাকারী এই শ্রেণীর উৎকৃষ্টতম ভক্ত। ঈশ্বর আমাদের সখা—এই জ্ঞানে শয়নে-স্বপনে-ভোজনে-গমনে-সুখে তিনিও আমাদের সমান ভাগী, কিন্তু দুঃখে নয়; দুঃখ পাই আমরা পাইব, কিন্তু সখাকে দুঃখ দিব না, প্রাণ দিয়া সখাকে যদি সুখী করিতে হয় তাহাও করিব—এই-রূপে ভগবানের সঙ্গে যে ভালবাসা, ইহাই সখ্য ভাবের ভক্তের কর্ত্তব্য। ব্রজের শ্রীদাম-সুবল প্রভৃতি গোপবালকগণ এই শ্রেণীর উৎকৃষ্টতম ভক্ত। এই শ্রেণীর উচ্ছিষ্ট ভগবান আনন্দ মনে খাইতে থাকেন; কেননা তাঁহারা ভগবানকে প্রাণের তুল্য ভালবাসেন বলিয়া নিজের জ্ঞানে তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট দেন। কেহ যদি কোন বস্তুর স্বাদ বুঝিবার জন্য নিজের হাতে করিয়া সেই বস্তুটি চাখিয়া তাহা সুস্বাদু বলিয়া খাইতে থাকে, তবে তাহাতে উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেছে এই দোষ যেমন আসে না, সেইরূপ কৃষ্ণের সঙ্গে প্রাণের তুল্য সম্বন্ধ স্থাপনকারী গোপবালকদের উচ্ছিষ্ট দান জনিত দোষ স্বপ্নেও মনমধ্যে উদয় হইত না। তাঁহারা অগ্রেই বনফল তিতো কি মিঠা চাখিয়া দেখিয়া তাহা সুস্বাদু হইলে কৃষ্ণকে দিতেন; অন্তর্যামী ভগবান তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিয়া আনন্দ মনে তাহা খাইতেন। মায়ামুগ্ধ মানব, তুমি সুখের সময় ভগবানকে ভুলেও বোধ হয় একবার ডাক না; কিন্তু দুঃখের সময় "বিপত্তির মধুসূদন! হা ভগবান! রক্ষা কর" বলিয়া দুঃখের বোঝা ভগবানের ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা কর; কিন্তু ব্রজের এই গোয়ালার ছেলেদের ভগবানের সঙ্গে কেমন ভালবাসা একবার নয়ন ভরিয়া দেখ। কালীদহের বিষ জল দেখিয়া রাখাল বালকগণ ভাবিলেন—আমরা তৃষ্ণার্ত্ত, প্রাণসখা কৃষ্ণও তৃষ্ণার্ত্ত। কিন্তু এই বিষ জল প্রাণসখাকে কেমন করিয়া দিব! আমরা অগ্রে ইহা পান করিয়া দেখি, যদি আমাদের উপর বিষক্রিয়া না হয়, আনন্দ পাই, তবে সখাকে এই জল

পান করাইব। ইহা পান করিয়া আমরা যদি মরি, তাহা মঙ্গলের বিষয়; সখার চাঁদবদন দেখিতে দেখিতে যে মৃত্যু তাহা অতীব সুখ দায়ক! আর গর্গাচার্য্যের কোষ্ঠী গণনাতে জানা যায় যে প্রাণসখা কৃষ্ণ সমস্ত ব্রজবাসীগণের বিপত্তিনাশক। অতএব বিষ জল পানে মৃত্যু হইলে আমাদিগকে বাঁচাইবার শক্তি একমাত্র সখা কৃষ্ণ ভিন্ন আর কারও নাই। আমরা মরিলে সখা বাঁচাইতে পারে, কিন্তু সখা মরিলে আমরা ত বাঁচাইতে পারিব না। আমরা মরিলে আমাদের মত সখা কৃষ্ণের অনেক মিলিবে; কেননা কৃষ্ণ যে সর্ব্ব গুণের সর্ব্ব শক্তির আধার; কিন্তু কৃষ্ণ মরিলে কৃষ্ণের মত সখা আমরা বা কোথায় পাব! কৃষ্ণের তুলনা একই কৃষ্ণ। আমাদের মত জগতে বহু আছে, কিন্তু কৃষ্ণের মত জগতে একাই কৃষ্ণ। আর বিষজল পান করাইলে সখা যদি ক্রোধ পূর্ব্বক 'আমাকে বিষজল দিল' এই মনে করিয়া আমাদিগকে ত্যাগ করে যায়, তাহা হইলে কৃষ্ণ শূন্য এই ব্রজ বৃন্দাবনে কাকে লইয়া সাধের খেলা খেলিব! প্রাণ থাকিতে অজ্ঞাত-তত্ত্ব বিষজল প্রাণসখাকে খাইতে দিব না, বা খাইতে দেখিতে পারিব না; দুঃখ ভোগ করিতে হয়ত আমরাই ভোগ করি। এই ভাবিয়া মায়ামুগ্ধ মূর্খ জীবের মত কৃষ্ণের উপর দুঃখের বোঝা না চাপাইয়া সেই বন্য আহীর বালকগণ দুঃখের বোঝা নিজেরাই মাথায় করিলেন। কৃষ্ণের বদনচন্দ্রমা দেখিতে দেখিতে গোবৎস সহিত বিষজল পান পূর্ব্বক স্বপ্নদৃশ্য তুল্য প্রাণ ত্যাগ করিলেন। করুণানিধি কৃষ্ণ তাহা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন; এবং 'আমার জন্যে যারা মরেন সেই মরণ তাঁদের বাঁচার তুল্য হয়' বলিয়া অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টির দ্বারা তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়া দিলেন। হে জীব, ব্রজগোপবালকের ন্যায় ভক্তি ভাবে এমন সর্ব্বসুখদাতা করুণানিধি কৃষ্ণকে সখা বলিয়া ডাকিলে না ত

তোমার সুখের পথ আর কোথায় ? এই রাখাল বালকগণের উচ্ছিষ্ট খাইতে দেখিয়া লোকসৃষ্টি রত অভিমানী ব্রহ্মারও ভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। এই কারণ কৃষ্ণ কেমন ভগবান তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য গোবৎস সহিত রাখাল বালকগণকে তিনি হরণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে নিজেই গোবৎস ও রাখালবালক মূর্ত্তি ধারণ করতঃ 'তোর মত অনন্ত কোটী ব্রহ্মা আমার এবং আমার ব্রজ ভাব ধারী ভক্তগণের দাস' ইহা জানাইয়া ব্রহ্মার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছিলেন। হতগর্ব্ব ব্রহ্মা শেষে সজল নয়নে করযোড়ে এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"এষাং তু ভাগ্য মহিমাহচ্যুত তাবদাস্তামেকাদশৈব হি,—
বয়ং বত ভূরি ভাগাঃ।
এতদ্ধৃষিক চষকৈ রসকৃৎপিবামঃ
শর্বাদয়োংঙ্ঘ্যদজমধ্বমৃতাসবং তে ॥
তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেহপি কতমাং ঙ্ঘ্রিরজোভিষেকম্।
যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান
মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি যৎ পদরজঃ শ্রুতি মৃগ্যমেব ॥"

হে অচ্যুত! হে করুণানিধে! এই ব্রজবাসীগণ ও রাখালবালকগণ পরম সৌভাগ্যের শেষ সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। কেননা আমাদের তুল্য প্রচুর ভাগ্যশালী আমি শিব, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ একাদশেন্দ্রিয় রূপ পান পাত্রের দ্বারা তোমার মত্ততা জনক চরণোদকরূপ মধু একবার মাত্র নয় বহুবার পান করিয়া যাহা অমৃত ও আসবতুল্য আমাদের মঙ্গলানয়নকারী হইয়াছে, এমন যে তুমি সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দ যাহাদের শয়নে-স্বপনে জাগরণে খেলার সঙ্গী, আনন্দ দায়ক ও

উচ্ছিষ্টভোজী প্রভৃতি হইয়াছ; সুতরাং কেমন করিয়া তাঁহাদের মহিমা কহিব! অতএব হে মুকুন্দ! এই জগতে গোকুল বৃন্দাবনে তোমার এবং তোমার প্রিয়জনের চরণচিহ্ন ভূষিত স্থানে যদি স্থাবর জঙ্গম কোন শ্রেণীর জীবরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার প্রচুর ভাগ্যোদয় হইবে। কেননা এই ভাবে জন্ম গ্রহণ করিলে যাহাতে নিখিল সংসার জীবিত থাকে, এমন যে তোমার চরণরজ তাহা পাইতে পারিব। যে হেতু বেদ যজ্ঞাদি দ্বারা তোমার চরণরজকে পাবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, এখনও পায় নাই, সেই সর্ব্বজ্বালাহর চরণরজ ব্রজভূমিতে তোমার প্রিয় ভক্তজন সমীপে সর্ব্বদাই বিদ্যমান! কেননা ভক্তের সমীপে তোমার পূর্ণরূপে অবস্থিতি। পুত্রভাবে ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক দিবানিশি কায়মনো-বাক্যে তাঁহার ভরণ-পোষণ-মঙ্গল চেষ্টা করিলে বাৎসল্য ভাবের ভক্ত কহা হয়। মা যশোদা, নন্দ বাবা প্রভৃতি এই শ্রেণীর উৎকৃষ্টতম ভক্ত। এই শ্রেণীর ভক্তের কাছে নিখিলস্বামী ভগবান মানবের সমীপে মানব শিশুতুল্য অপরিণামদর্শী, অজ্ঞান, চঞ্চল ও ভীতভাবে অবস্থান করিতে থাকেন। দধিভাণ্ড ভঙ্গকারী, নিখিল ভবভয়হারী, যাঁর নামে সমুদয় ভয় দূর হইয়া যায়, সেই ভগবান কৃষ্ণ মা যশোদার হস্তে ধৃত হইয়া কেমন ভীতিভাব অবলম্বন করিয়াছেন! শ্রীমদ্ভাগবত সে সম্বন্ধে কহিতেছেন—

"কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী
কর্ষন্তমঞ্জনমষিণী স্ব পাণিনা।
উদ্বীক্ষ্যমানং ভয়বিহ্বলেক্ষণং
হস্তে গৃহীত্বা ভিষয়ন্ত্য বাগুরৎ॥"

দধিভাণ্ড ভঙ্গ ও নবনীত দধি অপচয়কারী পুত্র কৃষ্ণকে মা যশোদা

হস্ত দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক ভয় দেখাইতেছেন।—কৃষ্ণরে, তোকে আজ আমি খুব প্রহার করিব ; কেননা আমি দেখিতেছি দিন দিন তোর দুষ্ট বুদ্ধি বাড়িয়া উঠিতেছে, এখন যদি না তোকে শাসন করি তা'হলে তুই ভবিষ্যতে ব্রজরাজের কলঙ্ক স্বরূপ হবি। গুণবান পুত্রের গুণে মা-বাপের যশ হয় ; এই কারণ প্রহারাদি শাসনদ্বারা তোকে আমি গুণী করিতে চেষ্টা করিব। আমার ঘরের যাবতীয় মাখন-মিশ্রি-দধি-দুগ্ধ সব ত তোর। তোর একার খাবার জন্য আমি দাসীগণের দ্বারা নয় স্বহস্তে এই সব প্রস্তুত করিয়াছি ও করিতেছি ; তুই সেই সব জিনিষ নষ্ট করিস কার আজ্ঞায় ! নিজে খাবি তাই নয় খা ; কিন্তু বনের বানর-গুলো তোর কে বল দেখি ! কবাট খুলে সকল বানর ডেকে এনে তাদিগকে দধি-দুগ্ধ-ননী বেটে দিলি ? কেন বানরগুলো তোর বন্ধু নাকি ! তাই নয় হক ! জগতের সকল জীব তোর নয় বন্ধু হক। আমার তাতে কি ? আমার জগতে বন্ধু-বান্ধব কেউ নাই। আমার একা আছিস তুই পুত্র কৃষ্ণ। আমি সারাদিন তোর জন্য পরিশ্রম করে বস্তু সংগ্রহ করছি ; আর তুই সেই সব জিনিষের দ্বারা বন্ধুসেবা কর্ত্তে আরম্ভ করেছিস ! আমার জিনিযে তোর খাওয়া পরার অধিকার ; কারও অযথাভাবে দেবার অধিকার নাই। যখন বড় হবি, নিজে উপায় কর্ত্তে পারবি, তখন বন্ধুসেবা করবি। এখন বানর-বন্ধু তোকে আজ আমি বেঁধে প্রহার দেব। জগৎপতি কৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া কপটভাবে নয় প্রকৃতভাবে মাতৃ বাৎসল্যে প্রাকৃত বালকের ন্যায়, ভয়যুক্ত নেত্রে দরদর অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। হাতের দ্বারা চক্ষু কচলাইতে কচলাইতে চোখের কাজল ধুইতে লাগিলেন। ভবভয়হারী পুত্ররূপী ভগবান কৃষ্ণকে প্রহার ভয়ে অত্যন্ত ভীত দেখিয়া বাৎসল্যরস-প্রতিমা মা যশোদা যে দণ্ডের দ্বারা কৃষ্ণকে প্রহার করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতে-

ছিলেন, তাহা ত্যাগ করিলেন এবং 'নিজের অভিলষিত স্থানে রাখিব, গৃহ কর্ম্মাদি করিতে করিতে কৃষ্ণের চাঁদবদন দেখিব, ননী খাওয়াইব, চোখের কাছ থেকে কোথাও যাইতে দেব না' এই ভাবিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিলেন। যাঁহার নামে ভববন্ধন দূর হয়, সেই নিত্যমুক্ত সর্ব্ববন্ধনমোচনকারী অসীম বিশ্বপতি সসীম হইয়া 'মা যশোদার অথবা ব্রজবাসীর ভাবধারী ভক্তের বন্ধন আমি সাদরে গ্রহণ করি' এই ভাবে বন্ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আহা ভক্তবৎসল ভগবানের অপার করুণা এই ভাবেই ভক্তের প্রতি বর্ষিত হয়! মায়ামুগ্ধ জীব, এমন গুণের কৃষ্ণকে পুত্রভাবে ভক্তি না করিয়া, কেন নশ্বর শৃগাল-কুক্কুর ভোগ্য দেহ পুত্র-কন্যাদির স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়া ভবচক্রে ঘুরিয়া মরিতেছ। জগদীশ্বর কৃষ্ণ পুত্র ভাবে নন্দ বাবার পায়ের উপানৎ প্রভৃতি বহন করিয়াছেন। আবার ঘোর বিপদের সময় এই নন্দ-যশোদা গোপ-গোপী সকল ব্রজবাসীগণকে পাখী যেমন শাবককে বক্ষের ভিতর রাখিয়া রক্ষা করে সেইরূপে রক্ষা করিয়াছেন। ইন্দ্র যখন সপ্ত দিন-রাত্রি করকা-বিদ্যুৎ সমন্বিত মেঘসমূহে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করতঃ কৃষ্ণ আজ্ঞায় নিজ যজ্ঞ ভঙ্গ গোবর্দ্ধন-পূজাকারী ব্রজবাসীগণকে ব্রজভূমির সহিত ডুবাইয়া মারিবার জন্য মুষলধারে বারি বর্ষণ করিয়াছিলেন, তখন এই মা যশোদার গোপাল নবনীত কোমল কৃষ্ণ বাম কনিষ্ঠকরাঙ্গুলে শ্রীগোবর্দ্ধনগিরি ধারণ পূর্ব্বক সকল ব্রজবাসীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কালীদহ-তটে সমাগত সকল ব্রজবাসীগণকে দাহন করিবার জন্য কংসাসুরের অনুচরকুল দাবানল আনয়ন করিলে করুণানিধি কৃষ্ণ সেই দাবানল পান করিয়া নিজ জনকে রক্ষা করিয়াছিলেন। নিজ জনকে রক্ষা করিতে আগুন বিষ পান করা, মরণের পথে যাওয়া, করুণানিধি কৃষ্ণ ভিন্ন আর এ জগতে কে আছে! ব্রজবাসী জন সর্ব্বকালের বান্ধব এই করুণানিধিকে সুখে দুঃখে

সমাশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা জীবনে-মরণে সমান সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ব্রজবাসী জনের কৃষ্ণের প্রতি যে ভালবাসা, তাহাই সর্ব্বসুখকর মানবত্বদায়ক প্রেমময় বৈষ্ণবধর্ম্ম। এই ধর্ম্মাশ্রিত জীবগণ সুখনিধি করুণানিধি কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিতে থাকে। সেই জন্য চৈতন্যচরিতামৃতকার কহিতেছেন—

"ব্রজবাসীর ভাব লইয়া যে কেউ ভজে।
ভাব যোগ্য দেহ পাইয়া কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥"

এই নন্দনন্দন, এই যশোদাদুলাল, নিজের ব্রজভাব শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কলিযুগে কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইবেন একথা গর্গাচার্য্য কৃষ্ণের নামকরণকালে উল্লেখ করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত কহিতেছেন—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যেষা গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্ত স্তথা পীতো ইদানীং কৃষ্ণ-তাং গতঃ॥"

গর্গাচার্য্য কহিলেন—হে গোপরাজ নন্দ, তোমার এই পুত্র চারিযুগে চারিবর্ণের তনু ধরিয়া অবতীর্ণ হন। ইনি সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ কপিল রূপে, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ হয়গ্রীবরূপে এবং কলিযুগে পীতবর্ণ গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন। অধুনা দ্বাপর যুগে কৃষ্ণবর্ণ ইন্দীবর কান্তি ধারণ করিয়াছেন, অতএব ইহার নাম কৃষ্ণ রাখিলাম। নব যোগীন্দ্র নিমি মহারাজকে কলিযুগের এই গৌরাঙ্গ অবতার সম্বন্ধে কহিয়াছেন সে সম্বন্ধে ভাগবতীয় প্রমাণ এই—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
কলৌ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

যিনি কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু কান্তিতে অকৃষ্ণ ( গৌর বা আলোকের ন্যায় পীতবর্ণ ) সেই সর্ব্বসুখ দাতা সর্ব্বশক্তিমান ভগবান করুণানিধি কৃষ্ণ নিজের অঙ্গ ( অনন্ত সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি ), উপাঙ্গ ( মহাবিষ্ণু শঙ্কর প্রভৃতি ), অস্ত্র ( সুদর্শন চক্র প্রভৃতি ), পার্ষদ (নন্দ সুনন্দ প্রভৃতি) সর্ব্ব বৈভবযুক্ত হইয়া পরম জ্ঞানী ভক্ত ঋষিকুল দ্বারা কলিযুগে সংকীর্ত্তন যজ্ঞে আরাধিত হইতে থাকেন। এই কারণ বৈষ্ণবীয় রীতি নিবন্ধন প্রথমেই গৌরচন্দ্র কীর্ত্তন কীর্ত্তনের প্রথমে সাধকগণ গান করেন। এখন এই কৃষ্ণের গৌরবর্ণ হবার কারণ কি ? ইহা ভক্তিযুক্ত মানসে বিচার করিলে জানা যায় যে—কৃষ্ণ-লীলার শেষভাগ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা, অতএব তপ্ত-কাঞ্চন গৌরবর্ণা ব্রজগোপীকুলমণি পরমাহ্লাদস্বরূপিনী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার কৃষ্ণের প্রতি যে অসীম ভালবাসা, সেই ভালবাসাকারিণীর রূপ-গুণ ধ্যান করিতে করিতে করুণানিধি কৃষ্ণের গৌর আভা লাগিয়াছে, কেবলমাত্র ইহাই উপলব্ধি হয়। যে ভগবান পেশস্কৃৎ ( সোনাপোকা বা কাচপোকা ) তেলা পোকার অপূর্ব্ব ভাব ( অর্থাৎ কাচপোকা ধৃত গর্ত্তমধ্যে নিবদ্ধ ভয়াতুর তেলাপোকা কাচপোকাকে চিন্তা করিতে করিতে সেই দেহে কাচপোকা হইয়া যায় ) সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যে নিজের অর্দ্ধাঙ্গ প্রিয়তমার ধ্যান করিতে করিতে গৌরাঙ্গ হইবেন—ইহাতে কোন সন্দেহকর ভাব নাই। অথচ এই ভাব ভক্তি-যোগে ভগবদারাধনাকারী জন ভিন্ন আর কেহ অনুভব করিতে সক্ষম নয়। সেই জন্য অন্তরঙ্গ রায় রামানন্দ মহাপ্রভু গৌরসুন্দরকে সন্দর্শন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন—

"তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তার অঙ্গকান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা॥

—চৈতন্যচরিতামৃত।

কেন হইল? রাধার প্রেম কি এতই বড়! আর ত ভগবানের অনেক ভক্ত জগতে ছিল। তাঁহাদের রূপ-গুণ কেন ধরিল না, কেবল রাধার গুণ ধরিল কেন?—এ সম্বন্ধে একটি অতি মধুর মর্ম্মভেদী শ্রীরাধার প্রেম মহিমা বৃত্তান্ত আছে। কোন দিন 'রাধা রাধা' বলিয়া রোদনকারী দ্বারকাপুরস্থিত কৃষ্ণকে দেখিয়া নারদ কহিয়াছিলেন—ঠাকুর! তুমি রাধা রাধা বলিয়া কাঁদ কেন? গোপিনী রাধা তোমাকে এতই কি ভালবাসা দানে সুখী করিয়াছে যে, এই দ্বারকাপুরীস্থিতা সর্ব্বগুণ সম্পন্না অষ্টাধিক ষোল হাজার রাজকন্যা রাত্রি-দিন দাসী ভাবে তোমাকে সেবা-ভালবাসা দানে সুখী করিতে পারিতেছে না। শুনিয়া কৃষ্ণ কহিলেন—নারদ রে! রাধা-প্রেম এতই বড়, এতই মনোজ্ঞ যে, সর্ব্বশক্তিমান আমি তাহার তুলনা কর্ত্তে অক্ষম হয়ে রাধার কাছে ঋণী ভেবে কি করে এই রাধা-ঋণ শোধ করব, বা রাধাকে সুখী করব এই চিন্তা করে কেঁদে আকুল হই। শুধু আবার রাধা বলে নয়, রাধার আশ্রয়স্থল দেহাশ্রয়ে প্রাণের ন্যায় সেই সখীমণ্ডলীর ও ব্রজমণ্ডলের সৌন্দর্য্য আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়ে মনকে কাঁদাইতেছে। নারদ রে! কি করে আমি ভুলিব? সেই চির প্রেমময়ীদের কথা ভুলিবার চেষ্টা করিলে গোপীবশীকৃত অন্তর আমার কাঁদিতে থাকে। সেই সুচারু বংশীবট, কেলীকদম্ব বনের সদ্গন্ধযুক্ত শীতল ছায়া, শরদ্-বসন্ত কালের পূর্ণিমা রাত্রিতে ও মেঘমুক্ত দিবসে মণিচূর্ণসহ কর্পূর চূর্ণের ন্যায় অতি মনোরম বালুকা পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় সুমহৎ যমুনা-পুলিন, ঊর্ম্মিবতী ক্ষীরনীরা যমুনাকূলে বিশাল গোকুল নগর, গুল্মপাদপ-সমাকীর্ণ ঝিল্লী-পক্ষী-ভ্রমর রব মুখরিত পুষ্পবিকাশরূপ হাস্যকারী কুসুম সরোবরের রহঃকেলীর সেই নির্জ্জনতা, মহা কাননের সুমহান শ্যাম সৌন্দর্য্য, মধুর বৃন্দাবনের নিবিড় সুখদ-কুঞ্জ-কুটীর, তত্র ব্রজ-বিহঙ্গ-

কুলের অব্যক্ত মধুর প্রেম-কুজন, শিখিযুগলের প্রেম নৃত্য, মৃগবধুর প্রেম-দৃষ্টিপাত, শ্যামল প্রান্তরে কুঞ্জপার্শ্বে নর্ত্তনগতি সঙ্গীতকারিণী স্বভাব-সুন্দরী গোপবালা-বৃন্দ, নীলাকাশে মেঘপার্শ্বে সৌদামিনী-মালার ন্যায় এবং তৎসঙ্গে অতি গরীয়সী রূপগুণাঢ্যা কিশোরী কামিনী বরণীয়া শ্রীরাধার পুণ্যময়ী স্মৃতি নির্জ্জনে আমাকে নিত্যই কাঁদাইতে আসে। বর্ষাধারা-স্নাত বৃক্ষবল্লীর অধিক শ্যামত্বহেতু শ্যামরঙ্গ ভরা শ্রাবণ মাসে পাদপলতামণ্ডিত বরনানুনন্দীশ্বরগিরিবক্ষে প্রিয়া সহিত ঝুলনোৎসব স্মৃতি আমাকে অধীর করে। নারদ রে! আমার বড়ই দুর্ভাগ্য! তাই আজ দুষ্টদলন জন্য রাধা-চরণ-রেণু-ভূষিত সেই ব্রজপুর ত্যাগ করিয়া ক্ষীরোদধিকুলে জীবন্মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। যে ভূমির সৌন্দর্য্য দেখিয়া এক দিন যার রজে, আকাশে, অনিলে, গহনে, কুঞ্জে, লতায় ও পাতায় মিশিয়া যাইতে বাসনা উঠিত, শ্রীরাধার অতি সাধের সেই বৃন্দাবনভূমিতে কবে বা যাব! এখন সে সময় নয় বলিয়া সময়ে সময়ে এত ভাবি ও কাঁদি। যে ব্রজনারীগণ নির্জ্জনে আমার চরণে ধন-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, কেবল কেঁদে কেঁদে কি তাদের ঋণ শোধ করা যায়? স্বার্থপর সংসার ত্যাগ করে ভিখারী সেজে তাদের উপাসনায় মন-প্রাণ নিযুক্ত করিলে বোধ হয় কিছু মাত্র ঋণ শোধ হয়। ব্রজ-গোপিকাদের কাছে স্বাভাবিক যে সুখ পাইয়াছি, সেই সুখ এখানে নিজেই প্রস্তুত করিয়া ভোগ করিতেছি, আর নয়নজলে ভাসিতেছি। কেন না স্বাভাবিক সুখ ভোগীর সুখকর-কার্য্য-রচনা অভাবের জন্য; অভাবে জগতে কে না কাঁদে? স্বাভাবিক সুখই অকৃত্রিম সত্য ও নিত্য, রচনাসুখ কৃত্রিম অনুকরণ মিথ্যা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। স্বাভাবিক কোকিলের কুহুতান শুনিয়া মন যে সুখ পায়, কেহ কোকিল-স্বরকে অনুকরণ করিলে সে সুখ যেমন পায় না, সেইরূপ চির আদর্শ ব্রজ-

সুন্দরীদের অকৃত্রিম আমার সঙ্গে যে প্রেম, তাহার পশ্চাতে অনুকরণ-কারিণী রুক্মিণী-সত্যভামা-কুব্জা প্রভৃতি রাধার সঙ্গে ত তুলনাই হয় না, অন্যান্যা ব্রজবালাদের ন্যায় ইহারা সুখ দিতেও সমর্থা নয়। নারদ কহিলেন—'ঠাকুর আমি ভাল করিয়া এ রহস্য বুঝিতে পারিতেছি না।' কৃষ্ণ কহিলেন—'আচ্ছা তোমার যখন বুঝিবার ইচ্ছা হয়েছে, তখন কোনদিন বুঝিবে।' এই কথাবার্ত্তা হ'বার কিছু দিন পরে এক দিন কৃষ্ণের শরীরে অকস্মাৎ পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল। নিখিল দ্বারকাবাসিগণ প্রিয়তম প্রভুর শরীরে পীড়ার সঞ্চার জানিয়া আকুল মনে তাহার উপশম করিতে নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু কিছুতেই পীড়ার উপশম হইল না। নারদও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ঠাকুর! তোমার পীড়াতে আমরা সকলেই পীড়িত, এই কারণ জিজ্ঞাসা করি—হে সর্ব্বশক্তিমান! তোমার এ পীড়া নাশ তুমি নিজেই না করিলে কেহই নাশ করিতে সমর্থ হইবে না; এখন লৌকিক ছল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পীড়া নাশের উপায় নিজেই কহ।' ভগবান কৃষ্ণ কহিলেন—'নারদ রে! এ জগতে আমার ভক্ত-গণই আমার সেবা-নাম-গুণগানাদির দ্বারা চিরদিন আমাকে সুখী করিতেছে। আমি ত ভক্তগণের সেবা বা নাম-গুণগানাদি করি না বা ভক্তগণ আমাকে তাহা করিতে দেয় না। এই জন্য হে দেবর্ষি! আমি ভক্তগণের পাশে ভক্তিঋণে ঋণী? সেই ঋণ তাপ জনিত পীড়া আমার শরীরে উৎপন্ন হইয়াছে। এই পীড়া উপশমের বিবরণ আমি তোমাকে বলিব, শ্রবণ কর। যদি কোন ভক্ত আমাকে তাহার চরণামৃত (পদধৌত জল) দান করে, তবে তাহা পান করিয়া আমার পীড়ার শান্তি হইবে। নতুবা পীড়া উপশমের অন্যথা কোন উপায় নাই। অতএব হে নারদ, দ্বারকাপুরী হইতে হস্তিনাপুরীস্থ

পাণ্ডবকুল পর্য্যন্ত আমার যত শ্রেণী ভক্ত আছে, তাহাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়া তুমি প্রার্থনা করো যদি আমাকে একটু কেউ না কেউ পদ-ধৌত জল দেয়।' নারদ ভগবানের এই কথা শুনিয়া আনন্দ সহকারে একটি স্বর্ণপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তপদধৌত জল গ্রহণ করিতে গমন করিলেন। প্রথমে দ্বারকার মধুর শ্রেণীর ভক্ত প্রধানা রাজমহিষী রুক্মিণী প্রভৃতির কাছে গিয়া ঠাকুরের অভিলাষ ব্যক্ত পূর্ব্বক চরণধৌত জল প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা ইহা শুনিয়া ত্রস্তভাবে কম্পিত কলেবরে কহিলেন—'নারদ! চরণধৌত জল পরম গুরু স্বামীকে দিয়া কি আমরা নরকে যাইব! তিনি জগৎপতি সর্ব্বশক্তিমান ভগবান, ইচ্ছা করিয়া সব করিতে পারেন, ভক্তবাৎসল্য প্রদর্শন জন্য আমাদের চর্ব্বিত তাম্বুলাদি নয় গ্রহণ করেন, কিন্তু আমরা জ্ঞান থাকিতে কেমন করিয়া সেই সর্ব্বা-রাধ্য পরম গুরুরূপী দ্বারকানাথকে পদধৌত জল দান করিব? সে করিলে যে আমাদের নরকে গমন করিতে হইবে। পীড়া উপশমের আর কি কোন উপায় নাই?' নারদ 'না' বলিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। দ্বারকার অন্যান্য শ্রেণীর যেসকল ভক্ত—বসুদেব-অক্রুর-প্রদ্যুম্ন-উদ্ধব প্রভৃতি—তাঁহাদের কাছে নারদ উক্তরূপ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি জ্ঞানে তাঁহার সে প্রার্থনা কেউ পূর্ণ করিলেন না। অতএব নারদকে সেই স্বর্ণপাত্র হস্তে বিশ্বপতির পীড়া শান্তির জন্য হস্তিনাপুরীতে গমন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরাদি সকাশে এই প্রার্থনা করিতে হইল। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে একবাক্যে কহিলেন—'দেবর্ষি! যদিও কৃষ্ণ মানবাকারে আবির্ভূত আমাদের মাতুলপুত্র বা অন্য কোন লৌকিক সম্বন্ধধারী কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ অথবা সমবয়স্কাদি অভিমানযুক্ত, তাহা হইলেও আমরা সকলেই মনে মনে তাঁহাকে বিশ্বপতি ভগবান ভিন্ন আর কিছুই জানি না। যদিও তিনি ইচ্ছা বশতঃ জোর পূর্ব্বক প্রণামাদি

করেন, কিন্তু ঋষিবর, আমাদের মনোগত ইচ্ছা সেরূপ নহে। আমাদের সদাই তাঁর চরণের দাসানুদাস হতে প্রার্থনা। হে ঋষে! কোন মানব কৌতুহলপরবশ একটা কুকুর শাবককে স্বেচ্ছায় নিজের ভোজন পাত্রে খাওয়াইতে পারে; কিন্তু সেই কুকুর শাবক নিজের ইচ্ছায় তার ভোজন পাত্রে খাইতে গেলে যেমন প্রহারাদি দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তেমন বিশ্বপ্রভু কৃষ্ণের দুয়ারে কুকুরের ন্যায় অতি ঘৃণ্য আমরা তাঁহার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মানদানে মান গর্ব্বিত হইয়া কেমন করিয়া পদধৌত জল দান করিব! তাহা হইলে যে পূর্ব্বোক্ত কুকুর শাবকের ন্যায় আমাদের দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। তাঁর ইচ্ছায় পীড়া এবং ইচ্ছায় উপশম।' এই কথা শুনিয়া নারদ তথা হইতে গমন করিয়া পুনর্ব্বার কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। নারদের মুখে পূর্ব্বোক্ত ভক্তবৃন্দের দীনতা ও পদধৌত জল দানের অসম্মতি বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক কৃষ্ণ কহিলেন—'নারদ, এ ভিন্ন ত পীড়া নাশের উপায় আর নাই। তবে তুমি একবার আমার অতি প্রিয় ব্রজবৃন্দাবনে ব্রজগোপীদের নিকট গমন কর; তাঁদের মধ্যে কেহ যদি আমাকে চরণধৌত জল দানে এ পীড়া হইতে শান্তি দিতে সক্ষম হয়।' বীণাবাদনশীল নারদ পুনর্ব্বার স্বর্ণপাত্র হস্তে ব্রজের দিকে গমন করিলেন। ব্রজে তখন কৃষ্ণের বিরহদশা। এই বিরহ সন্ধ্যা-কালে যদুকুল-কমল-নায়ক-করুণানিধি-কৃষ্ণ-বিহনে হাসির মাঝে কান্নার রেখার ন্যায় ব্রজমণ্ডলরূপ-কমলে যে মলিনতার সঞ্চার হইয়াছে, তাহা দেখিয়া নারদের চিত্ত ব্যথিত হইল। তিনি মধুবন হইতে বিশাল কাননমার্গ দিয়া বৃষভানুপুর ও নন্দগ্রাম অভিমুখে অগ্রসর হইতে-ছিলেন। নারদ চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিতেছেন, যতদূর দৃষ্টি ততদূর তাল-তমাল-ভাণ্ডীর-কদম্ব বন প্রভৃতিতে নৈসর্গ মধুর-ব্রজের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বীণাবাদন বন্ধ হইল। অমনি ব্রজের

সেই চিণ্ময়-রজ-পুঞ্জ-শ্যামল-প্রান্তর সমুন্নত বনস্পতিশ্রেণী, আন্দোলিতা বল্লীকুল, বিষাদ গামিনী শ্রীযমুনা, গহন-কানন কুঞ্জ, গাম্ভীর্য্যশীল হরিদাসবর্য্য গোবর্দ্ধনগিরি প্রভৃতি অব্যক্ত ভাবে নারদের কর্ণে যেন কি বলিয়া দিল—নারদ তখনই উল্লাস ভরে 'শ্রীরাধে' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই মুহূর্ত্তে রাখালবালকের বিরহরাগিণী আলাপকারী বেণু-গীতও শ্রুত হইল। নারদ তখনই উন্মাদের মত অশ্রু ভরা নেত্রে ভাবশিথিলস্বরে বলিলেন—ওগো তোমাদের কাছে সে আছে! ব্রজের রাখাল! ব্রজের সবৎস ধেনু! ব্রজের মাঠ, ব্রজের ধূলা, ব্রজের পথ, ব্রজের কানন, ব্রজের কুঞ্জ, ব্রজের নদী, ব্রজেব ভূধর, ব্রজের বৃক্ষ, ব্রজের লতা, ব্রজের আকাশ, ব্রজের গোপ, ব্রজের গোপী, তোমরা সকলে শুনো, আমি মুক্ত কণ্ঠে বল্‌ছি, সে তোমাদের কাছে আছে। তোমাদের কাছে আছে বলে তাই তোমরা তার জন্য এত কাঁদ। যদি তোমাদের কাছে সে না থাক ত, তাহলে তোমরা তার জন্য এত কাঁদতে না, বা অপরকে কাঁদাতে পারতে না। আমি আরও বলি—তোমরা যেমন ঠাকুরের জন্য কাঁদ, ঠাকুরও তেমনি তোমাদের জন্য কাঁদেন। মনের মানুষকে মনের ভিতর রেখে বাহিরে তাকে প্রকাশ করবার জন্য কাঁদতে জানো একমাত্র তোমরা। গুল্মসমাকীর্ণ চরণ পাহাড়ীর প্রফুল্ল-মুখী একটি লতা সুমনবদনে অলি-গুঞ্জন-স্বরে কহিল, নারদ! কৃষ্ণ গেছে, কিন্তু কৃষ্ণের চরণচিহ্নটি যায় নাই। সেইটিকে এই গুল্মলতা রূপ নীলা আঁচলে আবৃত করিয়া নিজেই দেখিতেছি, আর আপন মনে পাগলিনীর ন্যায় হাসিতেছি। নারদ বিশাল নেত্রে ইহাই দেখিতেছেন, এমন সময় পুলিন্দকন্যাকুলের কৃষ্ণবিরহসঙ্গীত শ্রবণকুহর স্পর্শ করিল; তখন আত্মহারা হইয়া বৃষভানুপুর প্রবেশ জন্য তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। নারদ ব্রজে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্রজগোপীদের জন্য পাগল ঠাকুরের

অভিলাষ গোপীকাদের সকাশে প্রকাশ করিবার বাসনায় গোপীমণ্ডলী সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মূর্ত্তিমতী কৃষ্ণ-বিরহিণীগণের দর্শনে নারদের শরীরেও কৃষ্ণ-বিরহ-জ্বালা একটু একটু করিয়া প্রবেশ করিতেছিল! যে রাধানাম গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণ নির্জ্জনে প্রায়ই রোদন করেন, জলজ সমূহ মধ্যে বিরহ শৈবালাচ্ছাদিতা কমলিনীর ন্যায় অথবা তারকাবেষ্টিত অর্দ্ধরাহুগ্রস্থ পূর্ণ চন্দ্রের তুল্য শ্রীবৃষভানুনন্দিনী রাধিকাকে দর্শন করিয়া নারদের নেত্রেও জল আসিয়াছিল। স্বর্ণপাত্র হস্তে সমাগত নারদকে দেখিয়া শ্রীরাধার সখিবৃন্দ বসিতে আসন দিলেন ও কৃষ্ণের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ আসনে উপবেশন পূর্ব্বক কহিলেন—'হে ব্রজদেবিগণ! তিনি কুশলে ছিলেন, সম্প্রতি পীড়িত, কিছুতেই পীড়ার উপশম হইতেছে না জানিয়া প্রভু আমাকে আপনাদের কাছে পাঠাইয়াছেন; একটুমাত্র চরণধৌত জলের জন্য!'

তিনি বলেন যে—"যাঁরা আমাকে সেবা-সুখ দানে সুখী করেন, তাঁরা যদি একটু চরণামৃত দেন, তাহা হইলে আমার পীড়ার শান্তি হইবে। কিন্তু হে দেবিগণ! নরকপতন ভয়ে দ্বারকাবাসিগণ, হস্তিনাবাসিগণ কেহই তাহা দানে সম্মত হইল না জানিয়া প্রভু আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন; আপনারা যাহা হয় বিধান করুন।" নারদের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক দরদরধারে অশ্রুবর্ষণকারিণী শ্রীরাধা কহিলেন—"অহো নারদ! এ বড় হৃদয় বিদীর্ণকর কথা! প্রাণ-প্রিয়তমের পীড়ার সংবাদ নিতান্ত অসহনীয়! তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁর সুখ-সংবাদ শ্রবণে আমাদের সুখ। আমাদের দৈহিক দুঃখের দিকে লক্ষ্য করিলে বন্ধুর সুখ দেওয়া হয় না। ভবিষ্যৎ নরকে যাবার ভয়ে নয়ন সম্মুখে পীড়িত প্রাণ-সখার দুঃখ দূর করিব না! হায় এই কি প্রেম! নিজে দুঃখ পাবার ভয়ে পরম বন্ধু পতির দুঃখ দূর করিব না! নারদ!

এই লও আমিই তোমাকে চরণামৃত দান করছি ; তুমি ইহা লইয়া শীঘ্র বায়ুবেগে যাদবেন্দ্রের নিকট গমন কর ; তিনি শান্তি লাভ করুন।” এই বলিয়া প্রেমময়ী রাধা নারদের সেই স্বর্ণপাত্রে স্বচরণামৃত দান করিলেন। নারদ গোপীকুলমণি রাধিকার কৃষ্ণের প্রতি এই অলৌকিক প্রেম, কৃষ্ণ-সুখের জন্য প্রাণকে অসীম দুঃখ-সাগরে ভাসাইতে পারে ত সে এই রাধিকা ভিন্ন আর কেহই নাই জানিতে পারিলেন। তিনি “জয় রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী” বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন ; এবং রাধা চরণ-চিহ্নিত ব্রজের রজ ( ধূলা ) অঙ্গে মাখিয়া প্রেমপুলকিত দেহে সেই চরণামৃত লইয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারকানাথ পরামৃত স্বরূপ রাধাচরণামৃত পান করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। পীড়ার উপশম হইল। নারদ কৃষ্ণের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—“ঠাকুর! আপনার কৃপায় আজ আমি রাধা-প্রেম মহিমা জানিতে পারিলাম।” ঠাকুরও কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—“নারদ রে! এই জন্য আমি নির্জ্জনে ‘রাধা রাধা’ বলে সদাই কাঁদি!”

এই কারণে গৌর হইল ; নির্জ্জনে ‘রাধা রাধা’ বলিয়া কাঁদিয়া রাধা-রূপ ধ্যান করিয়া শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ আজ গৌরাঙ্গ হইয়াছেন। রাধা ভাব ভিন্ন সুখদাতা কৃষ্ণ প্রাপ্তির আর উপায় নাই। এই রাধা ভাব শিক্ষার জন্য ব্রজের সেই রাধারমণ যশোদাদুলাল আজ নবদ্বীপে শচীদুলাল হইয়াছেন। তাই বৈষ্ণব কবি উল্লাসভরে গাহিতেছেন—

“যদি গৌরাঙ্গ না হ’ত কেমনে জানিত
কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা, প্রেম-রস-সীমা
জগতে জানাত কে॥”

শ্রীমন্ গৌরসুন্দর আমার যাবতীয় ব্রজভাবের আধার হইলেও রাধা

ভাবের পূর্ণতম অমিয়খনি ছিলেন। এই ভাবে বিভোর হইয়া তিনি মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে অতি পাষাণ হৃদয়কে প্রেমরসে দ্রবীভূত করিয়াছেন। রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেবকে রথের উপর সন্দর্শন পূর্ব্বক প্রেমাশ্রু সুরধুনিধারায় বক্ষস্থল ধৌতকারী রাধাভাব-বিভোর গৌরসুন্দর কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

"সেই ত পরাণনাথে পাইলুঁ।
যাঁর লাগি মদনদহনে ঝুরি মইলুঁ॥"

রাধা-রসাস্বাদনের প্রথমকাল গয়া হ'তে সমাগত গৌরসুন্দর একদিন প্রিয় গদাধরকে দেখিয়া গলদশ্রুলোচনে গদগদকণ্ঠে "ও গদাধর, কানাইয়ের নাটশালা গ্রামের কাছে এক তরুণ-তমালসদৃশ শ্যামল বর্ণের বালক মধুর হাসি হেসে আমাকে আলিঙ্গন করে, আমার মন প্রাণকে অপহরণ পূর্ব্বক আচম্বিতে কোথায় চ'লে গেল" বলিয়া অশ্রু-পুলক-কম্পনযুক্ত গৌরসুন্দর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দ্বাদশ বৎসর শ্রীজগদীশ পুরীধামে গৌরসুন্দর আমার কৃষ্ণবিরহে প্রেমময়ী শ্রীরাধার প্রলাপ বিলাপ উন্মাদ প্রভৃতি যে ভাব তাহা নিজে আচরণ পূর্ব্বক জগৎকে কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন করিবার পন্থা পূর্ণরূপে প্রকট করিয়াছেন। কৃষ্ণবিরহে কাঁদিয়া আকুল গৌরসুন্দরের হৃদয়ের ভাব পার্ষদ মুকুন্দ কীর্ত্তনীয়া গাহিতেছেন—

"আহা প্রাণ প্রিয় সখি কিনা হইল মোরে।
কানুপ্রেম বিষে মোর তনু মন জরে॥
রাত্রি দিনে পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাঙ।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঙ॥"

জগদীশ পুরীধামে গৌরসুন্দরের নিজমুখে প্রকাশিত বিলাপগীত শ্রবণ করিয়া কে না কৃষ্ণের জন্য কাঁদিতে থাকে! প্রভু আমার পুরীধামে

শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর মহাভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন! অসীম তরঙ্গ ফেনপুঞ্জহার শোভিত নীল জলময় মহোদধির বালুকাপূর্ণ তটভূমিতে বালুকাময় চটক পাহাড় দর্শন করিয়া "প্রভু আমার ওই গোবর্দ্ধনগিরি! উহার গহ্বর মধ্যে লুক্কায়িত কপটী আমার প্রাণবল্লভ গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণ আছেন"—এই বলিয়া বিরহিণী শ্রীরাধার ন্যায় চটক পর্ব্বত সমীপে ধাবমান হইতেছেন! কখন বা পুরীধামে উপবনাদি দেখিয়া বৃন্দাবন ভ্রমে আকুল মনে অগ্রসর হইতেছেন, আনন্দে মূর্চ্ছিত হইতেছেন, নাচিতেছেন, গাহিতেছেন, আর রাত্রি দিন এই বিলাপগান করিতেছেন—

"কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব কথা কেবা জানে দুখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক॥"

সর্ব্বসুখনিধি প্রাণবন্ধু কৃষ্ণকে কেমন করিয়া ভুলিব! যার নয়ন একবার কৃষ্ণরূপ দেখিয়াছে, কৃষ্ণ একবার যাঁকে কৃপানয়নে দেখিয়াছেন, সে কেমন করিয়া কৃষ্ণকে ভুলিবে—এই ভাবিয়া গৌরসুন্দর কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—

"সখি হে কৃষ্ণ তনু যেন আম্র আটা।
নারীর হৃদি পশি যায় যত্নে নাহি বাহিরায়
তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা॥"

এইরূপে করুণানিধি কৃষ্ণের জন্য গৌরসুন্দর কাঁদিতে শিখাইলেন। কিন্তু এই ভাবে কজন কাঁদিয়াছে? যাঁরা কাঁদিয়াছেন তাঁরা ঠিক মানুষ হইয়াছেন; মানুষ কেন দেবতা, ঈশ্বর, যত এ সংসারে উচ্চতাক্ষর ভাব আছে সে সব কিছু পাইয়াছেন। যারা এই ভাবে কৃষ্ণের জন্য না কাঁদিল, তারা মানবজন্ম লাভ করিয়াও সব কিছু হারাইল।

কেন হারাইবে না! নিত্য সুখদাতা নিত্য বিকারহীন নিত্য সম ভাবে অবস্থানকারী চিন্ময় শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া যারা নিত্য অভাব সংঘটনরূপ দুঃখ আনয়নকারী, অবস্থার পরিবর্ত্তন, পরমায়ু হ্রাস প্রভৃতি বিকার প্রাপ্ত, রোগ-শোক-মোহ-লোভ প্রভৃতি নিত্য বিষম ভাবে দণ্ডায়মান শৃগাল-কুক্কুর ভোগ্য দেহতে আসক্ত হইয়া রহিয়াছে, মৃত জীবের জন্য যারা কাঁদিতেছে বা ভাবিতেছে, যাঁর কখনও মরণ হয় না, যিনি মাতৃগর্ভে জীবকে বাঁচাইয়াছেন সেই চির জীবনময় নিত্য মানব আমার সুখনিধি করুণানিধি কৃষ্ণের জন্য যখন কাঁদিল না বা ভাবিল না, তখন তাদের হারাণ বই পাওয়া মাত্র যমদূতের রোগ-শোকরূপ তাড়না আর মায়া পিশাচীর লাথি ঝাঁটা! এই জন্য গৌরাঙ্গ প্রভু আমার কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিয়াছেন—যে চক্ষু কৃষ্ণের জন্য না কাঁদিল সে চক্ষুর মাথায় বাজ পড়ুক, সে মরা মানুষের চক্ষু; যে কর্ণ কৃষ্ণলীলা নামগুণগান না শুনিল, সে কর্ণ ছিদ্র কড়ির তুল্য, এবং যে জিহ্বা কৃষ্ণকথা প্রভৃতি না বলিল সে জিহ্বা ভেক জিহ্বার ন্যায়! অতএব যদি মানব-জীবন সফল করিতে চাও, তবে জীব! কৃষ্ণের জন্য কাঁদিতে শেখো। তোমাকে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে না। এই নশ্বর সংসার তোমার কাছে নিত্য সুখের সংসার হইবে। হিংসাদ্বেষাদি রহিত নিরপেক্ষ ভাব ধারণ পূর্ব্বক প্রাণকে মাত্র রক্ষা করিয়া রাধা-কৃষ্ণের রূপ ধ্যান করিলে মানব সর্ব্বত্রই সুখ বৃন্দাবনকে দেখিতে সক্ষম হয়। সেই জন্য হিংসাদ্বেষাদি থাকিলে সুখ বৃন্দাবন দর্শন হইবে না, জীবের কষ্টও যাইবে না—দেখিয়া গৌর, নিতাই, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাস এই পঞ্চতত্ত্ব সহিত কৃষ্ণ, ব্রজের সমুদয় সখা-সখি ও যাবতীয় ভক্তবৃন্দ অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক কলিজীবকে উদ্ধারের পথে লইতেছেন! সকলেই শিক্ষা দিতেছেন ওই মোহন রূপের দিকে দৃষ্টিপাত

কর, আর এই নাম বদনে বল, নিত্য সুখময় বৃন্দাবনকে প্রাপ্ত হইবে—

সেই মোহনরূপ কি ; শ্রীমদ্ভাগতের ভাষায় তাহা এই—

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং—
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীং চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ণ গোপবৃন্দৈ—
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীত কীর্ত্তিঃ॥"

আহা কি মনমোহনরূপ ! যাঁহার মস্তকে ময়ূর পাখার মোহনচূড়া, নাট্যালয়ে শ্রেষ্ঠ অভিনয়কারীগণের ন্যায় যাঁহার সুন্দর অঙ্গভঙ্গি বিশিষ্ট ত্রিভঙ্গিম কলেবর, কর্ণে কর্ণিকার কুসুমের কুণ্ডল, কনকবৎ উজ্জ্বল বর্ণের পীতাম্বর যিনি পরিয়াছেন, যাঁহার গলায় বৈজয়ন্তী মালা ( কণ্ঠ হইতে জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুন্দর সুগন্ধযুক্ত পুষ্পের মালা ), যিনি অধর-সুধার দ্বারা বেণুর ছিদ্রকে পূর্ণ করিতেছেন, অর্থাৎ সুন্দর লাল বর্ণের অধরে বাঁশী ধারণ পূর্ব্বক যিনি মৃদুগম্ভীর মধুর তানে বাঁশীতেই গান করিতেছেন এবং সেই গানে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎকে মোহনকারী এমন গীতকীর্ত্তিশীল কিশোর বয়স শ্রীকৃষ্ণ সখা রাখালবালকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অতি প্রিয়ধাম বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছেন। অথবা—

"কস্তুরীতিলকং ললাটপটলে বক্ষস্থলে কৌস্তুভম্।
নাসাগ্রে বরমৌক্তিকং করতলে বেণু করে কঙ্কণম্॥
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী।
গোপস্ত্রী পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণি॥"

ব্রজ রাখালবালকগণের চূড়ামণি স্বরূপ তপ্তকাঞ্চন গৌরবর্ণা শ্রীরাধার কণ্ঠালিঙ্গনকারী ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা

ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী—এই অষ্ট সখী সহিত ব্রজ কামিনীগণ পরিবেষ্টিত রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকল সুখ সৌন্দর্য্যের শীর্ষ ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকারে বিজয় লাভ করিয়া যমুনাকূলে নিবিড় কুসুমকুঞ্জযুক্ত কদম্বতলে অবস্থান করিতেছেন। যাঁহার নাসিকাতে গজমুক্তার অলঙ্কার, সুললিত হরিচন্দনে যাঁহার শরীর লিপ্ত, গলায় লম্বিত মুক্তামালা, হস্তে মণিনির্ম্মিত বলয়, বক্ষস্থলে সমুজ্জ্বল কৌস্তুভমণি এবং কপালে কস্তুরী সংযুক্ত চন্দনরচিত চন্দ্রনিন্দক উর্দ্ধ-পুণ্ড্র তিলক। আহা! সকল দুঃখের অবসানকারী বিশ্বপতি শ্রীকৃষ্ণের এই চিরসুন্দর রূপকে ধ্যান করিয়া কে না আনন্দ-সাগরে মগ্ন হয়? দেখিতে হয়ত ব্রজগোপিকাদের ন্যায় মনের নয়নে এই মনমোহন রূপকে নিশিদিন দেখ, জীবনে-মরণে সুখস্বপ্নের তুল্য প্রত্যক্ষে পরম সুখকে প্রাপ্ত হইবে! জন্মজরা-ত্রিতাপজ্বালা আর ভোগ করিতে হইবে না। বলবার মধ্যে শুধু এই মধুর তারকব্রহ্ম নাম বদনে বল:—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

হে হরে! হে সর্ব্ব তাপজ্বালাহরণকারিণ! হে সকল সুখদাতা! হে সুখনিধে! হে প্রেমনিধে! হে করুণানিধে! হে কৃষ্ণ! হে সর্ব্বদুঃখ মোচনি! পরমাহ্লাদ রূপে! হে সুখ বৃন্দাবন বিহারিণী! হে রাধে!! হে কৃষ্ণ সঙ্গে আনন্দক্রীড়ার দ্বারা কৃষ্ণমনমোহন-কারিণি! হে প্রাণেশ্বর! হে প্রাণেশ্বরী! হে রাধে! হে কৃষ্ণ! তোমাদের সেই চির সুখ রঙ্গধামে যাবার আমার উপায় কি? এই হিংসাকাপট্যস্বার্থ পূর্ণ মরুভূমির তুল্য সংসারে থাকিয়া আমি নিশিদিন যে জ্বলিয়া মরিতেছি। তোমাদের যুগল চরণরূপ নৌকাদানে আমাকে

অকূল ভবসাগর হ'তে পার কর। এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া তারকব্রহ্ম নাম মনবাক্যের দ্বারা সর্ব্বদা বল, সব সুখ পাইবে, সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে সাক্ষাতে দেখিয়া চোখ দিয়া আনন্দের জল পড়িতে থাকিবে। আর মিথ্যা তর্ক করিতে হইবে না, সর্ব্ব মীমাংসার পারে গিয়া দাঁড়াইবে। আর নিজ কৌশলে বাঁচিবার উপায় অবলম্বনকারী অবশেষে তপ্ত জলে বুদ্ধিজাত গুটীর সহিত প্রাণনাশক তসর কীটের তুল্য ঈশ্বর ভক্তিহীন হিংসাপরায়ণ নাস্তিক পাগল মনুষ্যের সমালোচা রচিত আকাশকুসুমের ন্যায় মনুষ্যত্বনাশক গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া তোমাকে পাগল সাজিতে ও ভাবিতে হইবে না। এই শ্রীশ্রীকৃষ্ণ করুণানিধি প্রবন্ধ শ্রবণে কাহার মনে কৃষ্ণভক্তি রূপ সূর্য্যের উদয় না হয়! অন্তর গগন হইতে সংসারমোহরূপ ভীষণ অন্ধকারের অপগম না হয়! এবং বৈষ্ণবত্বই চিরসুখসহচর জ্ঞানে কে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ধাবমান না হয়! হে সুখপিপাসী! হে সংসার দুঃখতাপজ্বালা নাশ করিতে উন্মুখ জীব! তাপজ্বালা দূর করিতে হইলে, অমৃত পানে পিপাসা নাশ করিতে হইলে, এই শারদ পূর্ণচন্দ্রের অমৃত কিরণময় কৃষ্ণ করুণানিধিকে আশ্রয় কর।

ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথির অর্দ্ধ নিশিতে এই সচ্চিদানন্দ করুণানিধি পরম ব্রহ্ম তাপিত জীবকুলের সর্ব্বপ্রকার তাপ বিনাশ জন্য আনন্দ-ঘন মূর্ত্তিতে মরণশীল সংসারে আবির্ভূত হইয়াছেন! আহা বলাকা শ্রেণীর ধ্বজা উড়াইয়া পরার্থে আত্মবিসর্জ্জনকারী জলদাবলী যাঁহার প্রিয়সঙ্গী, হংসকারণ্ডবমরালকুল যাঁহার পুরাণ কথক, শিখিকুল নর্ত্তক, কানন বিহঙ্গকুল গায়ক, ভ্রমরকুল বীণাঝঙ্কার, এবং যিনি কমলকুমুদ-বদনে হাস্য করিতেছেন, নবকিশলয় যুক্ত মঞ্জুমঞ্জরীপুঞ্জমণ্ডিত তুলসী পাদবকুল যাঁহার কর্ণভূষণ সেই মাসপতি রাজর্ষি এই ভাদ্রমাস শ্রীকৃষ্ণ

জন্মতিথি বক্ষে ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব মহিমাময় হইয়াছেন! যিনি নিজ তেজে গর্ব্বিত চন্দ্রসূর্য্যকেও ম্লান করিয়াছেন, 'কৃষ্ণচন্দ্রমাকে বক্ষে ধারণ করিলে অতি তুচ্ছ বস্তু ধারণকারীরও অধিকতম গৌরব হয়' —এই মনে করিয়া যিনি নক্ষত্রহার শোভিতা নিশিকে লজ্জা দানের জন্য মাধবী ধরাদেবীকে রজনী উদয়ে খদ্যোতহারে শোভিতা করিয়াছেন, প্রবাহশীল নদনদী যাঁহার বারিবাহক, পয়স্বিনী গাভীকুল যাঁহার দুগ্ধদান কারিণী আহীরকন্যা, নবোদ্গত শস্যপাদপকুল সমীর সঞ্চালিত হইয়া যাহার পুলক রোমাঞ্চের সূচনা করিতেছে, শ্যামপল্লবমণ্ডিত বনস্পতিকুল ছত্র, দূর্ব্বদাম শোভিত উচ্চ প্রান্তর ভূমি আস্তরণ, সমুন্নত পুগদেবদারু প্রভৃতি দণ্ড, অরুণ বর্ণ ইন্দ্রগোপ কীট তাম্বুলরাগ, পক্ক বন্ধু জীবাদি অধর বর্ণ, কুসুমহার-শোভিত কাননভূমি সভা, নিবিড় কুঞ্জতল শয়নকুটীর, কৃষককুল কর্ম্মেন্দ্রিয়বৃত্তি ও বৃষভকুল যাঁহার হলবাহক হইয়াছে, উত্তাল তরঙ্গে জগৎ প্লাবনকারী জলনিধি সমুদ্র যাঁহার গুণে স্বতেজে অগ্রগামী তরঙ্গসৈন্যকুলকে তট ভূমির বহির্ভাগে আসিতে দিতেছেন না, মিত্র-স্বরূপে রহিয়াছেন, যিনি ঝিল্লীদলকে তাপজ্বালা জ্ঞাপকরূপে ও প্রজাপতিকুলকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শকরূপে রাখিয়াছেন, গোবৎস কুলের হাম্বারব নিনাদে অখিল ব্রহ্মাণ্ড যে মাসপতির নিকটে এই কৃষ্ণ জন্মতিথি ধারণ সুখ, গাভীকুল সকাশে দুগ্ধপান সুখ প্রার্থী বৎসের ন্যায় প্রার্থনা করিতেছে, লতাগুল্মপুষ্পহারমণ্ডিত গিরিবরকুল যাঁহার সিংহাসন, ক্ষুদ্র ভূধর পাদপীঠ, নির্ঝরকুল পাদোদকধারা এবং পক্ক তালফলাদি সৌরভ যাঁহার অঙ্গগন্ধ হইয়াছে, লজ্জবতীকুলে যাঁহার পবিত্র সঙ্কোচ বিদ্যমান, সর্ব্ব সুখদ গোপবেশধারী মাসপতি এই ভাদ্রমাস শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীকে নিজের মধ্যে স্থান দিয়া গোপরাজ ব্রজপতি নন্দের ন্যায় আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। মাসপতি ভাদ্রের এই জন্মাষ্টমী

জনিত আনন্দ সমগ্র সংসারে প্রেরিত হইয়াছে। সেই জন্য আতপতাপ-ক্লিষ্টা কৃশা বসুন্ধরা আনন্দপুলকিতা হইয়া রসবতী ও স্থূল শরীরা হইয়াছেন। শ্যামপত্রাবলীরূপ বসনাঞ্চলের পাশে কুসুমবিকাশচ্ছলে হাসিতে হাসিতে তিনি জনকোলাহল উপলক্ষে 'আজ সেই তাঁর জন্মাষ্টমী' ইহাই জানাইতেছেন। ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ভক্ত-ঋষিকুল তাহা জানিয়া পুলকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন; আর সেই চিরসুখ সুধাকরের দুঃখ জগতে আবির্ভাব জনিত আনন্দামৃত পান করিয়া শিথিল দেহ, বাহ্যস্ফূর্ত্তি হীন, 'তদর্থে অখিল চেষ্টা' ভাব ধারণ পূর্ব্বক প্রিয়তমের অর্চ্চনার জন্য চতুর্ব্বিধ ভোজন সহিত গন্ধমাল্য ধূপ-দীপ প্রভৃতি পূজোপহার সংগ্রহ এবং 'জয় শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ, জয় রাধাকান্ত' এই নামামৃত বদনচন্দ্রমা হইতে উদ্গীরণ করিতেছেন। ইহাই ভাবিতে ও করিতে করিতে তাঁহাদের বাহিরের ক্ষুধাতৃষ্ণা নাশ হইয়াছে; কল্পতরু, কাননবেষ্টিত চিন্তামণি মন্দিরে নন্দগোকুলে যশোদার কোলে ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতি সর্ব্বসুখধাম কালো ঠাকুরকে ধ্যান করিয়া মানব হৃদয় এমন কে আছে যে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ না হয়! 'সুখনিধি কৃষ্ণের মর জগতে আবির্ভাব, আমরাও সেই আবির্ভাব দেখিব নন্দগোকুল হয় হৃদয়ক্ষেত্রে নয় বাহিরে কোথায় আমরাও প্রকাশ করিব' এই ধ্যানমত্ত মহামনা মানবকুল যে অন্নজলাদির চিন্তা ত্যাগ করেন তাহাই জন্মাষ্টমী ব্রত। এই ব্রতই মানবের সর্ব্ব কল্যাণকর প্রিয়তম ব্রত। নতুবা অন্নজল খাইল, স্ত্রীসঙ্গ করিল, মুণ্ডিত মস্তক বৈষ্ণব ঠাকুরের ঘরে ঠাকুর পূজার জন্য কিছু দেওয়া হইল, কীর্ত্তনাদি একটু শুনিয়া শয়নঘরে শবের ন্যায় নিদ্রা গেল, সেইরূপ নর জন্মাষ্টমীর কিছুই ফল পাইল না। তাহার ফল, হাতীকে যতই গঙ্গা স্নান করাও সে তখনই উঠিয়া বিষ্ঠাধূলিযুক্ত স্থানে শুইবে, স্নান করা

রিফল হইবে—ঠিক সেইরূপ। আর যে নরকুল জন্মাষ্টমী নাম জানিল না বা জানিয়াও জন্মাষ্টমী ব্রত করিল না, তাহাদিগকে মৃত মানুষ বল বা বিষ্ঠাজাত কৃমি বল—এ একই কথা! আবার জন্মাষ্টমীর সেই নিশীথরাত্রি! গভীর নীলিমাযুক্ত তারকাপুঞ্জ শোভমান গগনক্রোড়ে চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত ঋষিকুলের মানসে মণিমুক্তাহারে শোভিত শ্যামবর্ণা নন্দমহিষী যশোদার কোলে কৃষ্ণচন্দ্রমার উদয় তিস্ক পাইল! অমনি আহারাদি চিন্তাশূন্য ভক্তকুল স্নান পূর্ব্বক মন্দিরে মন্দিরে স্ব স্ব শ্রীবিগ্রহে যশোদার নীলকান্তমণি-আরোপ-জ্ঞানে পঞ্চামৃতে স্নান অর্চ্চনাদি করিতে লাগিলেন। ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-করতাল প্রভৃতির ধ্বনি রাগ-রাগিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহণ পূর্ব্বক যেন কৃষ্ণাষ্টমীর জয়গান শ্রবণশীলকে শুনাইতেছে। অগুরু ধূপের সুগন্ধ, দীপারতির উজ্জ্বল জ্যোতি, ব্রজ-কামিনীকুলের উজ্জ্বলমণি-আভরণ-ভূষিত অঙ্গের পরিমল সৌরভের ন্যায় নাসিকাকে মুগ্ধ, ও পঞ্চামৃত, নিবেদিত চতুর্ব্বিধ ভোগ্যবস্তুর সুরভি শ্রীকৃষ্ণ অধরামৃত লালসায় ভক্তভ্রমরকে লুব্ধ করিতেছে। তাঁহারা ভ্রমরের ন্যায় মধুর স্বরে জন্মাষ্টমীশ্লোকামৃত পান করিতেছেন। এইরূপে ভক্ত ঋষিকুলের পত্রপুষ্পাবৃত পর্ণকুটীরের মধ্যে ব্রজগোকুলের সেই নীলকান্ত-মণি সহিত নন্দালয় আবির্ভূত হইয়াছে! ভক্তকুল তাহাদের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক—

'দরিদ্র যেমন পাইয়া রতন
থুইতে ঠাই না পায়।'

সেইরূপ ভাবে প্রেমাশ্রু ত্যাগ করিতেছেন, আর পঞ্চম পুরুষার্থ স্বরূপ যে কৃষ্ণপ্রেম সেই চিন্তামণি লইয়া হার গাঁথিয়া গলায় পরিতেছেন। মায়ামুগ্ধ অট্টালিকাবাসী মূঢ় নরকুল মায়ানারীর অঙ্কাশ্রিত ও নিদ্রা-রাক্ষসীকর্ত্তৃক কবলিত হইয়া প্রাণরত্নকে হারাইতেছে, মাতালের ন্যায়

চৈতন্যহীন হইয়া শুইয়াছে। করুণাময়ী কৃষ্ণাষ্টমী রজনী ইহা দেখিয়া 'এই অজ্ঞানদের গতি কি হইবে' ভাবিতে ভাবিতে 'উষাকে পাঠাইয়া ইহাদের জাগাইব' "——" মনে করিয়া শীঘ্রই যেন নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ক্ষণমধ্যে আরক্ত-বসনা চামরহস্তে শীতল-সমীরণ-সঞ্চালন-কারিণী নবকুসুমহার-শোভিতা সমুজ্জ্বল এক নক্ষত্রপ্রদীপ-হস্তে আকাশ পথে উষা দেবী উদিত হইলেন। কৃষ্ণ প্রেমময়ী চৈতন্যদায়িনী উষা 'কৃষ্ণাষ্টমী উৎসবানন্দ শুদ্ধদেহে দেখা কর্ত্তব্য' ইহা জানিয়া ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে যেন পূর্ব্ব পয়োধিতে স্নান করিয়াছেন, স্নানজল কুন্তলকলাপ হইতে বিন্দু বিন্দু শিশিরাকারে পতিত হইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া সিন্ধু সহিত নদীকুল উর্ম্মিউচ্ছ্বাসরূপ পুলকাবলী দেহে ধারণ করিল। তিনি প্রসন্ন নয়নে দশদিক অবলোকন পূর্ব্বক পুণ্য ভূমি ভারতখণ্ডে ভক্ত গৃহে জন্মাষ্টমী উৎসব দেখিয়া প্রফুল্ল হইলেন। উষার প্রফুল্লতা কমলকুলে প্রকাশ হইল। কুমুদকুলে বিষাদ প্রকাশ করিয়া তিনি পক্ষীকুজনচ্ছলে যেন কহিতে লাগিলেন—"জাগ ভারতের মূঢ় জীব! আর মোহঘুমে পড়ে থেকো না। জেগে দেখো তোমার চির সুখের অতি সাধের সেই জন্মাষ্টমী!" অনেকে জাগিল না, শয্যায় বসিয়া মোহতন্দ্রাতে মুগ্ধ আছে দেখিয়া উষাসতী দুঃখ মনে প্রস্থান করিলেন, এবং মূঢ় জীবের জন্য দিনমণিকে অনুরোধ করিয়া নিজ ধামে প্রবিষ্ট হইলেন। অরুণসারথী সহিত সপ্তাশ্বরথে আরোহণ পূর্ব্বক তিমিরগর্ব্ব চূর্ণকারী তপ্তহেমাভ তপনদেব ক্ষণপরে গগনমার্গে উদিত হইলেন। তিনি যেন কর্কশ-বায়সকুলস্বরে চীৎকার করিয়া তিরস্কার করার জন্য সংসারী মূঢ় জীবকুল জাগিল। জাগিল বটে, কিন্তু জন্মাষ্টমীর উৎসব কেউ দেখিল না বা কৃষ্ণগোবিন্দ নাম কাহারও মুখ হইতে বাহির হইল না। বক্ষরক্ত পানকারী মায়ার পত্নী-পুত্রাদিকে ডাকিয়া তাহারা

পেট পূরণ কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এদিকে ভক্তগৃহে সেই নন্দোৎসবের অপার আনন্দ। পঞ্চামৃত-পান কৃষ্ণ-অধরামৃত-ভোজনকারী-ভক্তকুল মায়ারাজ্যের মধ্যেও স্বীয় তেজে নন্দোৎসব প্রকট করিয়াছেন। ভক্তগৃহদ্বার আজ পুষ্প-সমন্বিত সহকারপল্লবহারে শোভিত। ফলিত কদলীপাদপ তিলকযুক্ত রসাল-পত্র সহিত অপক্ক-নারিকেলশীর্ষ পূর্ণ-কুম্ভকে লইয়া তত্র পুলকিতভাবে দণ্ডায়মান। কুম্ভতলদেশে তিলযবধান্যাদি দুর্ব্বাদামসহ ও রাশীকৃত লাজাক্ষত যেন মূর্ত্তিময়ী অন্নদেবীরূপে ভক্তদ্বারদেশে নন্দোৎসব-দর্শন জন্য আসিয়াছেন; আলিপনা রচিত চক্রচিহ্নরূপে সুদর্শন চক্র, পদ্ম-চরণচিহ্ন অঙ্কিত সূত্রে পদ্মালয়া বৈকুণ্ঠবাসিনী নারায়ণকান্তা লক্ষ্মী চিরমনোরম গোপশিশুমূর্ত্তির আবির্ভাব উৎসবে যোগদান করিয়াছেন, সমুন্নত ধ্বজাকুল গগনমার্গে উড্ডীন হইয়া যেন সংসারকে এই বার্ত্তা জানাইতেছে। ভক্তপ্রাঙ্গনে দধিকাদার মহামোদ রহস্য! হরিদ্রা সংযুক্ত দধি ভাণ্ডে ভাণ্ডে আসিয়া তথায় পতিত হইতেছে, যেন ক্ষীরোদধি আসিয়া উপস্থিত হইল। খোল-করতাল-বাদনরত উৎসব-সঙ্গীত গানকারী ভক্তকুল তাহার উপর পতিত হইতেছে, নাচিতেছে ও পরস্পরে দধি উৎক্ষেপন পূর্ব্বক অঙ্গে মাখিতেছে, যেন মূর্ত্তিমান আনন্দকুল আজ নন্দোৎসবে সমাগত! সকলেই আসিয়াছে। বিশ্ব সংসারে সুখদাতা যত কাহারও আসিতে বাকী নাই। গায়করূপে গন্ধর্ব্ব, বাদকরূপে বিদ্যাধর, নর্ত্তকরূপে কিন্নর এবং সঙ্গীত অবতারণারূপে রাগরাগিণী উপস্থিত হইয়াছে। পুরাণপাঠকরূপে সূতগোস্বামী, শ্রোতারূপে ঋষিদেবগণ এবং ভক্তবৃন্দের প্রেমাশ্রুরূপে গঙ্গাযমুনা সমাগত। ভক্তগণের কণ্ঠস্থিত বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট সৌরভময় মালিকা-গুচ্ছরূপে বসন্তকাল, পুলকাকুল স্বেদপূর্ণ দেহরূপে গ্রীষ্ম, নয়নধারারূপে

বর্ষা, আনন্দ-হাস্যরূপে শরৎ, রোমাঞ্চরূপে হেমন্ত, কম্পনরূপে শীত ঋতু বিদ্যমান। আজ মূর্তিমান অগ্নিদেব যেন নন্দোৎসবের রন্ধনকারীরূপে বিবিধ পক্কান্ন, পুষ্পান্ন অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া জগৎপতির সেবাতে নিযুক্ত হইয়াছেন। মহাভাগ্যবান পনস-রসাল-দ্রাক্ষা-অংশুমৎফলা প্রভৃতি পাদপকুল স্ব স্ব সম্পত্তি দিয়া প্রভুর সেবা করিতেছেন। নরনারীকুল কেবলমাত্র দণ্ডবৎ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা যশোদাকুমার প্রাণবল্লভকে আনন্দ দিতেছেন। ভক্তগণ নন্দোৎসবলীলা কীর্ত্তন-গান করিয়া যে অপার আনন্দ ভোগ করিতেছে তাহাই সারাৎসার আনন্দ। কৃষ্ণভক্তিহীন মূঢ় সংসারী জীব তাহা পাইল না, অসার ভবিষ্যৎ দুঃখদায়ক সুখে মত্ত রহিল জানিয়া কীর্ত্তনগানের সময় মৃদঙ্গ তাহাদিগকে ধিক্কার দান সূচক 'ধিক তান্ ধিক তান্' বোল বলিয়া বাজিতেছে। সহযোগী বাদনশীল করতাল যেন মৃদঙ্গকে জিজ্ঞাসা ছলে বাজিতেছে 'কিম্ কিম্ কিম্'; অর্থাৎ হে মৃদঙ্গ! তুমি কাহাদিগকে ধিক্কার দিতেছ? তখন মৃদঙ্গ 'তান্ ধিক তান্ ধিক' বলিয়া যেন বাজিতে বাজিতে কহিল—

"যেষাং শ্রীমৎ যশোদাসুতপদকমলে নাস্তি ভক্তির্নরাণাম্,
যেষাং আভীরকন্যাপ্রিয়গুণকথনে নানুরক্তা রসজ্ঞা;
যেষাং শ্রীকৃষ্ণ ললিত লীলা গুণকথা সাদরে নৈব কর্ণৌ,
ধিক তান্ ধিক তান্ ধিগেতান বাদয়তি কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গ॥"

হে করতাল! কীর্ত্তনগানের এই মৃদঙ্গ তাহাদিগকে ধিক্কার সূচক 'ধিক তান ধিক তান' বোল বলিতেছে—

যে নরসকলের শ্রীমান্ যশোদাকুমার কৃষ্ণের চরণকমলে ভক্তি নাই, যাহাদের ব্রজগোপীগণের পরম প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা কহিতে শ্রদ্ধাহীনা কঠিনা ভাষা বিদ্যমান, এবং যাহাদের কর্ণযুগল শ্রীকৃষ্ণের

অতি মনোরম ব্রজলীলা না শুনিল, ধিক তার ধিক তার ! হে করতাল ! তাদের নরজন্মকে ধিক ! তাদের নরজন্মকে ধিক ! এইরূপে কীর্ত্তনের পরমানন্দ উপভোগ করিয়া ভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতময় মহাপ্রসাদাদি প্রাপ্তিতে উৎসুক হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ভক্ত কুটীর 'দাও দাও, ধর ধর, পাও পাও' এইরূপ ধ্বনিতে পূর্ণ হইল। সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত মহাপ্রসাদ পাইতেছেন। আর মধ্যে মধ্যে পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণ-মহিমাসূচক-পদাবলীর আবৃত্তি করিতেছেন; পুলকাকুল দেহে হাস্য করিতে করিতে সকলে রাধাকৃষ্ণের জয় দিতেছেন! এই ত সেই আনন্দ-বৃন্দাবন। এই ত সেই ব্রজগোপবালক ও গোপীবালিকা ভার-ধারী ভক্তবৃন্দ, যাহাদের গমনে-ভোজনে-বচনে সর্ব্বদা মনোমধ্যে রাধাকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি। এইরূপ সর্ব্বদা রাধাকৃষ্ণকে মনে রাখিলে ত এই দুঃখের সংসার সুখের হয়, গৃহে বসিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামও দেখিতে পাওয়া যায়। আজ মাসপতি ভাদ্রের এই জন্মাষ্টমী-জনিত-নন্দোৎসব-আনন্দ হইতে সাংবাৎসরিক কৃষ্ণলীলানন্দের বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে বপিত হইল। প্রেমভক্তি-বারিসিঞ্চনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত এই আনন্দতরু ভক্ত মানবকে সর্ব্ব সুখ দান করিবে। যে আনন্দ বীজ চির প্রফুল্লিত হইয়া মহাত্মা জনকে চিরসুখ-সমুদ্রে নিমগ্ন করে, সে বীজ একটি সুখ কল্পতরু বীজ, আর একটি সুখ কল্পলতা বীজ। সুখ কল্পতরু বীজ বপন হইয়াছে এবং তাহা হইতে আজ পঞ্চদশ দিনে সুখ কল্পলতা বীজ বপিত হইবে। সেই সুখ-কল্পলতা বৃষভানু-গোপরাজনন্দিনী কৃষ্ণমনমোহিনী শ্রীরাধা ভিন্ন আর কেহই নয়। মহাভাগ্যবান ভাদ্র মাস শুক্লপক্ষীয়া শ্রীরাধাষ্টমীকে সাদরে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক সৌভাগ্যের চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শুক্ল প্রতিপদ হইতে পঞ্চদশ দিনে যেমন চন্দ্রের পূর্ণত্ব প্রাপ্তি, সেইরূপ কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লা রাধাষ্টমী লইয়া ভগবদাবির্ভাব সুখের পূর্ণত্ব প্রাপ্তি

হইল। কৃষ্ণ আজ রাধাকে লইয়া প্রকৃত ভাবে ষোলকলায় পূর্ণ পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্র হইয়াছে, নতুবা হইত না। ভক্তগণ ভগবদাহ্লাদিনী পরমা নায়িকার শুভা আবির্ভাবাষ্টমী দেখিয়া দরদরধারে 'হা প্রেমময়ী রাধে' বলিতে বলিতে প্রেমাশ্রু মোচন করিতেছেন। আবার সেই শ্যামবল্লীজড়িত রসালতমাল-প্রভৃতি-কাননমধ্যে ভক্তকুটীরে রাধা-জন্মাষ্টমীর পূর্ণ প্রকাশ। আমার ভাষা কেমন করিয়া সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী বৃন্দাবনবিহারিণী প্রেমময়ী রাধার জন্মাষ্টমী আনন্দ বর্ণণ করিবে! যে আনন্দ বর্ণনা করিতে আদি কবি ব্রহ্মা তপস্বী, শঙ্কর যোগী, তথাপি প্রেমানন্দে মূকের ন্যায় যাহা কথনে অক্ষম, তাহা আমি কেমন করিয়া বর্ণনা করিব! তবে যে করুণাময়ীর কৃপাদৃষ্টি মূককেও বাচাল করে সেই পরাবিদ্যারূপিণী রাধার কৃপাতে আমি এই মাত্র বলি যে—প্রেমময়ী শ্রীরাধার শুভ আবির্ভাবে জগৎ সংসার পূর্ণ-আনন্দসাগরে আজ মজ্জমান। বিশ্ব সংসার শ্রীরাধাষ্টমীজনিত হর্ষ লহরীতে সমাচ্ছন্ন। তটিনী 'রাধা রাধা' বলিয়া প্রবাহিতা, সিন্ধু 'রাধা রাধা' বলিয়া পুলকে উচ্ছ্বসিত! কাননবিহঙ্গ রাধা বলিয়া গাহিতেছে, তরুলতা রাধা বলিয়া দুলিতেছে, রাধা বলিয়া পুষ্পনিচয় হাসিতেছে এবং নীলাকাশ-কোলে কৃষ্ণ-কোলে গৌরাঙ্গী রাধাবর্ণ-উদ্দীপনকারী দিবাপতি রাধা বলিয়া জগৎ আলো করিতেছে। অখিলব্রহ্মাণ্ড আজ রাধা মন্ত্রে দীক্ষিত হইল। তাহা না হইলে বা সুখের মুখ কেমন করিয়া দেখিবে! রাধাষ্টমীর চন্দ্রমা আজ গগনপ্রাঙ্গনে নিশাদেবীকে রাধা নাম শুনাইতেছেন। ভক্ত ঋষিকুল এই রাধাষ্টমী ব্রত ভক্তজনের সম্বল জানিয়া ভোজনাদির চিন্তা-শূন্য-মানসে নিজ নিজ কুটীরে সেই গহ্বর-কুঞ্জ-সমন্বিত-বরসানুগিরির তটদেশে মণিময় বৃষভানুপুরের প্রকাশ করিতেছেন। যেমন প্রকাশ হইল, অমনি বৃষভানু রাজমহিষী

কীর্ত্তিদা মাতার কোলে সর্ব্বারাধ্যাকে দর্শন পূর্ব্বক ভক্তগণ কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রজগোপীর ন্যায় কহিতে লাগিলেন—

"শুনো বৃষভানুপ্রিয়ে :—

কেমন করিয়া কোলেতে ধরেছ
এমন সোনার ঝিয়ে।
এ কন্যা ত নয় সুখের নিলয়
মিটায় সকল বাধা।
ভবক্ষুধা হরা, নামটি ইহার
অতি সুমধুর রাধা॥"

মাসপতি ভাদ্র! তুমিই ধন্য! যে রাধাকৃষ্ণের অমৃত-প্রেমানন্দময়ী স্মৃতি স্ত্রীপুরুষের চিরসুখের পথ প্রদর্শন করিবে' সেই দুটি নয়নমণি যুগলমণির আকরস্বরূপ তুমি। তুমি যেমন চির-সুখ-পূর্ণ রাধাকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথি নিজ মধ্যে গ্রহণ পূর্ব্বক বহু ফলশস্যপাদপযুক্ত রসময় হইয়া জীবের কল্যাণকর হইয়াছ, সেইরূপ তোমাকে দেখিয়া মূঢ় জীবকুল নিজ মধ্যে এই যুগল চাঁদের স্মৃতি-গ্রহণ-পূর্ব্বক সর্ব্বগুণ যুক্ত ও রসিক হইয়া সংসার দুঃখ হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হউক। তোমাকে দেখিয়া গীতার সেই মহা বাক্য সকলের কর্ণপটহে প্রতিধ্বনিত হউক; করুণানিধি কৃষ্ণ শ্রীমন্ অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছিলেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজঃ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়্যামি মা শুচঃ॥"

তুমি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সুখদাতা যে আমি কৃষ্ণ, সেই আমাকে আশ্রয় লও; অর্থাৎ কায়মনোবাক্যের দ্বারা আমার দাসত্ব

কর, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মোচন করিব; তুমি কোন চিন্তা করিও না। কে আছে জগৎ! এমন দয়ার ঠাকুর কৃষ্ণকরুণানিধি ভিন্ন এ জগতে আর কে আছে যে,—পাপের বোঝা নিজেই গ্রহণ পূর্ব্বক মুক্ত করিবে! এখন কায়মনোবাক্যের দ্বারা সেই জীবনে মরণে বন্ধু প্রিয়তমের চরণে প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক সকলে বল—

"নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধরসুধাপানশালিনে বনমালিনে॥"

প্রবন্ধের পূর্ব্বার্দ্ধে সর্ব্বেশ্বর করুণানিধি শ্রীকৃষ্ণের যে জগৎরূপে পরিণতি কহা হইয়াছে, সেই পরিণতি কেমন, উত্তরার্দ্ধে তাহার বিশেষ আলোচনা করা হইতেছে। অনেক মোহ-মুগ্ধ জীব মনে করিতে পারে যে, কৃষ্ণ যখন জগৎরূপে পরিণত, তখন জীবের যেমন সুখ-দুঃখ স্বর্গ-নরক ভোগ আছে, সেইরূপই কৃষ্ণের আছে। সেই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ভিন্ন আর কিছুই নয় জানিবে। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা এ বিষয়ের মীমাংসা করা হইতেছে। পরিণতি শব্দের অর্থ পশ্চাতে যে বিপরীত রূপ প্রাপ্তি; যেমন চর্ম্ম আবৃত মনুষ্যদেহে চর্ম্মের পরিণতি কেশ, রোম, নখ প্রভৃতি, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় কৃষ্ণ করুণানিধির পরিণতি জগত ও জীব প্রভৃতি। নারীর অন্যাধারে স্থিত পদ-লম্বিত কেশের উপর আঘাত করিলে যেমন সেই নারীর কোন আঘাত লাগে না, কিন্তু সীমন্ত-আশ্রিত কেশের উপর আঘাত করিলে রমণীকে আঘাত লাগিবে, সেইরূপ ভগবানে আশ্রিত জীবের উপর আঘাত করিলে, ভগবানের অঙ্গে আঘাত লাগে, আর অন্য-আধারস্থিত কেশের তুল্য মায়া-আধারে স্থিত জীবের উপর যে দুঃখাদি-ভোগ তাহা ভগবানের লাগে না। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা এইরূপ বিচার আসে যে, জগৎরূপে পরিণতি প্রাপ্ত জগদীশ্বর

সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দরূপ, তাঁহার কোন দুঃখাদি নাই। প্রিয় ভক্তের যে দুঃখ তাহাই তাঁহার দুঃখ; ভক্তের দুঃখ মোচন করিতে তিনি সর্ব্বদা চেষ্টিত। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ অনুভূত হয় যে, সমীপস্থ বেলাভূমির দূষিত বস্তু সমুদ্র নিজ তরঙ্গকরে ধৌত করেন, কিন্তু বেলাভূমির পরবর্ত্তী ভূভাগের দূষিত বস্তুকে তিনি নাশ করেন না; সেইরূপ ভগবানের সমীপস্থ জীবের দুঃখ নাশ ভগবান স্বভাবতঃ করিতে থাকেন, মায়া আশ্রিত জীবের দুঃখকে তিনি তেমন নাশ করেন না। তবে সমুদ্র প্লাবিত হইয়া যেমন কোন সময়ে সর্ব্ব জগৎকে ধৌত করেন, সেইরূপ কোন সময়ে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া মায়া আশ্রিত জীবকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন; এই জন্য চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন—

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামী রূপে শিখায় আপনে॥"

অর্থাৎ ভাগ্যবান কোন জীবকে কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন, তবে ওই কৃষ্ণ অন্তর্য্যামী গুরুরূপ হইয়া জীবের মন-দুঃখ-নাশক-শ্রীকৃষ্ণ ভজনপ্রণালী শিক্ষা দেন। যিনি কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি-সাধনে নিযুক্ত, এমন কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা গুরুই গুরু বলিয়া জানিবে। এমন গুরুকে আশ্রয় করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই জীবকে দর্শন দিয়া চির-সুখ-সাগরে নিমগ্ন করেন। কৃষ্ণগত মন গুরুদেবের মহিমা কেমন, তাহা করুণানিধি নিজের সখা সুদামা ব্রাহ্মণকে কহিতেছেন, যথা—

"সবৈ সৎ কর্ম্মনাং সাক্ষাদ্দ্বিজাতেরিহ সম্ভবঃ।
আদ্যোহঙ্গ যত্রাশ্রমিনাং যথাহং জ্ঞানদোগুরু॥
নন্বর্থ কোবিদা ব্রহ্মণ্ বর্ণাশ্রমবতামিহ।
যে ময়া গুরুণাবাচা তরন্ত্যঞ্জভবার্ণবম॥

নাহমিজ্যা প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ।

তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরু শুশ্রূষয়া যথা ॥”

—ইতি শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থাৎ হে সখে! এই জগতে যাহা হইতে সম্ভব (উৎপত্তি) হয়, সেই পিতা আদ্য গুরুরূপে পূজনীয়। কিন্তু দ্বিজাতি (উপনয়ন বা দীক্ষা গ্রহণের পর মানব চৈতন্য রাজ্যে গমন করিতে উন্মুখ হয় মায়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া, অতএব উপনয়ন বা দীক্ষার পর সকলেই নূতন জীবন গ্রহণ করার জন্য দ্বিজাতি নামে কীর্ত্তিত হয়) এইরূপ হবার পর যাহা হইতে আশ্রমীদের মদ্বিষয়ক সৎকর্ম্ম সকলের সম্ভব হয়, সেই মদ্বিষয়ক জ্ঞান-দাতা যে গুরু, তিনি আমার তুল্য পূজনীয়। অর্থাৎ প্রথম জন্ম-দাতা পিতা যে গুরু তাহা হইতে মদ্বিষয়ক জ্ঞানদাতা যে গুরু তিনি অধিক পূজনীয়, আমার ন্যায় পূজনীয় জানিবে। এই জগতের মধ্যে তাহাদিগকে উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে পণ্ডিত জানিবে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন-কারীদের মধ্যে তাহারা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান মানব, যাহারা গুরুরূপী আমার বাক্যকে আশ্রয় পূর্ব্বক অনায়াসে ভবসাগর পারে গমন করিতেছে। এই জগতে প্রজাতির দ্বারা (উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম-যাজন দ্বারা), যজ্ঞ, তপস্যা, উপশম (ইন্দ্রিয় সংযম) এই সব কার্য্যের দ্বারা আমি তেমন সন্তোষ লাভ করি না, শ্রীগুরু সেবা দ্বারা সকল ভূতের আত্মা-স্বরূপ আমি যেমন সন্তুষ্ট হই। চৈতন্যচরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী মায়াজাল-বদ্ধ-জীবের মুক্ত হইবার উপায় কহিতেছেন; যথা—

“তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।

মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥”

অর্থাৎ গুরুর সেবা দ্বারা যখন গুরুমুখে কৃষ্ণতত্ত্ব জীব জ্ঞাত হয়,

তখন কৃষ্ণ সর্ব্বসুখদ করুণানিধি জানিয়া তাঁহাকে ভজন করে, তাহা হইতে মায়াজাল মুক্ত হয়, কৃষ্ণের চরণও পায়। কৃষ্ণের পরিণতি জীবের দুঃখাদি সংঘটন হইলে, সেই দুঃখাদি কৃষ্ণের সংঘটন কখনই সম্ভব নয়। কৃষ্ণ এক সরোবর তুল্য, জীব তাহাতে উৎপন্ন অসংখ্য বিম্ব তুল্য। বিম্বের বিনাশে সরোবরের যেমন কিছুই হানি নাই, সেইরূপ জীবের দুঃখে কৃষ্ণের কোন দুঃখ নাই। অনেকে মনে করিতে পারে যে, জীবের যে দুঃখ সেই দুঃখ যদি কৃষ্ণের সম্ভব না হইল, তবে কৃষ্ণ যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করেন কেন? অবতার গ্রহণ ত দুঃখ মোচনের জন্য। তবে জীবসম্ভব দুঃখ কৃষ্ণে কেন সম্ভব হইবে না? কিন্তু এ বিষয়ে একটু মাত্র বিচার করিলে জানা যায় যে, জীবসম্ভব দুঃখ কৃষ্ণে সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া তিনি অবতার গ্রহণ করিতেছেন তাহা নহে। ধনী-দাতা মানব ক্ষুধার্ত্ত ভিখারীকে ভোজন দেন, তাহাতে সেই ভোজন-দাতা ধনী মানব যেমন ক্ষুধার্ত্ত ভিখারী হয় না, সেইরূপ দুঃখী জীবের দুঃখ দূর করেন বলিয়া কৃষ্ণ জীবের ন্যায় দুঃখী হইতে পারেন না। তবে তিনি ভিন্ন জীবের দুঃখহারীও আর কেহ নাই ইহা চির সত্য। দয়ালু ধনী মানবের দরিদ্রভোজন-দানের ন্যায় সর্ব্ব-লক্ষ্মীময়ী রাধাপতি করুণানিধি কৃষ্ণ আমার জীব-দুঃখ দূর করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টিত। জীবরূপে পরিণতি প্রাপ্ত ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ গোপবেশ-বেনুধারী মূর্ত্তির কোন হ্রাস বৃদ্ধি নাই; নিত্য সমভাবে অবস্থিতি; এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ চৈতন্যচরিতামৃতকার প্রমাণ দিতেছেন, যথা—

"অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥

তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥
নানা ধনরত্ন হয় চিন্তামণি হইতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি ইথে কি বিস্ময়॥"

—ইতি চৈতন্যচরিতামৃত।

কোন কোন মহাজন জীবকে যে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া থাকেন, তাহা সম্পূর্ণ-দেহের কেশ-রোম-নখ প্রভৃতি যেমন অংশ, সেইরূপই জানিবে। এখন ঈশ্বর-অংশ জীবের কষ্ট হবার কারণ কি? ইহার মীমাংসা এই যে, জীব মায়ার আশ্রিত বলিয়া দুঃখভোগী হইয়াছে। মায়া ঠিক প্রতিবিম্বের ন্যায়। দেহের সঙ্গে ছায়ার যে সম্বন্ধ সেইরূপ ঈশ্বরের সহিত মায়ার নিত্য সম্বন্ধ। প্রতিবিম্ব মূর্ত্তি আশ্রয় করিলে যেমন কোনই সুখ পাওয়া যায় না, সেইরূপ ঈশ্বরকে ভুলিয়া ঈশ্বরের প্রতিবিম্বরূপিনী মায়াকে আশ্রয় করিলে,জীবের দুঃখ ভিন্ন সুখ কখনই হয় না। শ্রীপাদ চৈতন্যচরিতামৃতকার স্বীয় গ্রন্থে এই সম্বন্ধে কহিতেছেন, যথা—

"কৃষ্ণে ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় তারে নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যথা নদীতে চুবায়॥"

তিনি আরও বিচার পূর্ব্বক কহিতেছেন যে, জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, যথা—

"কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।"

তটস্থ লক্ষণের অর্থ এইরূপ হয় যে, কোন বস্তুর পার্শ্বে যে স্থিতি তাহাই তটস্থ লক্ষণ জানিবে। এক পার্শ্বে কৃষ্ণ, আর পার্শ্বে মায়া, মধ্যস্থলে জীবের অবস্থান। এই জন্য সে কখন কৃষ্ণকে, কখন মায়াকে দেখে। যখন কৃষ্ণকে দেখে, তখন দুঃখ শেষ; যখন মায়াকে দেখে তখন দুঃখ আরম্ভ। জীবের কাছে মায়ার আদরের কারণ এই যে, মায়া একটি; আর কেশ-রোমাদির ন্যায় পরিণতি প্রাপ্ত জীব অনেকটি। এই হেতু বহু লোকের কাছে যেমন একটি বস্তুর আদর, সেইরূপ বহু জীবের কাছে একটি মায়ার এত আদর। কৃষ্ণ এক এবং তাঁর প্রতিবিম্বরূপিনী মায়াও এক। অতএব তার কাছে মায়ার আদর নাই, অনাদরও নাই। তিনি মায়া দেখেন মাত্র, তাহাতে আসক্ত হন না; এই জন্য তিনি মায়ামুক্ত চিরসুখী। জীব মায়া আসক্ত, সেই জন্য মায়াবদ্ধ অতএব চির দুঃখী। সুখ তার তখন হইবে যখন সে তার নিজের সুখদায়ক স্বরূপ অবগত হইতে পারিবে। সেই সুখ-দায়ক স্বরূপ কি? এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী স্বীয় চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে কহিতেছেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।"

এই আমি যে "কৃষ্ণদাস" এই সুখের সম্বন্ধ জীব যখন ভুলিয়াছে, তখনই মায়া তাকে বন্ধন করিয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃত তাই বলি-তেছেন—

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥"

এই মায়া দ্বারা বদ্ধগল জীবের সংসার ত্রিতাপজ্বালার ভোগ নরকাদি-দুঃখ-সংঘটন; মায়ামুক্ত কৃষ্ণের ও তদাশ্রিত জনগণের কোন

দুঃখাদি ভোগ নাই। আহা বিকার প্রাপ্ত মানব মূর্ত্তি দেখিয়া মানব তুমি ভুলিয়া আছ, একবার অবিকৃত যথার্থরূপ ওই সচ্চিদানন্দ মানব মূর্ত্তি কৃষ্ণ করুণানিধিকে দেখ দেখি, তুমি কি অপার সুখ পাইবে তাহা কথনের যোগ্যতা কাহারও নাই। যাঁর ছায়া স্বরূপা মায়াকে দেখিয়া তুমি পাগল হইয়াছ, তাঁর স্ব মূর্ত্তি ওই কৃষ্ণরূপ দেখিলে তুমি না জানি কি অপূর্ব্ব সুখে সুখী হইবে, তাহা কে বর্ণন করিবে? এক জল ভিন্ন আধারে স্থিত হইয়া যেমন ভিন্ন ভিন্ন নাম—কূপজল, নদীজল, কলসীর জল—নামে পরিণত হয়, সেইরূপ এক মায়া বিভিন্ন স্থান হইতে অর্থ-মায়া, পুত্রাদি-মায়া, পত্নী-মায়া নাম-ধারণ-পূর্ব্বক জীবের নিকট বহুধা প্রকাশ হইয়া, তাহার সংসার ক্লেশের কারণ হয়। মায়াকে পশ্চাতে রাখিয়া কৃষ্ণের দিকে লক্ষ্য রাখিলে, মায়ার প্রভাব হ্রাস হয়, সুখধাম যাবার উপায় হয়, শেষে মায়া তুচ্ছা বলিয়া জীবের উপেক্ষণীয়া হইতে থাকে। মায়া উপেক্ষণীয়া হইলে জীব নিত্য সুখের ভাগী হইবে। মিথ্যা বস্তু সত্যরূপে প্রকাশের নাম মায়া। সঙ্গের সাথী যখন কেহ নয়, তখন তাহাদিগকে পরম প্রিয় বলিয়া মনে করা রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় মিথ্যা ভিন্ন আর কি হইবে, এবং ইহাই ত সংসার মায়া। কৃষ্ণ যে ভঙ্গীতে চলেন, মায়া তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়া মূর্ত্তি বলিয়া সেই ভঙ্গীতে চলে, এই জন্য মায়া কৃষ্ণের অনুগামিনী অধীনা দাসী, কৃষ্ণ বিভিন্নরূপে মায়াপরিচালক, অতএব মায়াপতি। পতির নিকট নারীর প্রভুত্ব যেমন থাকে না। সেইরূপ কৃষ্ণের কাছে মায়া অন্যের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। কবিরাজ গোস্বামী স্বীয় গ্রন্থে এ সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

"কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাই মায়ার অধিকার॥"

যেমন মনুষ্য দেহের দুই রকম প্রতিবিম্ব অনুভূত হয়, নির্ম্মল বস্তুতে মূর্ত্তি প্রকাশকারী দর্পনাদিতে যে প্রতিবিম্ব তাহাই প্রতিবিম্ব, আর সমল বস্তুতে মূর্ত্তি অপ্রকাশকারী, যেমন মৃৎভিত্তিতে পতিত যে প্রতিবিম্ব, ইহা নরসমাজে ছায়া নামে পরিচিত। ছায়া প্রতিবিম্ব যথার্থই এক হইলে আধার বিশেষে বিভিন্নরূপা। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্বরূপিণী এই মায়া দ্বিধাকারে অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা দুই নামে অভিহিতা। অন্তরঙ্গা মায়া শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশকারিণী প্রতিবিম্বরূপা যোগমায়া নামে অভিহিতা; আর বহিরঙ্গা মায়া শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকাশকারিণী ছায়ারূপিণী দূরত্যয়া সংসার মায়া। নির্ম্মলচিত্ত জনগণ যোগমায়া আশ্রিত কৃষ্ণে উন্মুখ; সমলচিত্ত ব্যক্তিরা বহিরঙ্গা মায়া-আশ্রিত কৃষ্ণ-বিমুখ, স্বতঃসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণধাম হইতে দূরে নৈমিত্তিক-সিদ্ধ সংসার-ক্ষেত্রে থাকার কারণ চিত্ত সমল হইয়াছে; গোমুখীর নিকট প্রবাহ যতই বেগবান হউক না কেন, সেইখানে গঙ্গা-নীর সমল নয় দূরে যত আসিয়াছে, ততই আবিলতা-পূর্ণ হইয়াছে এইরূপ বুঝিবে। এই বহু দুঃখে যাহার পার হওয়া যায় এমন যে দুস্তর্য্যা মায়া, এই মায়ার হাত হইতে জীব কিসে মুক্ত হইবে, তৎসম্বন্ধে করুণানিধি কৃষ্ণ গীতাতে সখা অর্জ্জুনকে যাহা কহিয়াছেন তাহা এইরূপ—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতান্তরন্তিতে ॥"

অর্থাৎ হে সখে! হে অর্জ্জুন! আমার এই দৈবী গুণময়ী মায়া এমন দুস্তর্য্যা যে উহার হাত হইতে জীবের মুক্তি হওয়া বড়ই কঠিন বিষয়। কিন্তু মায়ার হাত না এড়াইলে, জীবের দুঃখ যাইবে না, আমাকেও পাইবে না, এই জন্য মায়া এড়াইবার উপায় শ্লোকার্দ্ধে প্রকাশ করিতেছেন; যে আমাকে কায়-মনোবাক্যে আশ্রয় করিবে, সে এই

দুস্তর-মায়া হইতে পার পাইবে। সমল চিত্তকে নির্ম্মল করিবার উপায় শ্রীপাদ তুলসীদাসজী কহিতেছেন, যথা—

"শ্রীগুরুচরণসরোজরজ, নিজ মনমুকুর সুধার।
বরণো রঘুবর বিমল যশ, জোদায়ক ফল চার॥"
—ইতি তুলসীরামায়ণ।

ইহার অর্থ এই যে শ্রীগুরুচরণ-কমলের পরিমল দ্বারা সংসার-বাসনারূপ মলযুক্ত মন-দর্পণকে শোধন করিয়া চতুর্ব্বর্গ ফলদাতা অমল কীর্ত্তি রাম-চরিত্র বর্ণন করিব। অতএব কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা শ্রীগুরুকে আশ্রয় করো, সমলচিত্ত নির্ম্মল হইবে, করুণা-নিধি কৃষ্ণকেও পাইবে। কৃষ্ণভক্ত গুরু ভিন্ন উদ্ধারকর্ত্তা বান্ধব, সুখদাতা পরম কৃপাময় আর নাই। বিষয়-বাসনাযুক্ত, নানা দেব পূজাকারী জীবকে বান্ধব বলিয়া আশ্রয় করা নিতান্ত অনুচিত; বিষ্ণু রহস্য নামক গ্রন্থে শাস্ত্রকার কহিতেছেন—

"আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যাল-ব্যাঘ্র জলৌকসাম্।
ন সঙ্গ শল্য যুক্তানাং নানা-দেবৈকসেবিনাম্॥"

অর্থাৎ বিষধর সর্পের এবং হিংস্র ব্যাঘ্রকুম্ভীরাদির আলিঙ্গন করা সে বরং ভাল, তথাপি নানা দেব-উপাসনাকারী শেলধারী ব্যাধের তুল্য মানবের সহিত অবস্থান করিও না। কৃষ্ণভক্তিহীন বৈষ্ণবাচার-রহিত সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও তাহার কথা শুনিতে নাই; এ সম্বন্ধে পদ্ম-পুরাণ কহিতেছেন—

"অবৈষ্ণবস্য পাণ্ডিত্যং সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বিতং।
বাক্যং তস্য ন গৃহ্নীয়াৎ শুনালীঢ়ং হবির্যথা॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভক্তিহীন বৈষ্ণবাচার রহিত মানব সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও তাহার নিকট শাস্ত্রের উপদেশ কুকুর উচ্ছিষ্ট ঘৃতের ন্যায় গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। এমন কৃষ্ণভক্তি-বৈষ্ণবধর্ম্ম পালনহীন জনেরা যত কিছু করে সব মিথ্যা ; এ সম্বন্ধে বৃহন্নারদীয় পুরাণ প্রমাণ দিতেছেন—

"কিম্বেদৈঃ কিমুবা শাস্ত্রৈ কিমু তীর্থ নিষেবনৈঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ ॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভক্তিহীনেরা চারি বেদ অন্যান্য শাস্ত্র পড়িয়া, সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ, অথবা যজ্ঞ তপস্যা করিয়া দুঃখ বই সুখ কোন কালে প্রাপ্ত হয় না ; এ সব করিয়া তাহাদের ফল কি ? কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবের অপূর্ব্ব মহিমা সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ প্রমাণ দিতেছেন—

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা,
বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং
যেষাং কুলে বৈষ্ণব নামধেয়ঃ ॥"

অর্থাৎ যে কুলে বৈষ্ণব হইয়াছে সেই কুলের পিতৃলোক সকল স্বর্গে নাচিতে থাকেন "আমাদের কুলে কৃষ্ণভক্ত ভাগবতের আবির্ভাব হইয়াছে" বলিয়া, এবং যার গর্ভে সেই কৃষ্ণভক্তের উৎপত্তি সেই জননী কৃতার্থা মহা পুণ্যবতী রত্নগর্ভা ; সেই কৃষ্ণভক্ত ভাগবত যেখানে অবস্থান করেন, সেই পৃথিবীও ধন্যা ; সেই কুলও পবিত্র হইয়া থাকে, যে কুলে কৃষ্ণ-ভক্তের আবির্ভাব হয়। এমন কৃষ্ণভক্তি বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দানযজ্ঞ যতই করিবে, ততদিন পিতৃকুল প্রেতলোকে থাবার

না পাইয়া, পিণ্ড পাবার আশায় সংসারে হা করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকে ; এ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ প্রমাণ দিতেছেন—

"তাবদ্ ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ডতৎপরাঃ।
যাবৎ কুলে ভক্তিযুক্ত সুতো নৈব প্রজায়তে ॥"

অর্থাৎ পিণ্ড পাবার আশায় পিতৃকুল তত দিন সংসারে ঘুরিবে, যত দিন কুলে কৃষ্ণভক্ত পুত্র উৎপন্ন না হইবে। এখন কৃষ্ণভক্তিহীন হইয়া শ্রাদ্ধাদি পূর্ব্বক পিণ্ড দেবার জন্য পিতৃলোককে যমলোকে ও সংসারে ভ্রমণ করাণই কি সুপুত্রের কাজ? না কৃষ্ণভক্ত হইয়া চির সুখপূর্ণ অভাব রহিত গোলক বৃন্দাবনে মাতৃ-পিতৃকুলকে পাঠানো সুপুত্রের কাজ? মায়ামুগ্ধ জীব! তুমি যাই বল না কেন, আমি ত জানি, কৃষ্ণভক্তি বৈষ্ণবাচার রহিত হইয়া যত দানযজ্ঞশ্রাদ্ধাদি করো সব ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল জানিবে। শ্রদ্ধা সহকারে গয়া শ্রাদ্ধাদির দ্বারা পিতৃকুল, যম-লোকস্থিত সংসার পুণ্যকারীদের যে অনিত্য সুখ স্থান সেইখানে থাকিতে সক্ষম হয়; কিন্তু নিত্য সুখময় বৈকুণ্ঠ গোলক-বৃন্দাবনে যাইবার সামর্থ্য সদাচার-বিশিষ্ট কৃষ্ণভজন ভিন্ন হ'বার উপায় আর নাই। পদ্মপুরাণ প্রমাণ দিতেছেন—

"হরিনাম পরোযস্তু বিষ্ণুপূজাপরায়ণঃ।
কৃষ্ণমন্ত্রং যো গৃহ্লাতি বিষ্ণুং জানাতি বৈষ্ণবঃ ॥"

তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে যিনি সদা হরিনাম করেন, শ্রীবিষ্ণুর পূজা যাঁহার আশ্রয়, যিনি কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুরূপী-কৃষ্ণকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া জানিয়াছেন, ইহা ভিন্ন সকলেই অবৈষ্ণব। এই বৈষ্ণব ঠাকুর সংসার মুক্তির কারণ জানিয়া, নারদ পঞ্চরাত্র প্রমাণ দিতেছেন—

"বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরং নির্ব্বাণ হেতুনা।
পরং নির্ব্বাণ হেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনম্ ॥"

বৈষ্ণবে কন্যাদান সংসার-মুক্তির একটি প্রধান কারণ, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন আর একটি মুক্তির প্রধান কারণ। কৃষ্ণ-ভক্তের এমন গৌরবের কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, সর্ব্বেশ্বর সব্ব-বন্ধন-মোচনকারী ভগবানকে পূর্ণ রূপে তাঁহারাই অধিকার করিতে পারেন, এই হেতু ভগবানে পূর্ণ-অধিকারী-জনগণে যে কোন প্রকারে আশ্রিত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে কল্যাণজনক। তাই শাস্ত্রকার উচ্ছিষ্ট-ভোজন কন্যাদান-বিধান করিতেছেন। আমার ভক্তেরাই আমাকে পাইবে; আমি সকলের হইলেও আমাকে আর কেউ পাইবে না, এই প্রতিজ্ঞাবাক্য ভক্তবৎসল করুণানিধি কৃষ্ণ শ্রীমন্ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন; শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতার সপ্তম অধ্যায়ে—

"অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্;
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥"

অর্থাৎ সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধিবিশিষ্ট দেব-পূজক-জীবগণের ফল বিনাশ-শীল, ক্ষুদ্র দেব-পূজাকারীরা কিছুদিন পরে যাহার নাশ হইবে সেই ক্ষুদ্র দেবলোকে গমন করে, আর আমার ভক্তেরা জন্মমরণ রহিত সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ নিত্যধামে গমন করে। করুণানিধি কৃষ্ণ মূঢ় জীবগণের উদ্দেশে আরও অধিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া গীতার এই অধ্যায়ে কহিতেছেন—

"অব্যক্তংব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥"

অর্থাৎ সেই মন্দ বুদ্ধিরা অব্যক্ত-স্বরূপ আমাকে প্রকাশমান মৎস্য-কূর্ম্ম-মনুষ্য-মূর্ত্তি বিশিষ্ট দেখিয়া সাধারণ দেবতার ন্যায় অন্য দেবতা

বলিয়া মনে করে, আমি যে সেই মৎস্য-কূর্ম্ম-মনুষ্যাদি মূর্ত্তিতে অক্ষয়, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সচ্চিদানন্দরূপ, ইহা কেবল আমার ভক্তেরাই অনুভব করেন। অসীম সর্ব্বশক্তিমান সুখদাতা আমি সসীম হইয়া মনুষ্যাদি মূর্ত্তি ভক্তকে সুখ দেবার জন্য ধরিয়াছি, এবং সেই মৎস্যকূর্ম্মাদি-রূপমধ্যে আমার মনুষ্যরূপ বৃন্দাবনবিহারী যে গোপাল-মূর্ত্তি তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বিষয়-বুদ্ধি-বিশিষ্ট দেব-পূজকেরা তাহা বোঝে না। শীঘ্র ফলদাতা দেব-দেবী-ভূত-যক্ষাদিকে অর্থপুত্রাদি পাবার আশায় পূজা করে, তথাপি সর্ব্ব সুখদাতা আমাকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে না। আমি যে ভক্ত সাধুগণের রক্ষার জন্য যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করি, সেই প্রিয় ভক্ত কথিত যুক্তিতে যে সংসারাসক্ত অল্প বুদ্ধি জীবকুল চলে না, তাহাদের গতি কি? ইহা করুণানিধি কৃষ্ণ গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে চারিটি শ্লোকে প্রকাশ করিতেছেন, যথা—

"আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধন-মান-মদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্ম পরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কা॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥"

অর্থাৎ মম প্রিয় ভক্ত সাধু জনের বিচারাদি না শুনিয়া, নিজের মনে যাহা জন্মিয়াছে সেই জ্ঞান দ্বারা অবিনীত, ধনমানমদমত্ত মূঢ় নরকুল অহঙ্কার পূর্ব্বক বিধান রহিত যজ্ঞাদি করে। সে নাম মাত্র যজ্ঞ, কেননা

সে যজ্ঞে আমার কৃপা হওয়া অসম্ভব। আমার কৃপা যে যজ্ঞে নাই, কেবল মূঢ় লোককুলের আদরণীয় যাহা, তাহা নামযজ্ঞ বলিয়া জানিবে। সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর আমি হরি যে যজ্ঞে কৃপা করিব, সেই যজ্ঞকারীর তখন প্রেম, দয়া, সর্ব্বজীবে ভালবাসা প্রভৃতি আসিবে। কিন্তু রাজসিক তামসিক ভাব ( অন্য বস্তুতে যে অভিলাষ, ইহাই রাজসিক ভাব ; অভিলষিত বস্তু পাইয়া পুনঃ পুনঃ তাহা পাইবার যে বাসনা, ইহাই তামসিক ভাব ) যজ্ঞ হেতু বিশুদ্ধসত্ত্ব বাসুদেব আমি সেই যজ্ঞে উপস্থিত হই না, কেননা আমার সাধু ভক্তের বিধান রহিত সেই যজ্ঞ। অতএব সেই যজ্ঞকারীদের হৃদয় মায়িক, অহঙ্কার, বল, গর্ব্ব, কাম, ক্রোধাদি পূর্ণরূপে আশ্রয় করিতে থাকে ; তাহাতে সেই বিষয়ী যজ্ঞকারীরা বিশ্বব্যাপী যে আমি সর্ব্ব দেহে বিদ্যমান, তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া এ আমার নিজের, ও পরের এই ভাব বশতঃ কাহাকে পীড়ন, সংহার, কাহার প্রতি বা দোষারোপ করিতে থাকে ; সেই নরাধম জীবদ্রোহকারী নিষ্ঠুর মানবকে আমি সর্ব্বদা গুণের আধিক্যানুসারে আসুর যোনি সিংহব্যাঘ্রশৃগালকুক্কুরগৃধ্রসর্প প্রভৃতি যোনিতে নিক্ষেপ করি। সেই মূঢ় জীবকুল আসুরযোনিগত হইয়া, আমাকে অপ্রাপ্তি হেতু জন্মে জন্মে অসুর স্বভাব বশতঃ হে কৌন্তেয়! তারপর অধমগতি কৃমিকীটযোনি প্রাপ্ত হয়। আহা অর্জ্জুন! বিষয়মদমত্ত মানুষ জীবহত্যা যে মহাপাপ শুনিয়াও শোনে না। বেদ বিহিত যে ধর্ম্ম তাহা মুখে মাত্র মানিয়া থাকে, বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য যে অহিংসা, তাহা সে মূঢ় জীববৃন্দ না মানিয়া নিজকে বলশালী সুখী করিবার জন্য দেবতার নিকট নিরীহ পশুবলিদানপূর্ব্বক অসুরবৃত্তি চরিতার্থ করে ; সুখী হবার ভুল পথ ধরিয়া সে চিরদুঃখপূর্ণ অন্ধকারের পথে পতিত হয়। এখানে করুণানিধি কৃষ্ণের এই গীতা বাক্যানুযায়ী দেব

উদ্দেশ্যে পশু হত্যা হরিভক্ত সাধু বিহিত বেদধর্ম্ম নয়, আর নিত্য খাদ্যরূপে জীব হত্যা ইত্যাদি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকারের যে বিধান নয়, তাহা বেশী আর কি বলিব। তবে দেশকালপাত্র-অনুসারে মৎস্যাদি ভোজনের যে বিধান কোন কোন শাস্ত্রকার যদি আদেশ করেন, তাহা বিধি মার্গে "এই তিথি মৎস্য ভোজন, এই তিথি ভোজন নিষেধ" এমন ভাবে করিয়াছেন। এই বিধিমার্গে মৎস্যাদি ভোজন পূর্ণরূপে মৎস্যভোজন নিষেধের প্রথম পথ মাত্র। যেমন আমরা বাহিরের জগতে দেখিতে পাই, কেউ কোন কাজ করিতে সমর্থ না হইলে, এক দিন পরে এক দিন এই ভাবে কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়, পরে সে সকল দিন কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ মৎস্যভোজন সম্বন্ধে কোন দিন আদেশ, কোন দিন যে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা মৎস্যভোজন ত্যাগ করাইবার জন্য। দেবতার উদ্দেশ্যে যে জীবহত্যা, সে হত্যা নয় আলভন অর্থাৎ গ্রহণ করা মাত্র; আলভন শব্দের অর্থ যাহা তাহা শ্রুতির এই শ্লোকে প্রকাশ হইতেছে—"বায়ব্যং শ্বেতমালভেত," অর্থাৎ বেদ বলিতেছেন, "শ্বেত বর্ণের গো রজ গ্রহণ করো।" এইরূপে বেদবাক্যের দ্বারা পশুমালভেত ইতি বাক্যে নতু হিংসা, অর্থাৎ পশু আলভন (গ্রহণ) করো মাত্র প্রকাশ হয়, হিংসা যে হত্যা করো তাহা প্রকাশ হয় না। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণশ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—তাহা নব-যোগীন্দ্র-সংবাদের মধ্যে প্রকাশ যথা—"পরোক্ষবাদবেদোঽয়ং" অর্থাৎ এই বেদ আঁখির পরে ( অবর্ত্তমানে ) যে কার্য্যাদি তাহাই বলিতেছেন; অর্থাৎ বেদের যে পশু-হত্যা তাহা চক্ষুর সম্মুখে করিও না; এখন মনে মনে পশু হত্যা করিলে তবেই চক্ষুর সম্মুখে পশু হত্যা না করার সার্থক হয়। অতএব পশুবলি দিতে হইলে মনে মনে বলি দিবে কদাচ বাহিরের কার্য্যে প্রকাশ করিও না। রাক্ষসরূপী মানুষ আমাকে বুঝাইল, চোখ

বুজিয়া বলি দিলে এই বেদবাক্য রক্ষা হয়। আমি বলিলাম—ওরে মূর্খ, তাহা হইতে পারে না, হাতের দ্বারা যে কার্য্য হয়, চোখ বুজাইয়া করো আর চাহিয়া করো, সে সব চোখের উপরে কার্য্য জানিবে। কেন না চোখ বুজিয়া কার্য্য করিলে, ক্ষণপরে তোমার সেই কার্য্য তোমার বা অন্যের নেত্রে যে প্রকাশ হইবে। হস্তপদাদি দ্বারা যাহা হয় না, কেবলমাত্র মনে যাহা হয় তাহাই পরোক্ষ কার্য্য বা চক্ষুর অবর্ত্তমান কার্য্য। অতএব পশু-হত্যা করিও না, বেদের নিত্য অভিপ্রায়। যাহারা এই বেদ-বাক্য না মানিয়া হত্যা করে, সেই মূঢ় জীবের গতি যাহা, তাহা শ্রীমদ্ভাগবৎ নব-যোগীন্দ্র-সংবাদ উপলক্ষে চমস-যোগীন্দ্রের উক্তিতে প্রকাশ করিতেছেন, যথা—

"যে ত্বনেবং বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধা, প্রেত্য খাদন্তি তেচ তান্॥"

অর্থাৎ যে এই বেদ-বিহিত তত্ত্ব অবগত নয়, এমন যে অজ্ঞান, নির্ভীক, নাস্তিক যে সকল পশুকে হত্যা-পূর্ব্বক ভোজন করে সেই সব পশুরা প্রেতলোকে গমন পূর্ব্বক নারকী সেই নরপশুকে সেইরূপ ভোজন করিতে থাকে। যেহেতু হিংসা কোন প্রকারে জীবের চির-সুখদায়ক মার্গের গতিদায়ক নয়। অনেকে সন্দেহ করিতে পারে যে, নিরামিষ কন্দমূল শাকাদি ভোজনের এক একদিন নিষেধ ও বিধি আর্য্য-ঋষিগণ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তবে তাহাও ত্যাগ করিতে হইবে! তাহার উত্তর এই যে কন্দমূল শাকাদির মধ্যে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক তিনটী শ্রেণীর বস্তু আছে; তন্মধ্যে সাত্ত্বিক শ্রেণীর যে ভোজন তাহার নিষেধ কোন দিন করেন নাই। রাজসিক তামসিক বস্তুর তিথি-বিশেষে নিষেধ করিয়াছেন। তবে যাহারা নিরামিষভোজী তাহারা রাজসিক তামসিক কন্দমূল-শাকাদি ভোজন করিলে, তাহাদের

শরীরে রাজস-তামস-বস্তুর ক্রিয়া বিশেষরূপে দৃষ্ট হয় না। এই জন্য ভজনানন্দ বৈষ্ণবকুল কন্দমূল শাকাদি ভোজনের তিথি অনুসারে বিধি-নিষেধ বিচার দেখেন না। আমিষ মৎস্য-মাংসাদিতে পূর্ণরূপে রাজসিক তামসিক গুণ থাকা নিবন্ধন এইসব ভোজনকারীদের মধ্যে শাক-কন্দমূল-ভোজনের বিধিনিষেধ অবশ্য কর্ত্তব্য ; যে হেতু দুইটি রাজসিক তামসিক বস্তুর একত্র সম্মিলনে অতি উগ্র-ক্রিয়ার প্রকাশ হয়। একাদশী প্রভৃতিতে লঘুসাত্ত্বিক ভোজনের যে বিধান, তাহা বহির্জগতের আসক্তি নাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে মন লাগাইবার জন্য। ঈশ্বরোন্মুখী-চিত্ত হইলে শাস্ত্র-যুক্তি-সমূহ হিংসা-দ্বেষাদি বর্জ্জিত হইয়া সত্ত্ব-গুণাবলম্বী হয়। তখন জীবের মন শুধু ইহাই প্রার্থনা করিবে, ও নয়ন হইতে প্রেম-ধারা গলিত হইবে। প্রার্থনা যথা—হে কৃষ্ণ! হে করুণানিধে! হে ব্রজ-লক্ষ্মীপতে! হে নাথ! ভাষা তোমার কথারূপ-চির-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ-দেহ-ধারণ-পূর্ব্বক তোমার প্রেম-চিত্র-রূপ হৃদয় ধরিয়া ভুবনমোহিনী রসবতী হউক। মধুর সঙ্গীত তোমার লীলারূপ সপ্তস্বর-মধু আশ্রয় করিয়া মধুরতার সীমা গ্রহণ করুক্। গমন তোমার চিন্তাবেশে গমন করিয়া নৃত্য-রাজ্যের একাধিপত্য-সিংহাসনে উপবিষ্ট হউক। আমার আমিত্ব তোমার দাসত্ব অভিমান গ্রহণ করে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ছোট-বড় জাতি-অভিমান এই দুটী সপত্নীকে জ্বাল্যে মারুক। ফুলহার তোমার গলা আশ্রয় করে হার-জন্মের ভাব্য-সুকৃতি গ্রহণ করুক। তোমার কালো-বর্ণের সরোবর-নীর মধ্যে শফরীর ন্যায় মন আমার ডুবে থাকুক। গৃহ তোমার আশ্রয় দিয়ে মন্দিরত্ব, ফল জল অন্নাদি ভোগ্য-বস্তু তোমার নৈবেদ্য হয়ে অমৃতত্ব, এবং মানব তোমার দাসত্ব ধরে মানবত্ব লাভ করুক। করুণানিধি কৃষ্ণের যদুবংশ ধ্বংস প্রভৃতি দেখিয়া অনেক রাজসিক-তামসিক-জন—ভগবানের বংশ ধ্বংস, ভগবানের আবার জরা

ব্যাধের হাতে মরণ, তবে কৃষ্ণ কেমন ভগবান—এই নাস্তিক সিদ্ধান্ত আনিয়া করুণানিধি কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিহারা হইয়া বিষ্ঠাভোজী পাগল ও নরকগামী হয়। সেই সব মূর্খদিগকে আমি একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই তত্ত্ব বুঝাইব। একজন পণ্ডিত, যিনি পণ্ডিত-সমাজে ভাগবৎ ব্যাখা করিয়া সাক্ষাৎ ব্যাস বা শুকদেব গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ হন, তিনি আবার কতকগুলি শিশুকে প্রথম শিক্ষাসোপানে লইবার জন্য তাহাদিগকে বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ পড়াইতেছেন, ক, খ, গ, ঘ, ঙ ইত্যাদি। দুষ্ট ছেলেদের খেলার দিকে মন, কখন পুস্তকের দিকে, কখন বাহিরে গরু, গাছ-পালার দিকে চাহিতেছে দেখিয়া পণ্ডিতটি প্রহার করিলেন; দুই তিনটি বেশী দুষ্ট ছেলে যারা, তারা পুঁথি হস্তে 'মাগো বাবা-গো! মরেছি, মরেছি' করিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল, গৃহে গিয়া মাতা পিতার কাছে 'পণ্ডিত খুব মেরেছে গো, গলায় দড়ি দে মরব তবুও পণ্ডিতের কাছে প'ড়তে যাব না গো', বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ছেলের মা তখন ছেলের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে, "আহা কি হয়েছে যাদুমণি" এই বলিয়া ছেলের বাবাকে কহিল, "ওকি গুরুমশায়, ও যে গরুমশায়, তা না হলে দুধের ছেলেকে এমন মারে। ছেলের মূর্খ বাবা বলিল "তাই ত বটে, না হলে কি এমন মারে!" যিনি পণ্ডিত সমাজে বেদব্যাস তিনি মূর্খ-সমাজে গরুমশায়। হায় দয়ালু পণ্ডিত! মূর্খদের দয়া করে পণ্ডিত কর্ত্তে এসে তোমার এই গরুমশায় অপবাদ। কিন্তু তুমি পণ্ডিত-সমাজে সেই বেদব্যাসই আছ। সেইরূপ হে করুণানিধে! হে জগদেকনাথ! হে প্রাণপ্রিয়তম! তোমার বাম করাঙ্গুলে গোবর্দ্ধনধারণ, দাবাগ্নি পান, শত-কোটি গোপীসহ রাস-লীলা, ভক্তজনের মনহরণ প্রভৃতি ঈশ্বরলীলা মায়ামুগ্ধ মূর্খকুল বুঝিল না, তুমি যে বেদের সম্বন্ধরূপ মহাধন, যথা—

"বেদ-শাস্ত্রে কহে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম, তিন মহাধন॥"

-ইতি চৈতন্যচরিতামৃত।

অর্থাৎ বেদশাস্ত্রে কথিত মহাধন তিনটি আছে; সেই তিনটি যথাক্রমে—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রেম নামে পরিচিত। সম্বন্ধের মধ্যে কৃষ্ণ, অভিধেয় মধ্যে কৃষ্ণ-ভক্তি, প্রয়োজন মধ্যে কৃষ্ণ-প্রেম, ইহা বুঝিল না। তুমি কৃপা করিয়া মানুষের আচার ধরিয়া ধরা দিতে আসিলে, যদুবংশ ধ্বংস স্বরূপ মায়া দেখাইলে, তাহাতে মায়ার লাগিখেকো সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় জীব হত্যাকারী পশু জীব তোমাকে মানুষ-জ্ঞানে ভক্তিহারা হইল। কিন্তু তুমি যে মানবরূপে সেই নীলকমলকান্তি সর্ব্বসুখদাতা কৃষ্ণ, তোমার ভক্তেরা—মায়ামুক্তেরা জানিবেই জানিবে। হে জীব! ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুর দক্ষিণ-বিভাগে বিভাব-লহরীতে বিল্ব-মঙ্গল ঠাকুরের উক্তি দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনের যে সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য-সুখ বর্ণন হইয়াছে তাহা এইরূপ, যথা:—

"চিন্তামণিশ্চরণ ভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গার-পুষ্প-তরব স্তরব সুরানাম্।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনের অঙ্গনাসকলের চরণভূষণ (নুপুরাদি) চিন্তা-মণি-দ্বারা-নির্ম্মিত, দেবতরু (কল্পতরু) সকল শৃঙ্গারের (বেশ ভূষণের) বস্ত্রাদি প্রসবকারী পুষ্প-বৃক্ষ, এবং বৃন্দাবনের ব্রজধন (গোধন) সকল কামধেনু। অহো! শ্রীবৃন্দারণ্যে বিভূতি (মহৈশ্বর্য্য) সুখ-সিন্ধুময়ী। মায়ার দাস জীব এই সুখ-সিন্ধুতে অবগাহন না করিয়া ত্রিতাপজালায়

জ্বলিয়া মরিতেছে। ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বিষষ্টীতম শ্লোকে সুখ-বৃন্দাবনের যে অপ্রাকৃত সুখের বর্ণন করিয়াছেন; মায়ার মানুষ! একবার তা শুনো—

"শ্রিয়ঃ কান্তা কান্তঃ পরম পুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমা
ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী,
চিদানন্দ জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥"

অর্থাৎ সেই শ্রীবৃন্দাবনে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কান্ত ( পতি ), লক্ষ্মী-সমূহ ( গোপকুললক্ষ্মী শ্রীরাধা আদি গোপীবৃন্দ ) কান্তা ( পত্নী ), যেখানের বৃক্ষসকল কল্পতরু ( অভিলষিত ফল দানকারী ), ভূমি চিন্তামণি গণময়ী, গৃহসকল চিন্তামণিময়, জল অমৃতময়, সেই বৃন্দাবনের কথা এতই মধুর, তাহা স্বর্গীয় গান বলিয়া জগতে পরিচিত, বৃন্দাবনের গমন-ভঙ্গী স্বর্গীয় নাচ বলিয়া প্রসিদ্ধ, যেখানের প্রিয় সহচরী বাঁশী, এবং জ্যোতিষ্কসকল চিদানন্দময় হইয়াছে, বৃন্দাবনের এই সব পরম-সুখ বৃন্দাবনবাসিগণেরই আস্বাদ্য ( ভোগ্য ) এই পরম বৃন্দাবনীয় সুখ মায়া আশ্রিত জীব প্রাপ্ত হয় না। শ্রীবৃন্দাবন-বিহারিণী শ্রীরাধা ও বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের শরণ ভিন্ন শ্রীবৃন্দাবন-সুখ জীব কেমনে প্রাপ্ত হইবে? কাঙ্গাল সাজিয়া সেই কাঙ্গালের ঠাকুর করুণানিধি কৃষ্ণকে ভক্তি-রজ্জুতে যে বাঁধিবে, সেই বৃন্দাবন সুখ পাইবে। অতএব অভিমান ত্যাগ করিয়া দীন সাজো। রাধাভাব-মত্ত গৌর-সুন্দর করুণানিধি গুণনিধি কৃষ্ণের ভাবে বিভোর হইয়া, নিজের ভাবে নিজেই পাগল সাজিয়া কি দীনতা দেখাইতেছেন, মূঢ় জীব তাহা একবার শ্রবণ করো। পদ্যাবলীর দ্বি-সপ্ততি ( বাহাত্তর ) অঙ্কে প্রকাশ, যথা—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়ো র্দাস দাসানুদাসঃ ॥"

অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ নহি, নরপতি ( ক্ষত্রিয় জাতি ) নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, বর্ণী (ব্রহ্মচারী) নহি, গৃহপতি (গৃহস্থ) নহি, বনস্থ ( বনবাসী ) নহি, সন্ন্যাসীও নহি, কিন্তু প্রকৃষ্টরূপে বর্ত্তমান যাহাতে অখিল-পরমানন্দ পূর্ণ, এতাদৃশ গোপীগণের ভর্ত্তা যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চরণ-কমলের দাসগণের দাসানুদাস হই। হায়রে! এইরূপ দীনতা জীবের কবে আসিবে আর সেই দীনবন্ধু করুণানিধি কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইবে! এই দাস-দাসানুদাস ভাব হইতে কৃষ্ণ করুণানিধি প্রাপ্তির সহজ উপায় আর নাই। ভক্ত-বৎসল ভগবান ভক্তকেই মাতা, পিতা, গুরু, সখা, পত্নী প্রভৃতিরূপে আশ্রয় করিয়া অনাদি কাল হইতে সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ-লীলা করিতেছেন। যদি ভক্ত-ভাব হইতে সর্ব্ব-সুখ দাতা কৃষ্ণের মাতা, পিতা, গুরু, সখা হইতে পারা যায়, তবে সুখপিপাসু কোন্ জীব এই ভক্তভাব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হয়? মধুর ভক্তশিরোমণি গোপী সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃত-কার কবিরাজ গোস্বামী কহিতেছেন—

"কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখী, দাসী।
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেম-সেবা পরিপাটী ইষ্ট সমীহিত ॥"

অর্থাৎ এই মধুর ভক্তশিরোমণি ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, শিষ্যা, প্রেয়সী, সখী, দাসী প্রভৃতি ভাবে কৃষ্ণকে সুখ

দিতেছেন, এবং ইঁহারাই কৃষ্ণের মনবাঞ্ছিত শুভদায়ক পরিপাটি প্রেমসেবা করিতে সমর্থা হয়। করুণানিধি কৃষ্ণ নিজমুখে অর্জ্জুন-সকাশে এই গোপীগুণ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা লঘু ভাগবতামৃতে উত্তর খণ্ডে গোপী প্রেমামৃতে কথিত, যথা—

"সহায়াঃ গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তিন ॥"

অর্থাৎ হে পার্থ! হে সখা! আমি কখনই মিথ্যা বলিব না, সত্যই বলিতেছি, সেই গোপীগণ আমার সহায়, অর্থাৎ মিত্রের ন্যায় সকল কার্য্যের সাহায্য করে, গুরুর মত উপদেশ দেয়, শিষ্যা অর্থাৎ শিষ্যের ন্যায় আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে, ভুজিষ্যা অর্থাৎ দাসীর মত আমার সেবা করে, তাহারা বান্ধবের ন্যায় আমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী, পত্নীর তুল্য সন্তোষদায়িনী; অতএব তাঁহারা আমার কিনা হয়? অর্থাৎ হে সখা! গোপীরাই আমার সর্ব্বস্ব! করুণানিধি আরও বলিতেছেন লঘু ভাগবতামৃতে গোপীপ্রেমামৃতে বর্ণিত যথা—

"মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকা পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥"

অর্থাৎ হে পার্থ, গোপীগণ আমার মহিমা, সেবা, শ্রদ্ধা অর্থাৎ স্পৃহার বিষয় এবং মনোগত ভাব প্রকৃতই জানে; কিন্তু অন্যে তাহা জানে না। আহা গোপীরাই যদি সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণের সব তত্ত্ব জানিল, তবে কোন্ সুখপিপাসু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই গোপীভাব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করে? যোগমার্গগামী বৃহস্পতির শিষ্য কৃষ্ণসখা উদ্ধব এই গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসীম প্রেম দেখিয়া ব্রজ-

সুন্দরীদের চরণধূলির দাস হইতে কামনা করিয়াছিলেন ও তাহাই হইয়াছিলেন। উদ্ধব ব্রজগোপীগণের কৃষ্ণপ্রেম দেখিয়া সাশ্রুনয়নে প্রেমগদগদ কণ্ঠে যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবৎ তাহা প্রকাশ করিতেছেন, যথা—

"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীনাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরি-কথোদ্গীতং পুনাতি ভুবন ত্রয়ম্ ॥"

অর্থাৎ আমি সব দেখিয়াছি, ব্রহ্মজ্যোতি ধ্যান করা, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভক্তভাব দেখিয়াছি; কিন্তু মধুর-রসাশ্রয় গোপীগণের ভাবে সখা কৃষ্ণ যেমন সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ হয়, এমন আর কোথাও দেখি নাই। আমি বেশ বুঝিতেছি, আমার সেই জ্যোতিধ্যান করা রোগনাশের জন্য সখা আমার এই প্রেমময়ী গোপীগণের কাছে পাঠাইয়াছেন। এখন আমার কর্ত্তব্য কি? এমন ভাগ্য আমার হয় নাই যে আমি গোপীগণের দাস হই; সখা ত আমার নিজেই দাস আছেন; আমি এই নন্দব্রজে যেসব গোপী সখার স্ত্রীসম্বন্ধ ধরিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চিন্তায় নিযুক্ত, সেই গোপী-গণের চরণরজের দাসত্ব করিব। যদি সেই চরণ-রজ কৃপা করিয়া কোনদিন গোপীগণের দাস হইতে ক্ষমতা দান করেন, অন্যথা আর আমার কোন উপায় নাই। যাঁহাদের কৃষ্ণ-সহ প্রেম-লীলা কথাগানে ত্রিভুবন পবিত্র হয়, সখা কৃষ্ণের সেই প্রিয়গণ মধ্যে ব্রজগোপী-গণ ধন্যতম। ওরে মন! সর্ব্বতোভাবে সেই গোপীগণের চরণ-গতি লক্ষ্য করো। কর্ম্মবীর ভীষ্মের অন্তিমকালে এই গোপীচরণের দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছিল। সেই জন্য শরশয্যাশায়ী প্রেমাশ্রু-পরিপ্লুত ভীষ্ম সম্মুখে করুণানিধিকে সমাগত দেখিয়া কহিয়াছিলেন—

"ললিতগতিবিলাসবল্গু হাস
প্রণয়-নিরীক্ষণ কল্পিতোরুমানা।
কৃতমনুকৃতবত্য উন্মদান্ধা,
প্রকৃতিমগন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ ॥"

অর্থাৎ যাঁহার সুন্দর চলনভঙ্গী, রাসক্রীড়া, মধুর হাসি, প্রণয়-কটাক্ষ-দর্শনে আসক্তচিত্ত গোপবধূগণ "এই শ্যাম সুন্দর যশোদানন্দন নিশ্চয়ই আমাদের ; আমাদের দ্বারা নিশ্চয়ই উনি সুখী ; না হলে মধুর-হাস্য-চলন-ভঙ্গী প্রভৃতি দ্বারা কখন ও আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন না। আমাদের ন্যায় ভাগ্যবতী আর কে আছে এবং এমন ত্রিভঙ্গঠামে আমাদের প্রিয়তম অবস্থান করেন, এই ভাবে হাসেন, এই ভাবে বাঁশী বাজান, এই ভাবে বাম করাঙ্গুলে, গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করেন" এইরূপে সেই প্রেম মত্ত মানিনী ব্রজকামিনীরা যাঁর লীলার অনুকরণ করিয়াছেন, সেই গোপীজনবল্লভ রাধাকান্ত আমার নয়নপথের পথিক হউন। গোপীগণের কৃষ্ণ, বিশেষতঃ শ্রীরাধার কৃষ্ণ কত যে মধুরতম তাহা চিরদিন সকলেরই বর্ণনার সীমাতীত। গোপীগণের বিশেষতঃ শ্রীরাধিকার কৃষ্ণের প্রতি যে কি অসীম প্রেম, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধব সংবাদে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর উক্তি ভ্রমরগীতার দুইটি শ্লোক দ্বারা কিছুমাত্র প্রকাশ হইতেছে—

"মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধ ধর্ম্মা,
স্ত্রীয়মকৃত বিরূপা স্ত্রীজিত কামযানাম্।
বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ য
স্তদলমসিত সখ্যৈ দুস্ত্যজস্তৎ কথার্থঃ ॥
যদনুচরিত লীলাকর্ণ পীযুষ বিপ্রুট্,
সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ।

সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্যদীনা
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি ॥”

অর্থাৎ ওরে ভ্রমর! অথবা কৃষ্ণ-প্রেরিত কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর তুল্য উদ্ধব! যে কালো কৃষ্ণের দূত হয়ে আমার বিনয় কর্ত্তে এসেছ, সেই কালোর গুণের কথা আমাদের খুব জানা আছে। ওরে ভ্রমর! এই জগতে কালো রঙের যত আছে সকলেরই এইরূপ অপূর্ব্ব গুণ শুনিয়াছি। সেই পূর্ব্বে একটী কালো ব্যাধের ন্যায় বানর রাজা বালীকে গুপ্তভাবে বাণবিদ্ধ করিয়া মারিয়াছে, একটী পত্নীতে আসক্ত হইয়া রূপ-গুণে আকৃষ্টা অভিসারিণী শূর্পনখার নাক-কান কাটিয়া বিরূপা করিয়াছে। আর একটি কালো, কাকে যেমন গৃহস্থ নিক্ষিপ্ত অন্নাদি-বলি-ভোজন-পূর্ব্বক নিজ বান্ধব বহু-সংখ্যক কাককে আহ্বান করিয়া সেই গৃহস্থ বাটীর বলি প্রদত্ত স্থানকে বেষ্টন করে, সেইরূপ সেই কালো বলির দান গ্রহণ করতঃ বলিকে বলির তুল্য বন্ধন পূর্ব্বক নিজ বান্ধব দেবগণকে, ডাকিয়া তাহার গৃহ বেষ্টন করিয়াছে; সম্প্রতি বৃন্দাবনের এই কালোটি ঠিক সেইরূপ। বাল্যকালে পুতনা বধ করিয়া স্ত্রীহত্যাতে দীক্ষিত, ওরে ভ্রমর! আমাদেরও বাঁশীর গানে আকর্ষণ পূর্ব্বক নয়ন-বাণবিদ্ধ করিয়া অসীম যন্ত্রণা দান করিতেছে। তাই বলি কালো বড় ভাল বলে, হাত যোড় করে, কালোর গুণ জানায়ে আমাদের ভুলাতে আর চেষ্টা করো না। কালোর যত ভাল গুণ সব আমাদের জানা আছে, দিনে রাত্তে যুগে-যুগে বর্ত্তমানে সব জানা আছে। ওরে ভ্রমরা! যদি বল সে যদি এতই মন্দ, তবে গোপীগণ! তোমরা কালোর কথা বলো কেন? সে সম্বন্ধে এই উত্তর আমি দিই,—ওইটি আমাদের বিশেষ ভুল! ভুল কি সত্য তা জানি না। ভ্রমর! ‘কালো কালো’ করে প্রাণ আমাদের যে কেন কাঁদে তা জানি না। ভুলবার

শত চেষ্টা করি বটে যে, আর সে কালোর কথা বলব না, শুনব না; কিন্তু আপনা হ'তে কালোর কথা কেন যে মুখে আসে, কালোর রূপ কেন যে স্মৃতি-পটে জাগে, তার কারণ জানি না। এই জন্য তার কথার প্রয়োজন আমাদের ত্যাগ করা অসাধ্য হয়েছে। ভ্রমর! যদিও জানি তার কথা বল্লে আমাদের সংসারের ধর্ম্ম হবে না, অর্থ হবে না, কাম পূর্ণ হবে না, অতএব তার চিন্তা করা বড় ভুল, কিন্তু জেনে শুনে তবুও তার কথা ভুল্‌তে পারি না। ভুল করে কালোর সঙ্গে প্রেম করা যেন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। যদি বলো—তোমরা গৃহ ধর্ম্ম কি করে ত্যাগ করলে! তা বলি ভ্রমর শুনো, যাঁর নিত্য লীলা (গোচারণ, আমাদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস, কটাক্ষ-নিক্ষেপ প্রভৃতি নিত্য লীলা) শ্রবণের অমৃত স্বরূপ, যাহা শুনিলে মরা মানুষও বেঁচে উঠে, সেই যে নিত্য লীলা, তাহার একটু কণিকা একবার মাত্র সেবন ক'রে সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করেছি। (এই স্থানে শ্রীরাধার কি অপূর্ব্ব প্রেম উৎকর্ষ প্রকাশ পাইতেছে; এতদিন কৃষ্ণ সহ লীলা করিয়াছেন, তবু বলিতেছেন একটু কণিকামাত্র লীলা!) বিদ্যাপতি ঠাকুরের ভাষায় শ্রীরাধার হৃদয় এইরূপ, যথা—

"কত মধু যামিনী রভসে গোয়াইনু, না বুঝনু কৈছন বা কেল,
কত লাখ যুগ তারে হিয়পর রাখনু, তবু হিয়া জুড়ান না গেল।"

স্বামী-পুত্র স্বজনাদিসঙ্গে সংসার-আসক্তি-ধর্ম্ম তাহা নাশ করেছি। যখনই তার লীলা দেখেছি তখনই এসব নাশ হয়েছে, দুঃখিত গৃহ-কুটুম্বাদি ত্যাগ করে আমাদের ন্যায় ভোগহীনা বিহঙ্গ হংসতুল্যা ভিখারিণীর ন্যায় রয়েছি; এত দুঃখ পাওয়া সত্বেও তবু সেই কালোর কথা ভুল্‌তে পারছি না! এমন ভাবে সেই কালো সখার কথা আমাদের দুস্ত্যজ্য হয়েছে। হায় ভ্রমর! এ সম্বন্ধে আমরা নিরুপায় যদি বল তোমরা

সাকার বিগ্রহে স্থিতিশীল ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতি আমার কাল সখার ওই রূপের আসক্তি ত্যাগ করে, সখার যে সর্ব্বত্র সমভাবে নিত্য প্রকাশিত জ্যোতিরূপ তাহাতে আসক্ত হও; এইরূপ হইলে তোমাদের বিরহ দুঃখ ভোগ কর্ত্তে হবে না; কেননা সূর্য্য যত দূরে থাকুক না, তাঁর কিরণ কমলিনী পাইবেই পাইবে। কিন্তু ভ্রমর, এ দৃষ্টান্তে এ শিক্ষায় জ্যোতির ধ্যানে অধিক দুঃখ বই সুখ পাই না। ভ্রমর! জ্যোতিকে আমরা কেন ধ্যান কর্ব্ব! জ্যোতি ত আমাদের কোন সুখ দেয় নাই; আমাদের নিকট যে জ্যোতির্ম্ময়, ঠিক আমাদের গোপকুলউৎপন্ন একটি মানুষ এসে কত যে আনন্দ দিয়েছে, কত যে সুখী করেছে, জ্যোতি ত তাঁর তুলনায় কণামাত্র সুখ দিয়েছে কি না জানি না। আর তা না জানলেও কোন ক্ষতি নাই। ভ্রমর! কলসীর জল পানে যাদের পিপাসা যায়, তারা চাতকের ন্যায় উর্দ্ধমুখে বারিবিন্দু পান করে কিসে পিপাসা নাশ করবে! ভ্রমর! আমরা এত অকৃতজ্ঞানই যে, যে জ্যোতির্ম্ময় মানুষ আমাদের সর্ব্ব দুঃখ নাশ করেছে, তাকে ভুলে যাব। শোন তুমি, সেই জ্যোতির্ম্ময় মানুষ, সেই তোমার কালো সখা আমাদের কত দুঃখ হতে রক্ষা এবং কত সুখ দান করেছে। এই পৃথিবীতে, এই ব্রজে, এই বৃন্দাবনে সেই কালো সখা দাবানল পান করে আমাদের বাঁচয়েছে, গোবর্দ্ধন ধারণ করে বর্ষা-বিদ্যুতের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছে, কালীয় নাগ, বৃষভাসুর, তৃণাবর্ত্ত, কেশীদৈত্য, ব্যোমাসুর প্রভৃতির হাত হতে রক্ষা করে, রাস বিলাস প্রভৃতির দ্বারা কতই সুখী করেছে, কই তোমার সখার জ্যোতি ত আমাদের তেমন সুখ কোন সময়ে দেয় নাই; তবে আমরা কেন জ্যোতি ধ্যান কর্ব্বো! যে এসে কোলে তুলে নেয় না, কোলে কর্ত্তেও দেয় না, কেবল দর্পণে প্রতিবিম্বের মত অনুভূত হয়, সেই জ্যোতি কেবল দুঃখ দাতা নয়

কি? মূর্ত্তিকে পরিত্যাগ করে ছায়াকে নিয়ে কেউ সুখী হয় কি? এই জন্য সেই কালো সখার কথা আমরা ভুলতে পারছি না,—কোন কালেও পারব না; তোমরা পার, ভ্রমরজাতি তোমরা, তোমাদের ভোলা অভ্যাস চিরদিনই আছে; যে ফুল বক্ষে ধরে তোমাদের মধু দেয়, তাদের পরিত্যাগ করে চলে যাও, ফিরেও দেখ না। কিন্তু আমাদের স্বভাব তেমন নয়। যার কাছে একটু মধু পেয়েছি, তার প্রেমে চিরদিনই মজে আছি; এইটি আমাদের স্বভাব—যার কাছে সুখ পাই, তাকে আমরা ভুলতে পারি না। তুমি বল্‌তে পার দুঃখ পাচ্ছ সেই জন্য ভ ভুলতে বলছি, তাকে ভুলে যদি সুখ পাও। কিন্তু ভ্রমর! ভুলবার উপায় নাই, ভুলে জ্যোতি ধ্যান করে সুখ পাবার উপায়ও নাই। যারা বলে, জ্যোতি ধ্যানে আমরা সুখী, এ একথা মৌখিক মাত্র; তাদের কথা, শিশুর থালার জলে চাঁদের-উদয়-আনন্দ পাবার ন্যায় অগ্রাহ্য উপ-হাসাস্পদ। জ্যোতি-জ্ঞানীরা শিশুর ন্যায় মূর্খ! তুই ভ্রমর সেইরূপ মহামূর্খ। সুখ দিচ্ছে সাকার মূর্ত্তি; কৃতঘ্ন কাপুরুষ, ধ্যান করছ জ্যোতি-মূর্ত্তি। এইরূপ কৃতঘ্নের দল তোমরা বটে; সাকার অন্নের দ্বারা ক্ষুধা দূর করছ, ধ্যান করছ জ্যোতির; জ্যোতির ধ্যান করে ক্ষুধা নাশ কর দেখি, সেটির বেলা ত হবে না, কেবল স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য হিংসা দ্বেষপূর্ণ শরীরের পোষণজন্য মুখে বলবে জ্যোতি; কিন্তু সাকার না হলে একটি দিনও চলে না। তোদের তুল্য গুরুত্যাগী ব্যাভিচারী আর কে আছে! আমরা ভুলতে পারি না কেন বলব? যে দিকে দৃষ্টি করি, সেই দিকে সেই সাকার অসিত সখার স্মৃতি আমাদের মনে তাঁর মোহন মূর্ত্তি এনে দেয়; যমুনার দিকে যখন দৃষ্টি করি, তখন যমুনার কালো জল, জলকেলীকারী কালো সখার স্মৃতি দেয়, যমুনা-পুলিনের দিকে যখন দেখি, তখন সেই রাসরসে মত্ত যমুনা-পুলিন-বিহারীর ভাব ঢল-ঢল মূর্ত্তি আমাদের মনে

পড়ে, গোবর্দ্ধনের দিকে দেখিলে সেই গোবর্দ্ধনধারীর রূপমাধুরি মনে হয়, ব্রজের দিকে সেই গোপাল-মূর্ত্তি, কদম্ব-তলে সেই মদনমোহন-মূর্ত্তি, বংশীবট-তটে সেই গোপীনাথ মূর্ত্তি এবং নিকুঞ্জে সেই কুঞ্জ-বিহারীর বেণু-বাদন-শীল কামিনী-রঞ্জন সৌন্দর্য্য এইভাবে, সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বদিকে, সর্ব্বত্র সেই কালো সখার কথা মনে জাগিয়ে দেয়; কাল সখার এত স্মরণ চিহ্ন থাকার জন্য কি করে তাকে ভুলব; তা ভুলতে পারব না, ব্যাভিচারিণী হ'ব না। অতএব ভ্রমর! তাঁর কথা ত্যাগ করা আমাদের দুঃসাধ্য। আহা প্রেমময়ী শ্রীরাধার এই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-লীলাগান নরক-দুঃখ হইতে জীবগণকে ত্রাণ করিতেছে। সেই ত সর্ব্বশক্তিময় প্রেম বাধা সত্বেও যাহা নিজ হ'তে উৎপন্ন হয়, নিষেধ সত্বে যাহা আদেশের অঙ্কশায়িত, এবং করিব না বলিলে যাহা অজ্ঞাতসারে কর্ম্মকারী হয়। প্রেমময়ী শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমানন্দে, কৃষ্ণ সেবার যদি বাধা হয়, তবে তাহাতে তিনি নিজকে বিশেষ ধিক্কার দিতেন। এ সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তৃতীয় লহরীতে দক্ষিণ বিভাগে লিখিত, যথা—

"গোবিন্দ প্রেক্ষণাক্ষেপি-বাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা॥"

অর্থাৎ সেই প্রেমময়ী অরবিন্দলোচনা শ্রীরাধা গোবিন্দ দর্শন হেতু স্বসুখে প্রেমাশ্রুবর্ষণকারী প্রেমানন্দকে কহিলেন, "ওরে আনন্দ! তুই ত পাগল, আমার চক্ষু দুটীকে কেন জলে ভরে দিলি, প্রাণসখার মোহন শরীরকে দেখতে দিলি না! এমন হওয়া ভাল নয়," এই বলিয়া সেই আনন্দকে অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছিলেন। নিন্দা করার কারণ এই যে, নয়ন জলপূর্ণ হওয়ার হেতু শ্যাম-সুন্দর দর্শন-সেবার বাধা আসিয়াছে। এইরূপ প্রেম একমাত্র শ্রীরাধাতে সম্ভব। এই হেতু বহু গোপী

থাকিলেও শ্রীরাধার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যেমন কাঁদেন, তেমন আর কারোর জন্য কাঁদেন না। বিদ্যাপতি ঠাকুর শ্রীরাধিকার চির-উৎকর্ষসূচক গুণ বর্ণন করিতেছেন, যথা—

"ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর।
কত জন কানু, কানু করি ঝুরয়ে,
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥"

অর্থাৎ হে রাধে! তোর রমণী জন্ম অতীব ধন্য! যেহেতু কত শত রমণী যে শ্যাম-সখার জন্য কাঁদিয়া মরিতেছে, তবু যাঁর মিলন-সুখ পাইতেছে না, সেই ভুবনমোহন যশোদাকুমার তোর সহিত মিলিবার জন্য, তোর চিন্তাতে আকুল হইতেছেন। করুণানিধি কৃষ্ণ হ্লাদিনী রাধার সহ এই প্রেম লীলা নরলোকে কেবল জীবকে নিজের করিবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার অবতারী কৃষ্ণের নর জগতে অবতারের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এইরূপ, যথা—

"আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেম-রস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্গম॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সর্ব্ব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমাকে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি, না হই অধীন॥

আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সেই ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে মোরে যেই করে শুদ্ধ রতি ॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন।
সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করয়ে বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥
সখা শুদ্ধ-সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম ॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদ স্তুতি হইতে সেই হরে মোর মন ॥
এই শুদ্ধ-ভক্ত লইয়া করিব অবতার।
করিব বিবিধ ভাতি অদ্ভুত বিহার ॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার ॥
মোবিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥
আমিহ না জানিমু না জানিবে গোপীগণ।
দোঁহার রূপগুণে দোহার নিত্য হরে মন ॥
ধর্ম্ম ছাড়ি দোহে রাগে করায় মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥
এই সব রসসার করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ ॥

ব্রজের নির্ম্মলরাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥"

—ইতি চৈতন্যচরিতামৃত।

করুণানিধি সসীম হইয়া ধরা দেবার পথ দেখাইলেন নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের দ্বারা, কিন্তু জীবের দুর্ভাগ্য দোষে অনেকে ধরিতে পারিল না। কৃষ্ণ আমার সখা, কৃষ্ণ আমার পুত্র, কৃষ্ণ আমার স্বামী, এই শুদ্ধ ব্রজ ভাব কেহই ধরিল না। সংসার ঐশ্বর্য্য সুখ লইয়া সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ করুণানিধির প্রতি যে প্রেম ভক্তি তাহা গ্রহণ করিল না। বহির্মুখী মায়ার প্রভাব এমনই অসীম জানিবে। কৃষ্ণকে মনুষ্য জ্ঞান, কৃষ্ণ যে মূর্ত্তিতে ব্রজলীলা করিয়াছেন সে কৃষ্ণের ঠিক মূর্ত্তি নয়, ঠিক যিনি, তিনি মাত্র জ্যোতি, এই সব জ্ঞান মায়ার দাস মূঢ় স্বার্থপর জীবের হইয়া থাকে জানিবে। এই কৃষ্ণ লীলা কতদিন ধরাধামে এবং অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডে কেমন ভাবে চলিতেছে; তাহা চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য-লীলার বিংশ পরিচ্ছেদে লিখিত, যথা—

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥
এই মত সব লীলা যেন গঙ্গাধার।
সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরতা প্রাপ্তি।
রাসাদি লীলা করে কৈশোরে নিত্য স্থিতি ॥
নিত্য লীলা শ্রীকৃষ্ণের সব শাস্ত্রে কয়;
বুঝিতে না পারে লীলা নিত্য কেমনে হয় ॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যবে তবে লোক জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্যের জ্যোতিশ্চক্র প্রমাণে ॥

জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রিদিনে।
সপ্ত দ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরি ক্রমে ক্রমে॥
রাত্রিদিনে হয় ষাটি দণ্ড পরিমাণ।
তিন সহস্র ছয় শত পল তার মান॥
সূর্য্যোদয় হইতে ষাটি পল ক্রমোদয়।
সেই এক দণ্ড অষ্ট দণ্ডে প্রহর হয়॥
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুন সূর্য্যোদয়॥
ঐছে কৃষ্ণ লীলামণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে॥
সওয়া শত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাহা যৈছে ব্রজপুরে করিল বিলাস॥
অলাৎ চক্রবৎ সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ।
পুতনা বধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলা হয় অবসান।
তাতে নিত্য লীলা কহে নিগম পুরাণ॥
গোলক গোকুল ধাম বিভু কৃষ্ণ সম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥
অতএব গোলকস্থল নিত্য বিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে ক্রমে প্রকট তাহার॥
ব্রজে কৃষ্ণ পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ॥

এক কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান্ ।
আর সব স্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণ নাম ॥
এই সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ বিস্তার ।
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥
অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন ।
শাখাচন্দ্রন্যায়ে করি দিগ দরশন ॥
—ইত্যাদি ।

এই সর্ব্বশক্তিমান নন্দগোপপুত্র আমার করুণানিধি কৃষ্ণকে অনেকে চেনে না, মানে না, ভক্তিও করে না, কমের ভিতরে মানে চেনে, ও ভক্তি করে। যাহারা মানে, চেনে, ভক্তি করে, তাহারাই সত্য; যাহারা ইহার বিপরীত তাহারা মিথ্যা। যাহারা করুণানিধি কৃষ্ণকে ভজন করে না, তাহারা মিথ্যা বা অসার জানিবে। এইরূপ অসার বা মিথ্যা হইলে, সংসারের কিছু অমঙ্গল বা কৃষ্ণের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যদি এইরূপ অসার তুচ্ছ হয়, তাহাতেও কৃষ্ণের কিছু আসে না যায় না। একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে বহুসংখ্যক বীজ উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেই বীজ হইতে বৃক্ষ কয়টি হয়? দুইটি কি চারটি হয়, আর সব অন্যান্য জীবের খাদ্যাদিরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ হওয়াতে সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের যেমন ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই, সেইরূপ বহু ব্রহ্মাণ্ড যদি কৃষ্ণবিমুখ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কৃষ্ণের কিছু ক্ষতি নাই। শেষ কথা কৃষ্ণ-আরাধনাকারীরা চির সুখের ও বাঁচিবার পথে চলিতেছে, এবং কৃষ্ণ-আরাধনাবিমুখ জীবকুল দুঃখ ভোগের ও মরণের পথে চিরদিনই যাইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীমন্ উদ্ধব করুণানিধিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে সখা! হে সাধুগণের পতি! এই জগতে যম

কয় প্রকার, নিয়ম বা কয় প্রকার? শম কি? দম কি? তিতিক্ষা, ধৃতি, দান, তপ, শৌর্য্য, সত্য এবং ঋত কাহাকে বলে? ত্যাগ কি? ধন কি? ইষ্ট কি? যজ্ঞ, দক্ষিণা বা কি? হে শ্রীমন্! পুরুষের বল, দয়া, লোভ কেমন প্রকার? বিদ্যা কি? পরা হ্রী (লজ্জা), শ্রী (শোভা), সুখ, দুঃখ বা কি? কোনটি পথ? এবং কোনটি উৎপথ (কুপথ)? স্বর্গ কোনটি? নরক কোনটি? জগতে বন্ধু কে? গৃহ কি? জগতে ধনী কে? দরিদ্র এবং কৃপণ কে? ঈশ্বর কে? এবং বিপরীত কি? আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। করুণানিধি কৃষ্ণ উদ্ধবের এই কথা শুনিয়া বলিলেন—

শ্রীভগবানুবাচ।

"অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ।
আস্তিকং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌন স্থৈর্য্য ক্ষমা ভয়ম্॥
শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চ্চনম্।
তীর্থাটনং পরার্থেহ তুষ্টিরাচার্য্য সেবনম্॥
এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়ো দ্বাদশ স্মৃতাঃ।
পুংসামুপাসিতাস্তাত যথাকালং দুহন্তি হি॥
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধে দম ইন্দ্রিয়-সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসম্মষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ॥
দণ্ডন্যাসং পরং দানং কামত্যাগস্তপঃ স্মৃতঃ।
স্বভাববিজয়ঃ শৌর্য্যং সত্যঞ্চ সমদর্শনম্॥
অন্যচ্চ সুনৃতা বাণীঃ কবিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
কর্ম্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে॥
ধর্ম্ম ইষ্টং ধনং নৃনাং যজ্ঞোঽহং ভগবত্তমঃ।
দক্ষিণা জ্ঞান সন্দেশঃ প্রাণায়ামঃ পরং বলম॥

ভগো ম ঐশ্বরো ভাবো লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ।
বিদ্যাত্মনি ভিদাবাধো জুগুপ্সাহ্রীরকর্ম্মসু ॥
শ্রীর্গুণা নৈরপেক্ষ্যাদ্যাঃ সুখং দুঃখ সুখাত্যয়ঃ।
দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্ধ মোক্ষবিৎ ॥
মূর্খো দেহাদ্যহং বুদ্ধিঃ পন্থামন্নিগমঃ স্মৃতঃ।
উৎপথশ্চিত্তবিক্ষেপঃ স্বর্গ সত্ত্ব গুণোদয়ঃ ॥
নরকস্তম উন্নাহো বন্ধু র্গুরুরহং সখে।
গৃহং শরীরং মানুষ্যং গুণাঢ্যো হ্যাঢ্যো উচ্যতে ॥
দরিদ্রো যস্ত্বসন্তুষ্টঃ কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
গুণেষ্বসক্তধীরীশো গুণসঙ্গো বিপর্য্যয়ঃ ॥
এত উদ্ধবতে প্রশ্নাঃ সর্ব্বে সাধু নিরূপিতাঃ।
কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ।
গুণদোষ দৃশি দোষো গুণস্ত ভয় বর্জ্জিতঃ ॥

হে উদ্ধব! অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ( মনের দ্বারা পরের দ্রব্য চুরি করিতে ইচ্ছা না করা ), অসঙ্গ ( একাকী বাসকরা ), হ্রী ( লজ্জা ), অসঞ্চয়, আস্তিক্য ( স্বধর্ম্মে বিশ্বাস ), ব্রহ্মচর্য্য, মৌন ( কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কথা না বলা এইরূপ নিয়ম ), স্থৈর্য্য ( স্থিরচিত্তে স্বধর্ম্মযাজন ), ক্ষমা, ভয় ( কালের ভয়, দুরন্ত কাল আমাকে বৃদ্ধত্ব-রোগ-জরাগ্রস্ত করিবে, সংহার করিবে, কালের হাতে কাহারও রক্ষা নাই, আমি কেন মিথ্যা গর্ব্ব অভিমান করি, এই ভাবে ভব-ভয়হারী আমার শরণ লওয়া ), হে সখে! এই দ্বাদশটীকে যম কহে। আর শৌচ, ইহা দুই প্রকার, যথা—বাহ্য শৌচ ( স্নান-তিলক-তুলসীমালা ধারণাদি ), অভ্যন্তর শৌচ (গুরু-প্রদত্ত আমার নাম নিত্য-দেহ ধ্যান ভূতশুদ্ধি ), জপ ( গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র নাম জপ), তপ (নির্জ্জলা একাদশী চতুর্মাস্য ব্রতাদি),

হোম, শ্রদ্ধা (ভক্তিপূর্ব্বক ধর্ম্ম যাজন), আতিথ্য (নিজ ভজন-স্থান ভিন্ন অন্যত্র একতিথি ভিন্ন অবস্থান না করা অথবা অতিথি সেবা করা), মদর্চ্চন (আমার পূজা), তীর্থ ভ্রমণ, পরের মঙ্গল চেষ্টা, তুষ্টি (সুখে-দুঃখে মনে সন্তোষ রাখা), গুরুসেবা—এই দ্বাদশটি নিয়ম জানিবে। হে সখা! যম, নিয়ম, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মধ্যে জানিবে। যারা প্রবৃত্তিমার্গে থাকে তাহাদের নিয়ম পালন কর্ত্তব্য। যাঁরা মুক্তিপিপাসু নিবৃত্তিমার্গে চলিতেছেন, তাহাদের যম পালন করা কর্ত্তব্য। এইভাবে পরম পুরুষ আমাকে যে যেমন ভাবিতেছে সে জীব সেইভাবে ফল প্রাপ্ত হইতেছে। আমাতে অচলা শ্রদ্ধার নাম শম, ইন্দ্রিয় সংযমের নাম দম, দুঃখ সহনের নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা উপস্থ জয় ধৃতি (জিহ্বা জয় এইরূপ—উত্তম বস্তু ভোজনের আসক্তি ত্যাগ, উপস্থ জয় এইরূপ—স্ত্রী সম্ভোগ আসক্তি ত্যাগ, ইহাকেই ধৃতি কহে), দণ্ডন্যাস (মারণ ইচ্ছা পরিত্যাগ, জীবহত্যাদি ত্যাগ করাকে দান কহে—"ন ধনার্পণম্" অর্থাৎ ধনদান দান নহে), দণ্ডন্যাসই শ্রেষ্ঠ দান জানিবে। কাম (ভোগ বাসনা) ত্যাগ করাকে তপস্যা কহে; চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক দেহের কষ্টদায়ক যে ঈশ্বরচিন্তা, সে তপস্যা নহে। স্বভাব বিজয়কে শৌর্য্য কহে; অর্থাৎ কাহাকে বলের দ্বারা পরাজয় করাকে শৌর্য্য বা বীরত্ব কহে না, কাম-ক্রোধ-লোভাদি জনিত যে কুবাসনা তাহাকে পরাজয় করার নাম শৌর্য্য বা বীরত্ব। নিজের তুল্য সকল জীবকে দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি কোন কষ্ট না দেওয়াকে সত্য কহে; সংসার-সুখদুঃখ ভোগের জন্য যে যথার্থ কথা বলা তাহা সত্য নহে। কোন কোন ভক্ত জ্ঞানী বিবেককে ঋত কহে। সাংসারিক কর্ম্মে অনাসক্তির নাম শৌচ, আমার সেবা-কর্ম্মাদিতে অনাসক্তি নয়। সংসার বাসনা ত্যাগের নাম সন্ন্যাস, এই

সন্ন্যাসের নাম ত্যাগ জানিবে। ধর্ম্মই মানবের মঙ্গলদায়ক ধন, পশু-অর্থ প্রভৃতি নয়। ভগবত্তম আমি কৃষ্ণই যজ্ঞ জানিবে; অর্থাৎ আমার নাম-রূপ-গুণাদি ভাবিলে জীবের যজ্ঞ করা হয় জানিবে। জ্ঞান-আলোচনা যজ্ঞের দক্ষিণা, স্বর্ণ দানাদি দক্ষিণা নহে। জগতে বলবানকে জয় করিলে বল হইয়াছে বলে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা; যে মনকে জয় করিতে পারে তাহার বল প্রকৃতই বল। প্রাণায়াম দ্বারা চঞ্চল মন গৌণপক্ষে স্থির হয়, অতএব প্রাণায়াম শ্রেষ্ঠ বল জানিবে। ভগ অর্থাৎ ভাগ্য তাহাকে বলে, যে আমার ঐশ্বর ভাব লাভ পূর্ব্বক আমার প্রেমে মত্ত হইয়া সুবুদ্ধি জীবের মনকে আকর্ষণ করিতেছে, পাপীকে পুণ্যের পথে লইতেছে, তাহারই প্রকৃত ভগ বা ভাগ্য জানিবে। আমার উত্তমা-ভক্তি-প্রাপ্তিকে লাভ কহে; পুত্রাদি লাভ লাভ নহে। সকলের আত্মা সমান—এই জ্ঞানকে বিদ্যা কহে। কুকর্ম্মকে তুচ্ছ ভাব দেখানই হ্রী (লজ্জা), স্ত্রীপুরুষ-দর্শন-জনিত লজ্জা লজ্জা নহে। সদ্‌গুণই মানুষের শ্রী (শোভা), কিরিটকুণ্ডল হারবলয়াদি মানুষের শ্রী (শোভা) নহে। সাংসারিক সুখদুঃখের অতীত, কাহারও অপেক্ষা না করিয়া স্বাভাবিক যে প্রফুল্লতা তাহাকেই সুখ কহে। বিষয়-ভোগ অপেক্ষাকে দুঃখ কহে, অগ্নি-দাহনাদি দুঃখ নহে। কিসে জীবের বন্ধন হয়, এবং কিসে জীবের মুক্তি হয়, ইহা যেই জানিয়াছে, সেই পণ্ডিত। দেহ-গৃহাদিতে আমার বুদ্ধি করিয়া, আমার চিন্তা যে ত্যাগ করিয়াছে সেই মূর্খ। সংসার প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া যে পথে আমার দিকে জীব আসিতে পারে, সেই নিবৃত্তিমার্গকে পথ কহে, কণ্টকাদি হীন চলিবার পথ, পথ নয়। আমা হইতে চিত্ত ভ্রষ্ট হইয়া নশ্বর সংসারে মগ্ন হওয়ার নাম উৎপথ বা কুপথ। চুরি করিয়া জীবন ধারণাদি যে কুপথ, সে কুপথ নহে। সত্ত্বগুণ অর্থাৎ আমার প্রতি ভক্তি,

অহিংসাদি গুণের উদয় হওয়ার নাম স্বর্গ, ইন্দ্রলোকাদি স্বর্গ নয়। তম উদয় হওয়ার নাম—অর্থাৎ হিংসাক্রোধযুক্তমানসে আমাতে বিমুখ হইয়া জীবনযাত্রানির্ব্বাহের নাম নরক; ঘোর অন্ধকার পূর্ণ যন্ত্রণাদায়ক স্থান নরক নহে। হে সখা, এ জগতে গুরুই প্রকৃত বন্ধু; কেননা আমি গুরুরূপে বর্ত্তমান। যেহেতু শাস্ত্র প্রমাণ দিতেছেন—

"এক এব পরো বন্ধু বিষমে সমুপস্থিতে।
গুরু সকল ধর্ম্মাত্মা যত্রাকিঞ্চন গো হরিঃ॥"

অর্থাৎ বিষম কাল উপস্থিত হইলে গুরু ভিন্ন শ্রেষ্ঠ বন্ধু আর একটি মিলিবে না। গুরুতে সর্ব্ব ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে; যে গুরুর কাছে স্বর্গ ও আমি হরি অকিঞ্চনের ন্যায় রহিয়াছি। অর্থাৎ গুরু আশ্রয় করিলে অনায়াসে সুখধাম ও আমি জীবের প্রাপ্য হই। অতএব শুদ্ধ, শাস্ত্রজ্ঞান-নিষ্ঠ, হিংসাদিবর্জ্জিত, আমার একান্ত ভক্ত সৎগুরুকে পরম বন্ধু জানিবে। ভাই প্রভৃতি যে সব সাংসারিক বন্ধু, সে সব বন্ধু নয়। মানবের শরীরকে গৃহ জানিবে, অট্টালিকাদি গৃহ নয়। সদ্‌গুণ যাহাতে আছে তিনিই ধনী; অর্থবান্ ধনী নহে। যার মনে সন্তোষ নাই সেই দরিদ্র; অর্থাদি হীন দরিদ্র নহে। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যাদিকে যে জয় করিতে পারে না সেই কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণ নহে। রাজসিক-তামসিক গুণ যাহাতে নাই এজগতে তিনিই ঈশ্বর, রাজা প্রভৃতি ঈশ্বর নয়। রাজসিক-তামসিক গুণে—অর্থাৎ হিংসা-ক্রোধ-নশ্বর-বস্তুতে যাহার আসক্তি, সেই বিপরীত জীব অনীশ্বর, অর্থাৎ মায়া-মুগ্ধ জীব জানিবে। হে উদ্ধব! তুমি যে সব প্রশ্ন করিয়াছিলে তাহা উত্তমরূপে নির্ণয় করিয়া কহিলাম। গুণদোষের কথা আর বহুৎ কি বর্ণনা করিব? গুণদোষ দর্শনে দোষ; গুণও দেখি না দোষও দেখি না—এইরূপ স্বভাবই গুণ জানিবে। আহা এই চিরতৃপ্তিকর উপদেশ-

সুধা যাহার বদনচন্দ্রমা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, সেই কৃষ্ণকরুণানিধির আবির্ভাবভূমি এই পুণ্য ভূমি ভারতখণ্ড! ভারতের জীব—ভারতের কেন, সারা জগতের জীব, যতদিন না এই উপদেশামৃত পান করিবে, যতদিন না এই কৃষ্ণচন্দ্রমার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, ততদিন তাকে পিপাসিত প্রাণে দস্যুর ন্যায় ঘুরিতে হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। মোহনিদ্রায় নিদ্রিত জীব! স্বপ্ন-দৃশ্য দর্শন করে কখন হাসিতেছ, কখন কাঁদিতেছ, একবার শ্রীগুরুর আহ্বানে জাগরিত হও! জেগে ওই দেখ তোমার ভাগ্যগগনে ভক্তি-দিবার কোলে সেই দিনমণিমণ্ডল-মণ্ডন করুণানিধি কৃষ্ণ রাধাসহ বর্তমান! ভক্তির দিকে দৃষ্টি না করিলে এই সুখমূর্ত্তিকে তুমি দেখিতে পাইবে না, দেখিতেও ইচ্ছা জন্মিবে না। তুমি চিরদিন মোহ-ঘুমের ঘোরে কেবলমাত্র কখন সুখের কখন দুঃখের স্বপ্ন মাত্র দেখিবে। তুমি অধ্যাত্মতত্ত্ব বল আর অহং ব্রহ্মতত্ত্ব বল এসব ঘুমঘোরের স্বপ্ন ভিন্ন কিছুই নয় জানিবে। অধ্যাত্ম্য তত্ত্ব তোমার এইরূপ মায়ার বন্ধন ভিন্ন আর কিছুই নয়। যাহা জগতে-বাহিরে বিদ্যমান, তা আমার আত্মার অধিকারে বা দেহের ভিতরে আছে, ইহা লইয়া যে আনন্দ তাহাই আধ্যাত্ম্য-তত্ত্ব। একজনকে বলা হইল 'বৃন্দাবন যাবে'? সে বলিল না, 'আমার মনের ভিতর বৃন্দাবন। মনের ভিতর ওসব আছে।' আমি 'ভাল' বলিয়া হাসিতে লাগিলাম। এমন সময় একটি বালক ও একটী নারীকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া আমি বলিলাম—'এ দুটী কারা'? সেই আধ্যাত্ম্য পণ্ডিত বলিল—'এইটি আমার পুত্র আর ওইটি আমার স্ত্রী'। আমি বলিলাম—'এ আবার বাহিরে কেন? মনের ভিতর যদি বৃন্দাবন হয়, মনের ভিতর যদি বিশ্ব-সংসারটা হয়, তবে ছেলেটা আর বৌটা বাহিরে কেন দেখ্‌ছি'? সেই হস্তীমূর্খ বলিল—'এগুলো বাহিরে, বৃন্দাবন মনের ভিতরে'। আমি

বলিলাম—'তোমার তুল্য পশু-মানুষ এ ভিন্ন আর কি বল্‌বে ! ঠাকুরসেবা কর্ব্ব মনে, স্ত্রীসেবা কর্ব্ব বাহিরে। ভিখারীকে মনে মনে লাখ টাকা দেব, বাহিরে এক পয়সাও দেব না। ধর্ম্ম কর্ব্ব মনে, পাপ কর্ব্ব বাহিরে। পাপের সাজে ঘরকে সাজাব, ধর্ম্মের সাজে সাজাব না। যার দ্বারা নরক-জ্বালা ভোগ করবে সেইগুলোকে বাহিরে সাজয়ে রাখব, যার দ্বারা মন সুখসাগরে ডুবে যাবে তাকে মনে মনে রাখব, অর্থাৎ চোখের কাছ থেকে তাড়িয়ে দেব ; বলিহারী তোমার বুদ্ধি ! তোমার স্ত্রীপুত্র যেমন বাহিরে, সেইরূপ বৃন্দাবনও বৃন্দাবনের ঠাকুর বাহিরে আছে ; তবে তোমাদের অধ্যাত্ম-পণ্ডিত-মূর্খেরা খুব দরিদ্র, তাই মল্লিকাফুলহার মালীর ঘরে কিন্‌তে মেলে, কেনবার মূল্য নাই, কাজে কাজেই মনে মনে মল্লিকার হার গলায় পরে।' বাস্তবিক ভক্তিযোগের সাকার উপাসনা ত্যাগ করে, যারা অধ্যাত্ম-যোগে গমন করে তাহারা নাস্তিক নরক-ভোগী ভিন্ন কিছুই নয়। সেই আধ্যাত্ম্য পণ্ডিত বলিল—'সত্যই ত প্রভু।' লোক সৃষ্টিরত উচ্চাভিমানী ব্রহ্মা গোপবালকবৃন্দের উচ্ছিষ্ট-ভোজী করুণানিধি কৃষ্ণ পরমেশ্বর কিনা জানিবার জন্য গোবৎসসহ গোপবালকগণকে হরণ করিয়া গুপ্তভাবে রাখেন ; পরে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক গোবৎসাদি তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করতঃ, স্বীয় পাপ-নাশ-জন্য গোচারণকার্য্যনিরত শ্রীকৃষ্ণকে স্তবাদি করেন। তাহাই জগতে ব্রহ্মসংহিতা নামে খ্যাত। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর দাক্ষিণাত্য নিবাসী ভক্ত সুধীগণের নিকট হইতে উক্ত সংহিতা এদেশে আনিয়া প্রচার করিয়াছেন, ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন হেতু উক্ত সংহিতার সপ্ত-বিংশস্তোত্রসমূহের বঙ্গত্রিপদীতে অনুবাদপূর্ব্বক মূলশ্লোকসহ এই প্রবন্ধ-গ্রন্থে প্রকাশ করিতেছি—

## প্রথম স্তোত্র

চিন্তামণি প্রকর সদ্মসু কল্পবৃক্ষ
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভি পালয়ন্তম্।
লক্ষ্মী সহস্র শত সম্ভ্রম সেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনুবাদে ইহার অর্থ যথা—

সে স্থানের গৃহচয়, চিন্তামণি জ্যোতিৰ্ম্ময়,
তাহা দ্বারা হয় নিরমাণ।
লক্ষ লক্ষ কল্পতরু, বেড়িয়েছে অতি চারু,
নাহি স্থান গোকুল সমান॥
সেই স্থানে কামধেনু, পালিছে বাজায়ে বেণু,
লক্ষ গোপরমা সমাদরে।
সেবা করে সুখকন্দ, আদি পুরুষ গোবিন্দ,
তাঁরে আমি ভজি ভক্তিভরে॥

## দ্বিতীয় স্তোত্র

বেণুং ক্বনন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং।
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদ সুন্দরাঙ্গম্।
কন্দর্প কোটি কমনীয়-বিশেষ-শোভং;
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনুবাদে ইহার অর্থ যথা—

বেণু বাজাইছে যেই, কমল নয়ন সেই,
শিরে শিখি পিঞ্ছ চূড়া শোভা।

সুনীল জলদবর, সম চারু কলেবর,
কোটী কন্দর্পের মনলোভা ॥
এ হেন রূপেতে যার, নয়ন না ভুলে তার
বৃথা জন্ম এই ভবঘরে।
আদি পুরুষ গোবিন্দ, ভুবন-নয়ননান্দ
তাঁরে আমি ভজি ভক্তিভরে ॥

## তৃতীয় স্তোত্র

আলোল চন্দ্রকলসদ্বনমাল্যবংশী,
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলীকলাবিলাসম্।
শ্যামংত্রিভঙ্গললিতং নিয়ত প্রকাশং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অনুবাদে ইহার অর্থ যথা—

ময়ূরপুচ্ছ চন্দ্রক, কাঁপিছে দিয়ে ঝলক,
যাঁহার মোহন চূড়া পরে।
গলে যাঁর বনমালা, করযুগে রত্নবালা,
বাঁশী শোভে রক্তিম অধরে ॥
পীরিতির মধু হাসি, অধরে মিলেছে আসি,
বিলাসপণ্ডিত শ্যামরায়।
ত্রিভঙ্গ সচ্চিদানন্দ, আদি পুরুষ গোবিন্দ,
মজিয়া যে ভজি ওই পায় ॥

## চতুর্থ স্তোত্র

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি ;
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দ-চিন্ময়-সদুজ্জ্বল-বিগ্রহস্য,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অনুবাদার্থ যথা—

সমুজ্জ্বল শ্রীবিগ্রহ, চিন্ময় আনন্দ সহ,
প্রতি অঙ্গে সর্ব্বেন্দ্রিয় রয়।
তাহা দ্বারা চিরকাল, পালে বিশ্ব সুবিশাল,
ধরে দেখে ত্রুটি নাহি হয় ॥
হেন যশোদানন্দন, দুঃখতপ্ত সুখ-ঘন,
দুখী জীব তাঁরে না ভজিয়া।
আদি পুরুষ গোবিন্দ, ভুবন-নয়নানন্দ,
ভজি তাঁর গুণেতে মজিয়া ॥

## পঞ্চম স্তোত্র

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নব যৌবনঞ্চ।
বেদেষু দুর্ল্লভমদুর্ল্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি

অনুবাদার্থ যথা—

যাঁহার দ্বিতীয় নাই, অনাদি অচ্যুত ভাই,
সর্ব্ব আদ্য পুরুষপুরাণ।
অনন্ত নব-যৌবন, যাঁর দেহে সর্ব্বক্ষণ,
বেদের দুর্ল্লভ ভগবান॥
স্বীয় ভক্তিযোগ যথা, ভক্তপাশে বদ্ধ তথা,
অসীম সসীম ভক্তি বলে।
আদি পুরুষ গোবিন্দ, নিখিল-নয়নানন্দ,.
ভজি আমি রহি পদতলে॥

## ষষ্ঠ স্তোত্র

পন্থাস্তু কোটি শত বৎসর সংপ্রগম্যো,
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্।
সোঽপ্যস্তি যৎ প্রপদ-সীম্ন্যবিচিন্ত্য-তত্ত্বে,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনুবাদার্থ যথা—

বায়ুমুনিগণ মন যে পথে করে গমন
বহু কষ্টে শতকোটি বর্ষে।
অচিন্ত্য-গোবিন্দ পদ- নখাগ্রের সুসম্পদ
সেই পথ বিরাজিত হর্ষে॥
শ্রীকৃষ্ণকরুণানিধি গুণনিধি প্রেমনিধি
যে না ভজে সেই মৃতপ্রায়।
আদি পুরুষ গোবিন্দ নিখিল-নয়নানন্দ
ভজি আমি মজি রাঙ্গা পায়॥

## সপ্তম স্তোত্র

একোঽপ্যসৌ রচয়িতু জগদণ্ডকোটীং,
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ।
অণ্ডান্তরস্থ পরমাণু-চয়ান্তরস্থং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনুবাদার্থ যথা—

একক হইয়া যিনি, অণ্ডকোটীপ্রসবিনী,
মহাশক্তি করেন ধারণ।
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড যাঁর, দেহ মধ্যে চমৎকার,
কিন্তু আছে পৃথক আপন॥
পরমাণু জীব-চয়, তাতে অবস্থিত হয়
ভ্রমে তাঁর না করে সন্ধান।
আদি পুরুষ গোবিন্দ, ভুবন-নয়নানন্দ,
ভজি তাঁরে এ প্রাণের প্রাণ॥

## অষ্টম স্তোত্র

যদ্ভাব-ভাবিতধিয়ামনুজা স্তথৈব,
সংপ্রাপ্য রূপ-মহিমাসন-যানভূষাং।
সূক্তৈর্যমেব নিগম প্রথিতৈ স্তবন্তি,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনুবাদার্থ যথা—

ভক্তিযোগে একাসনে, বসিয়া যে নিরজনে,
তাদৃশ স্বরূপ জীব পায়।
রূপ মহিমা আসন, সখ্য-যানাদি ভূষণ,
যাদৃশী ভাবনা আছে তায় ॥
যত নিগম-কথিত, সূক্ত গীত সুললিত,
স্তবন করেন যাঁরে হায়।
আদি পুরুষ গোবিন্দ, নিখিল-নয়নানন্দ,
মজি আমি ভজি তাঁর পায় ॥

## নবম স্তোত্র

আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভি,
স্তাভির্য এব নিজরূপ তয়া কলাভিঃ।
গোলক এব নিবসত্যখিলাত্ম ভূতো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

অনুবাদার্থ যথা—

গোলক নিজের স্থানে, বিরাজিত ফুল্ল প্রাণে,
অখিলের প্রাণ-প্রিয়-ধন।
সঙ্গে ব্রজদেবিগণ, প্রিয়তমা সর্ব্বক্ষণ,
করে যার চরণ সেবন ॥
চিদানন্দ-দেহরূপা, গোপীকুল সুখ-কূপা,
পতি-ভাবে করে প্রেমদান।
আদি পুরুষ গোবিন্দ, নিখিল-নয়নানন্দ
ভজি তাঁরে এ প্রাণের প্রাণ ॥

## দশম স্তোত্র

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনুবাদার্থ যথা—

অচিন্ত্য-শ্যাম-সুন্দর, রূপগুণলীলাধর,
কিন্তু প্রেমাঞ্জন-মাখা নেত্রে।
হেরিতেছে সাধুগণ, যা'র রূপ সর্ব্বক্ষণ,
হৃদয়-কমল-ব্রজ-ক্ষেত্রে॥
ব্রজ-গোকুল-বিহারী, মোহন-মুরলীধারী,
গুণে যাঁর চরাচর কাঁদে।
আদি পুরুষ গোবিন্দ, নিখিল-নয়নানন্দ,
ভজি তাঁরে পড়ি প্রেমফাঁদে॥

## একাদশ স্তোত্র

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকোরদ্ ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমং পুমাণ যো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনুবাদার্থ যথা—

রামনৃসিংহাদিরূপে, আসে এই ভবকূপে,
নানারূপ করে অবতার।
অবতারে কলাভাবে, কিন্তু রহে পূর্ণভাবে,
কৃষ্ণরূপে স্বয়ং বিহার॥
পরম পুরুষ কৃষ্ণ, অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ নয়নের সুখকর।
আদি পুরুষ গোবিন্দ, যশোদা-নয়নানন্দ
ভজি আমি সেই বেণুধর॥

## দ্বাদশ স্তোত্র

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটী,
কোটীষ্বশেষবসুধাদি বিভূতি ভিন্নং।
তদ্‌ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনুবাদার্থ যথা—

অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড, অসংখ্য বসুধা-খণ্ড,
বিভূতিতে করি নিরমাণ।
ভেদপ্রাপ্ত হয় যিনি, অনন্ত নিষ্কল তিনি,
ব্রহ্মজ্যোতি নামে কীর্ত্তিমান॥
অশেষ সে ব্রহ্মজ্যোতি, যে কৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতি
যাহে হয় অখিল সংসার।
আদিপুরুষ গোবিন্দ, নন্দের নয়নানন্দ
ভজি সেই সর্ব্বসুখাগার॥

## ত্রয়োদশ স্তোত্র

মায়াহি যস্য জগদণ্ডশতানি সূতে,
ত্রৈগুণ্য তদ্বিষয় বেদবিতায়মানা।
সত্ত্বাবলম্বি পরসত্ত্ব বিশুদ্ধ সত্ত্বং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি

অনুবাদার্থ যথা—

যাঁর বহিরঙ্গা মায়া, স্বমূর্ত্তির যথা ছায়া,
শত শত ব্রহ্মাণ্ড প্রসূতি।
সত্ত্বরজতমময়ী, বেদেতে বিস্তারময়ী
কে বুঝিবে কৃষ্ণের বিভূতি ॥
রজতম বিমিশ্রিত সত্ত্বগুণ সমাশ্রিত
অথচ বিশুদ্ধ সত্ত্বধাম।
আদিপুরুষ গোবিন্দ, শ্রীরাধা-নয়নান্দ,
ভজি তাঁরে অভিনব কাম ॥

## চতুর্দ্দশ স্তোত্র

আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়ামনঃসু
যঃ পাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অনুবাদার্থ যথা—

আনন্দ চিন্ময় রস, উজ্জ্বল সে মহারস,
সে রসে নির্ম্মিত তনু যাঁর।
জীবের মানস-পটে সুবিম্বিত অকপটে
বর্ত্তমান-মদন-আকার ॥
অলৌকিক লীলা করি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভরি
সর্ব্ব বিশ্ব করিছে বিজয়।
আদি পুরুষ গোবিন্দ শ্রীরাধা-নয়নানন্দ
ভজি আমি সেই প্রেমময় ॥

## পঞ্চদশ স্তোত্র

গোলকনাম্নি নিজ ধাম্নি তলে চ তস্য,
দেবী-মহেশ-হরি-ধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া, বিহিতাশ্চ যেন,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

অনুবাদার্থ যথা—

গোলক শ্রীবৃন্দাবন সর্ব্বোপরে সুমোহন
সেই স্থানে নিজে সদা রয়।
বিষ্ণুধাম শিবধাম দেবীধাম যার নাম
ক্রমে নিম্নে সর্ব্ব ধামচয় ॥
সর্ব্ব ধামে ধামপতি সৃজিয়া যে রাধা-পতি
স্ব-প্রভাব করেন বিস্তার।
আদি-পুরুষগোবিন্দ শ্রীরাধা-নয়নানন্দ
ভজি আমি সেই সারাৎসার ॥

## ষোড়শ স্তোত্র

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধনশক্তিরেকা,
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দূর্গা।
ইচ্ছারূপমপি যস্য চ চেষ্টতেসা;
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনুবাদার্থ যথা—

সৃজন পালন লয় যেই শক্তি হইতে হয়
সেই শক্তি দূর্গা যাঁর ছায়া।
সর্ব্ব ভুবনপালিনী ইচ্ছাতে কার্য্যকারিণী
ভক্ত জানে তাঁর এই মায়া॥
শ্রীকৃষ্ণ পরম-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ পরম-সত্ত্ব
মায়া-মুগ্ধ তাঁরে নাহি জানে।
আদিপুরুষ গোবিন্দ শ্রীরাধা-নয়নানন্দ
ভজি তাঁরে প্রাণ-প্রিয় জ্ঞানে॥

## সপ্তদশ স্তোত্র

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে নহি ততঃ পৃথগস্তি-হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনুবাদার্থ যথা—

দম্বলের যোগে যেন দধি দুগ্ধ হয় হেন
দধির কারণ দুগ্ধ যথা।
দধি হেতু ভিন্ন নাই সেইরূপ রুদ্র ভাই
রুদ্র সংহারের হেতু তথা ॥
দধি হতে দুগ্ধ নয় রুদ্র হ'তে কৃষ্ণ নয়
কৃষ্ণ হতে রুদ্রের উদ্ভব।
আদি পুরুষ গোবিন্দ শ্রীরাধা-নয়নানন্দ
ভজি আমি নহে মিথ্যা সব ॥

## অষ্টাদশ স্তোত্র

দীপার্চ্চিরেবহি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃত-হেতু-সমান ধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণু তয়া বিভাতি,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অনুবাদার্থ যথা—

যেমন প্রদীপ জ্যোতি অন্য বত্তিযোগে জ্যোতি
ধরিয়া পৃথক দীপ হয়।
প্রথম প্রদীপ হতে ভিন্ন নহে হেন মতে
কৃষ্ণ হতে বিষ্ণু প্রকাশয় ॥
বিষ্ণু সংসার পালনে কৃষ্ণ রহে বৃন্দাবনে
পালেন নিজের প্রিয় ধাম।
আদিপুরুষগোবিন্দ শ্রীরাধা-নয়নানন্দ
ভজি সেই নটবর শ্যাম ॥

## ঊনবিংশ স্তোত্র

যঃ কারণার্ণব জলে ভজতিস্ম যোগ-
নিদ্রামনন্ত-জগদণ্ড-সরোমকুপঃ।
আধার শক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্ত্তিং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অনুবাদার্থ যথা—

কারণ-সমুদ্র-নীরে যোগনিদ্রা-গত ধীরে
আধার শকতি ধরি যেই।
আধার সে শেষরূপ সঙ্কর্ষণ নিজ রূপ
তাহাতে শয়ন করে সেই ॥
প্রতি রোমকূপে যাঁর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভার
সৃষ্টি হয় স্বকীয়-প্রভাবে।
আদিপুরুষগোবিন্দ শ্রীরাধা-নয়নানন্দ
ভজি তাঁরে প্রাণপ্রিয়ভাবে ॥

## বিংশ স্তোত্র

যস্যৈকনিশ্বসিত কালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহযস্য কলা-বিশেষো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অনুবাদার্থ যথা—

নিশ্বাস সময়ে যার অনন্ত কোটী সংসার
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবসহ হয়।
লোমবিলে জনমিয়া বিশ্বলীলা বিকাশিয়া
প্রশ্বাস সময়ে যাহে লয়।
সেই মহাবিষ্ণু যাঁর কলা অংশ অবতার
তত্ত্বদর্শী সকলেই জানে।
আদিপুরুষগোবিন্দ শ্রীরাধা-নয়নানন্দ
ভজি তারে প্রাণ-প্রিয় জ্ঞানে।

## একবিংশ স্তোত্র

ভাস্বান্ যথাশ্ম-শকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনুবাদার্থ যথা—

যেমন তপনকর সূর্য্যকান্ত মণি পর
পড়িয়া দাহিকা-শক্তি ধরে।
সেরূপ ব্রহ্মাতে সেই শক্তিকণা দিয়া এই
সকল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে॥
এমন যে সারাৎসার শ্রীকৃষ্ণকরুণাধার ;
বাঁকা-সখা সুখের সদন।
আদিপুরুষগোবিন্দ শ্রীরাধা-নয়নানন্দ
ভজি সেই ভুবনমোহন॥

## দ্বাবিংশ স্তোত্র

যৎপাদ-পল্লব-যুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণাম-সময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনুবাদার্থ যথা—

সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন, যেই দেব গজানন
যাঁহারে করিয়া নমস্কার।
চরণ-কমল ধূলি লয় শির-কুম্ভে তুলি
পায় বিঘ্ননাশ শক্তি-ভার॥
কালিন্দী-পুলিনচারী সেই ত মুরলীধারী
কৃষ্ণ মোর নয়নের তারা।
আদিপুরুষ গোবিন্দ শ্রীরাধা-নয়নানন্দ
ভজি তারে হয়ে আত্মহারা॥

## ত্রয়বিংশ স্তোত্র

অগ্নির্মহীগগনমম্বু-মরুদ্দিশশ্চ
কাল স্তথাত্ম-মনসীতি জগত্ত্রয়াণি।
যস্মাদ্ ভবন্তি বিভবান্তি বিশন্তি যঞ্চ,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

অনুবাদার্থ যথা—

আকাশ-পৃথিবী-জল পবন-দিক্-অনল
কাল, আত্মা, আর এই মন।
ইহাতেই ত্রিসংসার সৃষ্টি হয় অনিবার
যাঁর গুণে গুনো জীবগণ॥
যাহাতে পালন হয় যাঁতে পুন পায় লয়
এই সব শ্রীকৃষ্ণের খেলা॥
আদিপুরুষগোবিন্দ শ্রীরাধা-নয়নানন্দ
ভজি আমি না করিয়া হেলা॥

## চতুর্ব্বিংশতি স্তোত্র

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকল গ্রহাণাং
রাজা সমস্ত সুরমূর্ত্তিরশেষ তেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃত-কালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনুবাদার্থ যথা—

সকল গ্রহের রাজা তপন অশেষ তেজা
সর্ব্ব দেব মূর্ত্তি হয় যিনি।
এমন সবিতা যেই প্রকাশ করিছে সেই
সূর্য্যের নয়ন কৃষ্ণ তিনি॥
কালচক্র হাতে ধরে ভ্রমিতেছে এ সংসারে
যাহার আদেশে দিবাপতি।
আদিপুরুষ গোবিন্দ শ্রীরাধা-নয়নানন্দ
ভজি আমি হয়ে শুদ্ধ মতি॥

## পঞ্চবিংশ স্তোত্র

ধর্ম্মোঽথ পাপ নিচয়ঃ শ্রুতয়স্তপাংসি,
ব্রহ্মাদি-কীটপতগাবধয়শ্চ জীবাঃ।
যদ্দত্তমাত্র-বিভব-প্রকট-প্রভাবাঃ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অনুবাদার্থ যথা—

ধর্ম্ম পাপ তপ শ্রুতি ব্রহ্মা হইতে বিভূতি
কীট-পতঙ্গাদি জীবচয়।
যাঁহার প্রভাব বলে চলিতেছে ভবতলে
ইথে কোন নাহিত সংশয় ॥
সকলের সুবিচার করি যেই গুণাধার
স্বেচ্ছাচারে করেন পালন।
আদিপুরুষগোবিন্দ শ্রীরাধা-নয়নানন্দ
ভজি আমি লইয়া শরণ ॥

## ষড়বিংশ স্তোত্র

যস্ত্বিন্দ্র গোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপ-ফলভাজনমাতোনতি।
কর্ম্মানি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অনুবাদার্থ যথা—

অহো! ইন্দ্র-গোপ-কীট কিংবা ইন্দ্র দৈত্যদ্বিট
যাঁর পাশে সকলে সমান।
অনুরোধ নাহি মানে প্রত্যেকের কর্ম্ম-জ্ঞানে
কর্ম্মফল করেন প্রদান ॥

কিন্তু ভক্ত-কর্ম্মফল, দগ্ধ করি মহাবল,
দেয় স্থান সুখের সদনে।
আদিপুরুষ গোবিন্দ, শ্রীরাধা-নয়নানন্দ,
ভজি তাঁরে জীবনে মরণে॥

## সপ্তবিংশ স্তোত্র

যং ক্রোধকাম-সহজ-প্রণয়াদি-ভীতি-
বাৎসল্য-মোহ-গুরু-গৌরব-সেব্যভাবৈঃ।
সচিন্ত্য তস্য সদৃশীং তনুমাপুরেতে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনুবাদার্থ যথা—

কাম-ক্রোধ-সখ্য-ভয়, বাৎসল্যাদি ভাবচয়,
মোহ-গুরু-গৌরবাদি ভাবে।
ভাবিয়া সর্ব্বদা যারে, প্রাপ্ত জীব ভাবাধারে,
বিষে বিষ, সুধা সুধাভাবে॥
পত্নীভাবে পত্নীদেহ, মাতৃভাবে মাতৃদেহ,
পতি-পুত্ররূপে দেয় সুখ।
আদিপুরুষ গোবিন্দ, শ্রীরাধা-নয়নানন্দ,
ভজি আমি নহে সদা দুখ॥

## লঘু ত্রিপদী

এ ব্রহ্মসংহিতা, মধুর কবিতা
বৈষ্ণবসিদ্ধান্তসার।
বেদ-প্রতিপাদ্য, অনাদির আদ্য,
গোবিন্দ-তত্ত্ব বিচার॥

এ প্রবন্ধহার, তাহে পুষ্পসার,
ভাষা কবিতাতে গাঁথি।
পড়ি ভক্তকুল, হ'বে সুখাকুল,
এই সুখাশায় মাতি ॥
এ করুণানিধি, ব্রজ-সুধানিধি,
পরবন্ধে পরকাশ।
সংহিতা মহান্ কৌস্তুভ সমান
হইল তাহে বিকাশ ॥
ব্রজভাব নিয়া, বুকেতে ধরিয়া
যে জন সদাই রয়।
যুগল মিলন, করি দরশন
সে করে শমন জয় ॥
গৌরাঙ্গচরণ, করিয়া শরণ,
যেমন প্রেরণা জাগে।
করিয়া তেমন, করিনু রচন
ধরি সুধীজন আগে ॥
শ্রীরাধা চরণ, যাহার জীবন,
পুলিনবিহারী দাস।
শুদ্ধ চারিশত পঞ্চ-চত্বারিংশ
চৈতন্যাব্দ পরকাশ ॥
শুভাশ্বিন মাস, তাহে সুখবাস,
শ্রীকৃষ্ণকরুণানিধি।
এ নামে প্রবন্ধ, কৈলা নিরবন্ধ,
জানিয়া কলির বিধি ॥

গন্থ পরবন্ধে, গাঁথিলা সুছন্দে
এ ব্রহ্মসংহিতা-সার।
শ্রবণ ললিত, পরম পুনীত,
শুনি হয় ভবপার ॥

লোক-সৃষ্টিকারী প্রজাপতি ব্রহ্মা যে করুণানিধিকে সর্ব্বেশ্বর জ্ঞানে এই ব্রহ্মসংহিতা স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, সেই করুণানিধি কৃষ্ণকে রাক্ষস-অসুর প্রকৃতির মনুষ্যেরা যাদুকর বলিয়া তাঁর চরণে ভক্তিহারা হয়, এবং দস্যু-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে করিতে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হয়। কৃষ্ণ কি যাদুর দ্বারা জগতকে ভুলান, না সকলের তৃপ্তিকর রূপ-গুণ দ্বারা জগৎকে মুগ্ধ করেন—ইহারই বিচার করিব। চাঁদকে দেখিয়া কে না মুগ্ধ হয়? চাঁদকে কে না ভালবাসে? কিন্তু চাঁদকে দেখিয়া সকলে মুগ্ধ, চাঁদকে সকলে ভালবাসে বলিয়া, চাঁদ কি যাদুকর হইল! চাঁদ কি কোন যাদুমন্ত্র করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আমার দিকে দেখ বলিয়া আমাকে ভালবাস বলিয়া, তা কখনই সম্ভব নয়। মূঢ় জীব! ভিতরে হক্ বা বাহিরে হক্ সুন্দর বস্তুকে যিনি ধারিয়াছেন, তিনি সকলের ভালবাসা প্রাপ্ত হইবেন; ইহাতে কোন যাদুমন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। চাঁদ বাহিরের সৌন্দর্য্যে জগৎকে ভুলাইতেছে, কোকিল ভিতরের সৌন্দর্য্যে জগৎকে ভুলাইতেছে। কাক কোকিল তুল্য কাল বটে, কিন্তু কোকিলকে সকলেই ভালবাসে, কাক ডাকিলে তাড়াইয়া দেয়, কেউ তাকে ভালবাসে না। ইহার কারণ তাহার ভিতর কোন সুন্দরতা নাই। কোকিলের সুন্দর কণ্ঠস্বর, ভিতর-সুন্দরের জন্য সকলে ভালবাসে বলিয়া কোকিল কি যাদুকর হইল! যাহার ভিতরে বাহিরে কোন সুন্দরতা নাই, যাদু করিয়া লোক ভুলাইতে সেই চেষ্টা করে; চিরসুন্দর যে তার আবার যাদু কি!

একজন দরিদ্র যাদুকর বহু লোক সমক্ষে বস্ত্রের মধ্যে একটি টাকা হইতে এক অঞ্জলী টাকা করিয়া, লোকসকলকে মুগ্ধ করিল ; আর একজন ধনী পথে যাইতে যাইতে দরিদ্রদিগকে দর্শনপূর্ব্বক নিজ বেশ-বস্ত্রাদির ভিতর হইতে সহস্র মুদ্রা বাহির করতঃ দরিদ্রকুলকে বণ্টন করিয়া দিল, দরিদ্রেরা মুগ্ধ হইয়া সেই ধনবানের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতে লাগিল, ইহাতে সেই ধনবান কি যাদুকর হইল এবং সেই ধনী যদি কোন অদ্ভুত খেলা দেখায় তাহাতেও তিনি যাদুকর পদবাচ্য নয় ? সেইরূপ সুখধাম করুণানিধি কৃষ্ণ দুঃখী নিজ ব্রজবাসী ভক্তগণকে সুখ দেবার জন্য গোবর্দ্ধনধারণ, কালীয় সর্পের মস্তকে নর্ত্তন, বেণুবাদন দ্বারা ব্রজবালাদের মনমোহন করিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণ যাদুকর হইল, ইহা কেবল মূর্খ নারকীদের কথা মাত্র জানিবে। কৃষ্ণের মায়া-সংসার বা যদুবংশ ধ্বংস যাদুকরের ন্যায় বিনোদ মাত্র। এই হেতু আরও বলি তদ্গত প্রাণ ভক্তেরা তাঁহাকে যাদুকরের ন্যায় বিনোদকারী-জ্ঞানে 'তুমি যাদুর দ্বারা আমাকে ভুলাইয়াছ, তুমি মনচোর, বসন চোর' প্রভৃতি প্রেম-মাখা গালি দিয়া সুখাদাতা তাহাতেই আসক্ত হন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ নন্—কদাপি মনে করেন না। ওরে মূর্খকুল ! যাদু ত তাহাকে বলে, যাহাকে মিথ্যা জানিয়াও সকল শ্রেণীর লোক যাহাতে মুগ্ধ হয়। যেমন কোন বালক একটি বালিকাবেশ ধরিয়া নাচিতেছে, গাহিতেছে, সকলে তাহাতে মুগ্ধ হইতেছে ; সে বালিকা নয় এ কিন্তু সকলেই জানে, এইরূপ মিথ্যাবস্তু সত্যরূপে প্রকট হইয়া সকলের আনন্দদানের হেতু হইলে যাদু নাম ধারণ করে। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক যাহাকে ভালবাসে, আর এক শ্রেণীর লোক যাহাকে ভালবাসে না, তাহা কখনই যাদু হইতে পারে না। এক শ্রেণী যাহাকে প্রাণদিয়া ভালবাসে, আর এক শ্রেণী যাহাকে প্রাণ দিয়া ত্যাগ করে, তাহা কখনই

যাদু নয়। ভক্ত রক্ষার জন্য গোবর্দ্ধনধারণাদি যাদু নহে, মিথ্যা বস্তু দিয়া পাপীকে ভুলানো কৃষ্ণের যাদুলীলা জানিবে। যেহেতু সর্ব্বশক্তিমানে সর্ব্বসম্ভব। সুস্থ-দেহের মুখে মিশ্রি মিষ্ট লাগে, পিত্ত রোগীর মুখে তাহা তিক্ত লাগে, ইহাতে মিশ্রিতে যাদুকরত্ব আছে কেউ বলিবে না। সেইরূপ কৃষ্ণ ভক্তের কাছে সর্ব্বসুখদাতা ভগবান, অভক্ত মায়ারোগীর কাছে একজন মানব যাদুকর। ইহাতে কৃষ্ণের ও কৃষ্ণভক্তের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। পেঁচার চোখে চাঁদের আলো সহ্য হইল না, চীৎকার করিয়া চাঁদকে গালি দিতে দিতে অন্ধকারের ভিতর প্রবেশ করিয়া মূষিক-রাজ্য ধ্বংস করিতে লাগিল। এদিকে দ্বিতীয়ার চাঁদ কুমুদ-চকোরকুলের উপর সুধা বর্ষণ করিয়া নিশাবক্ষে লুকাইল; এই সময়ে অন্ধকার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হওয়াতে পেঁচার দল বাহিরে আসিয়া আনন্দে উড়িতে উড়িতে পরস্পরে বলিতে লাগিল, "আঃ বেঁচেছি আপদ গেছে। কেমন সুন্দর অন্ধকার! মনের আনন্দে ইঁদুর খাচ্ছি, আর উড়ে বেড়াচ্ছি। বেটা চাঁদ এসে চোখ জ্বালাতে লাগ্‌ল, তেমনই ইঁদুর ধর্‌তে পার্‌লাম না, আকাশেও উড়্‌তে পার্‌লাম না। চাঁদ বেটাকে আকাশে আর আস্‌তে দেব না; সে এলেই আমাদের সুখে খাওয়া বেড়ান প্রভৃতি হবে না।" মূর্খ পেঁচারা এ জানে না যে কাল আবার তৃতীয়ার চাঁদ আকাশে উঠে তাদের এ আশায় জলাঞ্জলি দেবেন। যে হেতু আজ যে পরিমাণে বেশী আঁধার, কাল আবার সেই পরিমাণে বেশী চাঁদের আলো, সেইরূপ অধর্ম্ম অন্ধকারে পেচক তুল্য হিংসুক পাপীকুল, কৃষ্ণকে যাদুকরাদি বলিয়া যে আত্মসুখে রত আছে, বৃন্দাবন-চন্দ্রমার ধর্ম্মজ্যোৎস্নার বিকাশ হইলে তেমনি তারা দুঃখ ভোগ করিবে। ভক্ত-চকোর-কুমুদকুল! এখন যত বেশী অন্ধকার দেখিতেছ, তখন আবার সেই পরিমাণে আলো দেখিবে। দুঃখিত হয়ো না। পেঁচাদের গর্ব্ব

কতক্ষণের জন্য! আনন্দদাতার স্মৃতি ভুলো না, শীঘ্রই আনন্দ পাইবে। করুণানিধি নিজমুখে অর্জ্জুনকে গীতাতে বলিয়াছেন—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

অর্থাৎ হে সখা! হে অর্জ্জুন! যখন ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, সেই সময়ে আমি তাপিতের জ্বালা জুড়াইবার জন্য পাখার বাতাসের ন্যায় শুদ্ধসত্ত্বদেহ ধরিয়া অবতীর্ণ হই। আমার দেহধারণ, সাধুপালন, দুষ্টদলন ও ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য যুগে যুগে হয় জানিবে।

পুত্রাদি উৎপাদনের জন্য মাত্র নারীসম্ভোগ, ইন্দ্রিয়সুখ জন্য নারী-সম্ভোগাদি একেবারেই পরিত্যাজ্য; অযথা ভাবে নারীসম্ভোগ দ্বারা মানব অজিতেন্দ্রিয় হইয়া সুখধাম করুণানিধি কৃষ্ণকে ভুলিয়া যায়। যেহেতু স্ত্রী-আসক্ত পুরুষ যতই বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হউক না কেন—সে কামী-ক্রোধী-জীবহত্যাকারী-ঘাতক ভিন্ন উত্তম মনুষ্য পদবাচ্য হইতে পারে না। এক বিষয়ী মূর্খ এক দিন আমাকে বলিল—উৎকলদেশে (উড়িষ্যায়) ভ্রাতৃবধূ-গমন, গৌড়দেশে মৎস্যভোজন প্রভৃতি দোষ-জনক নয়। আমি বলিলাম—উৎকল, গৌড় প্রভৃতি যদি পুণ্যভূমি ভারতখণ্ডের মধ্যে হয় এবং এই সব দেশবাসিগণ যদি সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ও বেদপুরাণাদি শাস্ত্র-অনুসারে চলিতে থাকে, তবে তাহাদের পক্ষে ইহা মহাপাপজনক। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী সংসারী মানবকুলের ধর্ম্মাচরণ-সম্বন্ধে মনুরচিত স্মৃতি সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ; ভ্রাতৃজায়াগমনাদি সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন সাধারণের কল্যাণকামনায় এস্থলে তাহার বিচারপূর্ব্বক বিস্তার করিব, যথা—

"নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিত্বা বর্ত্তেয়াতাস্ত কামতঃ।
তাবুভৌ পতিতৌ স্যাতাং স্নুষাগগুরুতল্পগৌ॥
নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনম্॥
নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥
অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যানামপি প্রোক্তং বেণে রাজ্যং প্রশাসতি॥"

ইতি—মনুসংহিতা, নবমোঽধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ পুত্র উৎপাদনে অক্ষম স্বামী বিদ্যমানে স্বামী বা গুরুজনের আদেশ অনুসারে বংশরক্ষার্থ স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অথবা সবংশস্বজন কিংবা কোন মহাপুরুষ দ্বারা নারীজাতিরা গর্ভ গ্রহণ করিতে পারে। বিধবা নারীর পক্ষেও এই রীতি জানিবে। কিন্তু গর্ভ গ্রহণের পর হইতে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূরা পূর্ব্বসম্বন্ধস্থাপন কায়মনোবাক্যের দ্বারা করিবে; কদাচ পতিপত্নী ভাব রাখিবে না। যদি এইরূপ শাস্ত্রানুসারে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভ্রাতা গমন না করে, তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রবধূগমনজনিত মহাপাপ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা গুরুপত্নীগমনজনিত মহাপাপ সঞ্চয় করতঃ নরকে পতিত হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই দ্বিজাতিরা, বিধবা বা নিঃসন্তানা নারীকে কদাপি স্বামীভিন্ন দেবরাদি দ্বারা এমনভাবে পুত্র উৎপাদনে নিয়োগ করে না, যেহেতু এমনভাবে নিয়োগে সনাতন পাতিব্রত্য ধর্ম্মের নাশ হয়। বিবাহমন্ত্রে একের স্ত্রীতে অন্যের যোগকরা বা বিধবাপুনর্ব্বিবাহ করার কোন উল্লেখ নাই। এই কার্য্য শাস্ত্রবেত্তা তপস্বীকুল দ্বারা পশুধর্ম্ম বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। কামাসক্ত পাপপথগামী গর্ব্বিত বেণের রাজত্বকালে এইসব রীতি সংঘটিত

হইয়াছিল। পরম ভক্ত সুগ্রীব, বিভীষণ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া তারা, মন্দোদরীকে যে পবিত্রভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন, কৃষ্ণবহির্মুখ বিষয়াসক্ত জীব তাহা করিতে পারে না, বা বেদব্যাসের ন্যায় কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃজায়াতে পুত্রউৎপাদনরীতি সাধারণ জীব লইতে পারে না। এইজন্য আর্য্য-ঋষিগণ বিধবা বা নিঃসন্তানা নারীতে অন্যের দ্বারা পুত্রোৎপাদন নিষেধ করিয়াছেন। যাহারা বিধবা-বিবাহাদিতে সম্মতি দান করে, তাহারা অজিতেন্দ্রিয় কাপুরুষ ভিন্ন কখনই জিতেন্দ্রিয় তপস্বী মহাত্মা নয়। শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলে জিতেন্দ্রিয় জগৎহিতার্থী মহাত্মা হয় না, তাহা হইলে রাবণ-কংসাদির তুল্য শাস্ত্রজ্ঞ ক'জনই বা আছে? তাহারা রাক্ষস-দৈত্যরূপে জগতের দুঃখদাতা কেন হইয়াছে? যাহারা নারীজাতির অত্যন্ত কোমলহৃদয় বলিয়া বিধবা-বিবাহ দানের জন্য কাঁদিয়া আকুল হয়, তাহারা ভাবিয়া দেখুক দেখি বিধবা-বিবাহ প্রচলন হইলে সেই কোমলত্ব তাহাদের থাকিবে কি! আর যদিও বা থাকে, তবে তাহা অর্থ-লোভিনী বেশ্যার হৃদয়ের কোমলতার তুল্য নয় কি? লক্ষ লক্ষ জীবহত্যা করিয়া যাহাদের দুঃখ হয় না, দু'একটি ভ্রূণহত্যার ছল দেখাইয়া তাহারা যে বিধবা-বিবাহের অনুমোদন করিতেছে, তাহারা কি বিশ্বপ্রেমিক মানব, না মানবাকারে আত্মসুখভোগী কোন হিংস্র জন্তু বিশেষ! ম্লেচ্ছ জাতির সংস্রবে ভারতের এই দশা! যে অসংযতচিত্তা নারী যখন গুপ্তভাবে ভ্রূণহত্যা করে, তজ্জনিত যন্ত্রণাতে সে তৎপ্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে, সেই সময় ঈশ্বরের কাছে করুণপ্রার্থনা বা পতিদেবতার স্মরণ তাহাকে সংযমের পথ দেখায় না কি? বিধবা-বিবাহ রীতি হইলে ইহা থাকিবে না, আর থাকিলেও বেশ্যার ন্যায় ভালবাসা মাত্র থাকিবে। অতএব দু'একটি ভ্রূণহত্যা করিয়া বিধবা থাকা সেও ভাল, তথাপি যে দেশে শ্রীরাধার ন্যায় পরমেশ্বরী, সীতার ন্যায় জগদ্লক্ষ্মী এবং সাবিত্রীর

ন্যায় গৃহলক্ষ্মী আবির্ভাব, সেই দেশে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ মহাজন অনুমোদিত নহে বা হইতে পারে না। কাম-ভোগ-বাসনা পূর্ণ হইল না বলিয়া যে দুঃখ, তাহা ঈশ্বর বহির্মুখ মূঢ় জীবের জানিবে; ঈশ্বরভক্ত জীবের তাহা হইতে পারে না। করুণানিধি কৃষ্ণ সর্ব্বসুখদাতা, তাঁহার দাসদাসীরা যে কামসুখভোগ অনুভব করিতে পারিবে না, ইহা কখনই সম্ভব নয়। অতএব হে জীব! তোমরা নরনারী উভয়েই সমান জানিয়া জগৎপতি করুণানিধি কৃষ্ণের মোহনরূপের ধ্যান কর, নিরপেক্ষভাবে চিরসুখধামে বাস করিতে পারিবে। শাস্ত্রযুক্তি যেরূপ, সেইরূপ কার্য্য কর।

পদ্মপুরাণে শ্রীনারদের উক্তি এইরূপ, যথা—

"যচ্ছরীরং মনুষ্যানামূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং বিনাকৃতম্।
দ্রষ্টব্যং নৈব তৎ তাবৎ শ্মশান সদৃশং ভবেৎ॥"

অর্থাৎ মনুষ্য সকলের মধ্যে যে মনুষ্যশরীর উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র তিলক দ্বারা (রেখার ন্যায় লম্বা তিলক দ্বারা) শোভিত না হইল, সেই শরীর শ্মশান সদৃশ, তাহা একবারেই দর্শনযোগ্য নহে। মায়ামুগ্ধ জীব এই শাস্ত্রযুক্তি যদি মানিয়া চলিত, তাহা হইলে এ সংসার কতই যে সুখ পূর্ণ হইত তাহা কেমন করিয়া বলিব! মানুষ শাস্ত্রযুক্তি না মানিয়া নিজযুক্তিতে যতই চলিতেছে, ততই স্বেচ্ছাচার হেতু এ সংসার দুঃখ পূর্ণ হইতেছে। বর্ত্তমানে শাস্ত্রব্যাখ্যাকারীরা কদাচারী কুভক্ষ্যভোজী; সুতরাং তাহাদের মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া কয়জনেই বা সদাচারী সাত্ত্বিকভোজী হইবে? চোরের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া কয়জনেই বা ধার্ম্মিক হয়? বেশ্যা নারীর সতী সাজিয়া নাট্যগৃহে অভিনয় যেমন তুচ্ছজনক, সেইরূপ কদাচারী সংসারী জীবের শাস্ত্রব্যাখ্যা তুচ্ছজনক। হে জীব! সর্ব্বভূতে সমদর্শী শক্তিমান্ ভগবদ্ভক্তের মুখে শাস্ত্র-যুক্তি শ্রবণ করো; দেখিবে

তোমার নূতন রঙ্ শরীরে আসিবে, এবং কৃষ্ণ-করুণানিধির করুণা-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া সুখ-রত্ন-গ্রহণে সক্ষম হইবে। যে পুণ্যভূমির বৃক্ষ-লতা কল্প-লতার ন্যায় মানবের বলবীর্য্যবর্দ্ধক সুখদায়ক বস্তু, ফল-মূল-পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা দান করিতেছে, যে দেশে গঙ্গাযমুনা-কাবেরী প্রভৃতি নদী কামধেনুর ন্যায় সর্ব্বার্থসাধিকা ক্ষীরনীরা হইয়াছে, সেই দেশের মানব খাদ্যার্থে মৎস্য-পশু-চলৎজীবকে সংহার পূর্ব্বক ঘাতক হইয়া নরকগামী হয়—ঈশ্বর বহির্মুখতার হেতু হইতে জানিবে। মানবের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-ধর্ম্ম-মার্গ-বেত্তা মনু মৎস্য-ভোজন-সম্বন্ধে স্বীয় মনুসংহিতাতে যাহা কহিয়াছেন, মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে তাহা প্রকাশ, যথা—

"যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥"

অর্থাৎ যে যার মাংস ভোজন করে, তাহাকে সেই মাংসভোজী কহে; যেমন নকুল সর্প-ভোজী, বিড়াল মূষিক-ভোজী, কিন্তু মৎস্য-ভোজী সর্ব্ব মাংসভোজী বলিয়া জানিবে; যেহেতু মৎস্য সর্ব্বখাদক, বৃক্ষাদির ন্যায় অবিকৃত বীজতুল্য সার বস্তু ইহারা গ্রহণ করে না। সর্ব্ব অবস্থায় সর্ব্ব জীব-দেহকে ভোজনকারী বলিয়া মৎস্য ভোজন ত্যাগ করাই উচিত। কিন্তু বিষয়াসক্ত জীব পাছে সংহিতার অনাদর করে, সেই জন্য রোহিতমৎস্যাদির ভোজন বিধানপূর্ব্বক সংহিতা পাঠ শ্রবণের রুচি জন্মাইয়াছেন; উদ্দেশ্য, ইহা পাঠশ্রবণ দ্বারা একদিন অবশ্যই মৎস্যাদি ভোজনে অনিচ্ছা আসিবেই আসিবে। পশুমাংস ভোজনসম্বন্ধে মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে যাহা লিখিত তাহা এইরূপ, যথা—

"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥
স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
অনভ্যর্চ্চ্য পিতৃন্ দেবাং স্ততোঽন্যোনাস্ত্যপুণ্যকৃৎ॥
বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্ যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমম্॥
মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥"

অর্থাৎ পশু হত্যাতে অনুমতিদাতা, হতপশুর মাংসবিভাগকারী, স্বয়ং পশুহন্তা, মাংস ক্রয়-বিক্রয়কারী, মাংস-পাককারী, মাংস-পরিবেশক এবং মাংস-ভক্ষক এই কয়জনকেই ঘাতক বলা যায়। ইহা বলিয়া নিত্য-মাংসাদি-ভোজনের জীব-প্রবৃত্তি নাশ করিয়া নিবৃত্তিমার্গে উঠিবার জন্য ধর্ম্মার্থে মাংসভোজন বিধান করিতেছেন; যথা—যে পিতৃদেবতাকে অর্চ্চনা না করিয়া অন্য পশুমাংস দ্বারা নিজ মাংস বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, তাহার তুল্য পাপকারী আর নাই। এখানে দেবতাপূজা পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে মাংসাদি পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে দানপূর্ব্বক স্বকুটুম্ব সেই মাংসাদি-ভোজন করিবে—ইহা নিত্য মৎস্য-মাংস-ভোজন ত্যাগ করাইবার কৌশলমাত্র। দুই চারি বৎসর দেবতাপূজা পিতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মৎস্য-মাংস ভোজন, অন্যভাবে ভোজন না করিলে, একবারে মৎস্য মাংস ভোজন ইচ্ছা নাশ হইবে, বা নাশ হইবার প্রবৃত্তি জাগিবে, সেই জন্য মাংসাদি ভোজন না করার পরম ফল বর্ণন করিতেছেন। প্রতি বৎসর অশ্বমেধযজ্ঞসম্পন্নপূর্ব্বক শত বৎসর

এইরূপ করিলে যে ফল হয়, মাংসাদি ভোজন না করিলে আপনা হতে সেই ফল জীব প্রাপ্ত হয়। তুমি যার মাংস ভোজন করিতেছ, তোমার মাংস সেই আবার ভোজন করিবে। সেই জন্য মনীষিগণ কহিয়া থাকেন, আমি যার মাংস ভোজন করি, পরলোকে সেই আমার মাংস ভোজন করিবে; এ মাংস ভোজন নয়, অপরের ভোগ্য মাংসত্ব লওয়া মাত্র। মূঢ় জীব! নিরামিষভোজী হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে মন দান না করিলে, পশু-মৎস্য-ভোজীদের ন্যায় পশু-মৎস্য হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিতে করিতে বিষ্ঠাজাত কৃমি-প্রভৃতি হইবে। হায়! হায়! শ্রীকৃষ্ণচিন্তাহারা হইয়া সাধের মানবজন্ম হারাইলে? প্রবৃত্তির মার্গে মাংসাদি ভোজন করিতে করিতে ধর্ম্ম-রহস্য না বুঝিয়া একবারেই মানুষরূপী পশু সাজিলে? মনু-স্মৃতি বলিতেছেন, প্রবৃত্তি মার্গে যে মাংস-বিধান দেওয়া হইল, মদ্য-মৈথুনের বিধান করা গেল, ইহা নিবৃত্তিমার্গে উঠিবার জন্য; মাংস, মদ্য, মৈথুনাদি ত্যাগ করাই, মহা ফল। অতএব শ্রীকৃষ্ণকরুণানিধির আশ্রয় করিয়া, এই সকল বস্তুতে অনাসক্ত হও। অনাসক্তের নামই নিবৃত্তিমার্গ। কেমন করিয়া অনাসক্তের পথে যাইবে, তাহা এই সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবৎরূপী শ্রীকৃষ্ণের নিকট দেখ। ওরে মূঢ় জীব! তোকে উদ্ধারের জন্য, অক্ষর ব্রহ্মরূপে সেই অক্ষর-সচ্চিদানন্দ ত্রিভঙ্গললিতসুন্দর ব্রজবিহারী শ্যাম-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ উদয় হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধে যযাতি-দেবযানী-সংবাদ উপলক্ষে বলিতেছেন ঃ—

"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন দুহ্যন্তি মনপ্রীতিং পুংসঃকামহতস্যতে॥
ন জাতু কামকামানামুপভোগেন শাম্যতি,
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে॥

যদা ন কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষ্বমঙ্গলম্।
সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥
যা দুস্তজা দুর্ম্মতিভি র্জীর্য্যতো যা ন জীর্য্যতি।
তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্ম্মকামোদ্রুতং ত্যজেৎ ॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥"

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে ব্রীহি-যব (ধান্যযবাদি) ভোজন-আনন্দ ছাগাদি পশুকুলের যেমন পূর্ণ হয় না, নারীজাতিরা সুবর্ণ অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়াও সেই অলঙ্কার-ধারণ-আনন্দ যেমন তাহাদের পূর্ণ হয় না, সেইরূপ স্ত্রীসম্ভোগকারী পুরুষের স্ত্রীসম্ভোগ-আনন্দ-বাসনা পূর্ণ হয় না। বস্তু থাকার কারণে বাসনা, না থাকার কারণে বাসনার শেষ সংসার-রীতি। অতএব নারীসম্ভোগবাসনা, নারীসম্ভোগেরদ্বারা যে পূর্ণ হইবে, ইহা মহাভ্রম; যেহেতু আগুনে ঘৃতাহুতিদানে আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়, নির্ব্বাপিত হয় না; বাসনাভোগে বাসনার যখন নিবৃত্তি নাই, তখন বাসনাপূর্ণ জগতে পূর্ণ-সুখ পাবার উপায় কি? তাহার উপায় নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় শ্লোকে কহিতেছেন, যখন সর্ব্বজীবের অনিষ্টাচরণ হইতে জীব ক্ষান্ত হয়, সকলকে নিজের প্রাণের তুল্য দেখিতে সক্ষম হয়, তখন সর্ব্বদিক সুখময় হইয়া তাহাকে পূর্ণসুখ দিতে থাকে। যে বাসনাভোগ হইয়াও ভোগ পূর্ণ হয় না, জীর্ণ হইয়াও জীর্ণ হয় না, তাহাকে মঙ্গলকামীজন শীঘ্র ত্যাগ করিবে। নারীসঙ্গে বর্ত্তমান থাকিয়া ভোগবাসনা প্রবল করার অপেক্ষা নারীসঙ্গ একেবারেই ত্যাগ ভোগবাসনা নাশ করিবার ও সুখী হইবার প্রধান উপায়। পঞ্চম শ্লোকে ইহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ দিতেছেন;—যতই বড় জ্ঞানী হও—সংক্ষিপ্ত আসনে, যুবক পুত্র মাতার সহিত, যুবক ভ্রাতা ভগ্নীর সহিত,

যুবক পিতা কন্যার সহিত নির্জ্জনে কখনও থাকিবে না, তাহাতে কামেন্দ্রিয়াদির প্রবলত্ব হেতু সম্ভোগবাসনাতে মন আসক্ত হইবেই হইবে। এক অপরিনামদর্শী মূর্খ মানুষ আমাকে বলিল—"পেট পূরিয়া একবার রসগোল্লা খাইতে পারিলে আর তাহা খাইবার আশা থাকে না।" আমি বলিলাম—রসগোল্লার দোকানে চিরদিন বাস করিয়া একথা বলা বিড়াল-তপস্বীর ব্রতের ন্যায়। যতক্ষণ ক্ষুধা নাই, ততক্ষণ ভোজনে অনিচ্ছা। ক্ষুধা হইলে আবার রসগোল্লা খাইতে বাসনা উঠিবে ও খাইতে থাকিবে। দোকান ছাড়িয়া একবারেই চলিয়া যাইলে আপাততঃ রসগোল্লা ভোজন মিলিত না বটে, কিন্তু মনে বাসনা উঠিত; এইরূপ বাসনা উঠাও ভোজন তুল্য জানিবে। যেহেতু স্বপ্নযোগে বাসনাময়ী স্ত্রীমূর্ত্তির সহিত সম্ভোগাদি করিয়া যেরূপ বীর্য্যস্খলন হইতে থাকে; মনের ভিতর ভোগবাসনাদি সেইরূপ কার্য্যকারক জানিবে। বাহিরের পাপকার্য্য যেমন নরক-দায়ক, মনের পাপ-কার্য্য সেইরূপ নরকদায়ক। মনের ভিতর পাপবাসনা বাহিরের কার্য্যে প্রকাশ করিব না, ইহা আর্য্য নরনারীর চিত্ত সংযমের গৌণ উপায়, ইহাতে নৈরাশ্য ভাব আনয়ন করে। কৃষ্ণভক্তি সংযমের শ্রেষ্ঠ উপায়। রসগোল্লাদ্বারা যে ক্ষুধা নাশ করে নাই, ক্ষুধার সময় রসগোল্লার কথা তাহার মনে পড়ে না বা খাইতে তার বাসনা উঠে না; এই সব বিচার দ্বারা স্ত্রীসম্ভোগ একবারে ত্যাগ সবচেয়ে উত্তম। যে নরনারী মনকে বাধ্য করিতে পারে তাহাদের সম্ভোগাদিকার্য্য সুখদায়ক হয়; কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় যে সম্ভোগ করিয়াছে, তাহার যতকিছু সুখ ওই সম্ভোগেরই ভিতরে; নতুবা যতদিন মায়াপিশাচীর ভীষণ পদাঘাত তাহার বক্ষস্থল বেদনাপূর্ণ না করিতেছে, ততদিন তাহার উপরে উঠিবার সামর্থ্য নাই; কৃষ্ণপ্রেমানন্দ সুখ পাবারও উপায় নাই। একজন মূর্খ আমাকে বলিল,

"পরীক্ষা না করিয়া বস্তুর দোষ স্বীকারপূর্ব্বক ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নয়, অতএব একবার স্ত্রীসম্ভোগ করা উচিত।" আমি বলিলাম—যে বস্তু যখন নরজগতে কেউ ব্যবহার করে নাই, সেই বস্তুর গুণ প্রকাশ করিবার জন্য পরীক্ষা আবশ্যক; কিন্তু যাহা মানব নিত্য ব্যবহার করিতেছে, যাহার ফলাফল সর্ব্বদাই প্রকাশ হইতেছে; তাহার আবার পরীক্ষা কি? যে আগুণ লাগিয়া সম্মুখে একটি ঘর পুড়িল, সেই আগুণ তুমি লইয়া নিজ ঘরে লাগাইয়া পরীক্ষা করিবে কি? সে বলিল—'না ত বটে!' আমি বলিলাম—স্ত্রীসম্ভোগাদি ওইরূপ 'না ত বটে' করিয়া পরীক্ষা না ক'রে বনের দিকে 'জয় রাধে-গোবিন্দ' বলে যাত্রা করো, ধ্যানযোগে সেই নিত্য কিশোরী-কিশোরের রূপ ভাবনা করো; সব সুখ ও সব তত্ত্ব দেখিতে পাইবে: চির সুখী হবার ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় নাই। করুণানিধি সর্ব্ব-সুখধাম রাধাকৃষ্ণের মন্ত্রধ্যানময়ী চিন্ময়ী মূর্ত্তিকে যাহারা ধ্যানযোগে দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন এই নারীমায়াকে কেহই পরাজিত করিতে সক্ষম নয়! উত্তম বস্তু যতক্ষণ না দেখা যায়, ততক্ষণ মন্দ বস্তু উত্তমের ন্যায় গণ্য হয়; কিন্তু মন্দ বস্তুর মন্দক্রিয়া নাশ হইবার নহে; এই জন্যত জীবের দুঃখ-শোকের ঘোর তাড়না। কিন্তু তাড়না খাইয়া সংসারে পড়িয়া আছে কেন জান? পরোক্ষভাবে সুখবস্তুর সন্ধান না জানার কারণ। এই হেতু পরোক্ষভাবে সুখের ধাম জানাইতে বনবাসী-কৃষ্ণ-ভক্তজন-ভিন্ন আর এ জগতে কেহই নাই। এই হেতু করুণানিধি কৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে সখ্যসম্বন্ধস্থাপনকারী প্রিয়-ভক্ত উদ্ধবের নিকট, কে আমার প্রিয়তম ভক্ত, এবং তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এই—

"কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্য সারোহনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ ॥
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃশুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহোমিত ভুক্ শান্তঃ স্থিরোমচ্ছরণো মুনিঃ ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্পো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ ॥
জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥"

অর্থাৎ হে উদ্ধব! যেসকল ভক্ত কৃপালু, অকৃতদ্রোহ (সকলের সঙ্গে শক্রতা-জ্ঞানহীন), তিতিক্ষু (ক্ষমাবান্), সত্যসার (সত্য যে আমি ইহাই সার—বল—যার), অনবদ্যাত্মা (অসূয়াদি রহিত), সমঃ (সুখেদুখে হর্ষবিষাদহীন), কৃষ্ণভক্তিসূচক বাক্য কথনের দ্বারা সকলের উপকারক, বিষয়ভোগবাসনাতে অনাসক্তবুদ্ধি, কামক্রোধাদি দমনকারী, মৃদু (কোমলচিত্ত), শুচি (সদাচারী), অকিঞ্চন (সংসারবাসনা গ্রহণহীন) অনীহ (মায়মুগ্ধ জীবের চেষ্টা শূন্য), মিতভুক্ (সত্বগুণময় যুক্তিযুক্ত আহারকারী), শান্ত (আমার চরণ নিয়মিতভাবে চিন্তাশীল), স্থির (স্বধর্ম্মে অটল বিশ্বাস), আমিই কেবল মাত্র যাঁহাদের আশ্রয়, তাঁহারাই উচ্চমন মুনিধর্ম্ম-আশ্রয়ী হন; এবং এই ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্বক যাঁহারা সংসারসুখ-পাগল হইয়া আমাকে কখন ভুলেন না, যাঁহারা বিকার-রহিত, অকৃপণ, ক্ষুৎপিপাসা-শোক-মোহ-জরা-মৃত্যু এই যে ছয়টি উর্ম্মি মানব-দেহ-সরসীতে হইয়া থাকে, ইহাতে ক্ষুব্ধচিত্ত নন, যিনি মানের ইচ্ছা রাখেন না, সকলকেই ধন্যবাদ দিয়া মদ্ভক্তি সকলের কাছে প্রার্থনা

করেন, কল্প ( পরের শিক্ষা দিতে পটু ), মৈত্র ( শঠতা হীন ), কারুণিক ( সবকে দয়াদৃষ্টিতে দেখেন লাভের জন্য নয় ), কবি ( মৎসম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানী ), আর আমার কথিত বেদবিহিত যজ্ঞ-কর্ম্ম-ধর্ম্মাদি জানিয়াও সেই সকল ধর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক, যাঁহারা আমার ভক্তিকে সার জানিয়া সেই ভক্তিযোগে সর্ব্বদাই আমাকে আরাধনা করিতেছেন, তাঁহারাই সত্তম ( উত্তম সাধু ) বলিয়া কথিত।" এখানে বেদবিহিত ধর্ম্ম ত্যাগ, সে কেমন ধর্ম্ম তাহা এই ভাব বুঝিতে হইবে যে,—শুদ্ধ-সত্ত্বগুণহীন, এমন রাজসিক-তামসিক কতকগুলি ধর্ম্ম আছে যেমন—"বিবাহ সংস্কারযুক্তা রজস্বলাধর্ম্মিনী নারীর কাছে গমন না করিলে ভ্রূণহত্যা-জনিত পাপ হয়"—ইহা জানিয়া কোন ভক্ত যদি আমার ভক্তি হ্রাসের কারণ স্ত্রীসঙ্গ না করে, তবে তজ্জন্য পাপ মদ্‌ভক্তে প্রবেশ করে না। অথবা বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস, কৃষ্ণ-একাদশীতে ( দ্বাদশীতে ব্রত করিয়া, দ্বাদশীতে পারণা অথবা ত্রয়োদশীতে পারণা—ইহাই কৃষ্ণ প্রীতিকর কৃষ্ণ-একাদশী ) অনুপবাস, আমাকে অনিবেদিত-শ্রাদ্ধ-অন্নাদি-ভোজন, এই সব ভক্তিবিরুদ্ধ যে ধর্ম্ম তাহা যাঁহারা ত্যাগ করেন, তাঁহারাই উত্তম সৎ বলিয়া জানিবে। দেশকালপরিচ্ছিন্নহীন সর্ব্বাত্মা-স্বরূপ সচ্চিদানন্দরূপ আমাকে বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া, একাই আমি সর্ব্ব কর্ত্তা সকলের আশ্রয় সুখদাতা জানিয়া, একনিষ্ঠভাবে আমাকে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠতম প্রিয়-ভক্ত বলিয়া কথিত। এই সকল ভক্তবৃন্দ কি প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান করেন তৎসম্বন্ধে করুণানিধি উদ্ধবকে কহিতেছেন :—

"মল্লিঙ্গ মদ্ভক্তজন-দর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্।
পরিচর্য্যাস্তুতিঃ প্রহব গুণকর্ম্মনুকীর্ত্তনম্॥

মৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব ।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্ ॥
মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনম্ ।
গীততাণ্ডব বাদিত্র গোষ্ঠীভি র্মদ্‌গৃহোৎসবঃ ॥
যাত্রা বলি বিধানঞ্চ সর্ব্ববার্ষিক পর্ব্বসু ।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয় ব্রতধারণম্ ॥
মমার্চ্চা স্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহৃতা চোদ্যমঃ ।
উদ্যানোপবনাক্রীড় পুরমন্দির কর্ম্মণি ।
সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেক মণ্ডল বর্ত্তনৈঃ ।
গৃহ শুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্ যদমায়য়া ॥
অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যা পরিকীর্ত্তনম্ ।
অপি দীপাবলোকং নোপযুঞ্জান্নিবেদিতম্ ॥
যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদনন্ত্যায় কল্পতে ॥
সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খংমরুজ্জলম্ ।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥
সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয়্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্ ।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা ॥
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যান নিষ্ঠয়া ।
বায়ৌ মুখ্য ধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈ স্তোয় পুরস্কৃতৈঃ ॥
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈ র্ভোগৈরাত্মনমাত্মনি ।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্ ॥
ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষু মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ ।
যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চ্চেৎ সমাহিতঃ ॥

ইষ্টা পূর্ত্তেন মামেব যো যজেত সমাহিতঃ।
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া ॥
প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সধ্র্যঙ্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥
অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃন্বতো যদুনন্দনঃ।
সুগোপ্যমপি বক্ষামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃদ্‌সখা ॥"

—ইতি শ্রীমদ্ভাগবত।

হে উদ্ধব! সেই বৈষ্ণবসাধুগণ এই প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, যথা,—শিলাদি-নির্ম্মিত শ্রীমূর্ত্তিকে ও আমার ভক্তজনকে দর্শন, স্পর্শন (আলিঙ্গন বক্ষে ধারণাদি), পূজা (ভক্তি-নমস্কার-পাদ্যার্ঘ্যাদি দান), সেবা (মাল্য-চন্দনাদি দানপূর্ব্বক ভোগ্যবস্তু নিবেদন প্রভৃতি), স্তুতি (শ্লোকবদ্ধ বা স্বভাষারচিত মহিমা বর্ণন), প্রকৃষ্টরূপে গুণ কর্ম্মের কীর্ত্তন করা, আমার লীলা-কথা শুনিতে সবিশেষ আগ্রহ, আমার ধ্যান, যাহা কিছু প্রাপ্য সকলই আমাকে নিবেদন, দাসভাবে আমার চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ, আমার মরজগতে আবির্ভাব-লীলা কথন, আমার জন্মাষ্টমীব্রতাদি পালন, সকল পরিবার লইয়া আমার শ্রীমন্দিরে মৃদঙ্গবাদ্যের সহিত লীলাগান, তাণ্ডবনর্ত্তন, রথ-ঝুলনযাত্রা, বলি (পুষ্পমাল্য উপহার) বিশেষরূপে অনুষ্ঠান করা, সর্ব্ব বার্ষিক পর্ব্ব (চাতুর্ম্মাস্য একাদশী ব্রতাদি) এবং বেদমতে বা তন্ত্রমতে দীক্ষা গ্রহণ, মদীয় ব্রত (নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-রামনবমী ব্রতাদি) পালন করিতে থাকেন। অন্যে উৎসাহ ভঙ্গ করিলে নিজ হইতে আমার সেবা পূজা স্থাপন করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা, আমার জন্য উদ্যান (পুষ্পপ্রধান কানন), উপবন (ফলপ্রধান বন), আক্রীড় (খেলার স্থান) নির্ম্মাণ, আমার মন্দির স্থান সন্মার্জ্জন পূর্ব্বক গোময়জল দ্বারা লেপ বা জল

দ্বারা ধৌত করা, শ্রীমন্দিরে ও মন্দিরপ্রাঙ্গনে ঘটযন্ত্রাদি দ্বারা জল প্রোক্ষণ ( ছিটান ), মণ্ডলবর্ত্তন ( সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গলময় দৃশ্য প্রকাশ ) প্রভৃতির দ্বারা আমার মন্দির সেবা, দাসভাবে নিষ্কপট হইয়া আমার সেবা; সম্মানপ্রয়াসী না হওয়া, "আমার দাস" এই দম্ভ ভিন্ন অন্য দম্ভ না করা, সত্য ( আমার অনুগত যে ধর্ম্ম ) তাহার কীর্ত্তন করা, আমার দীপালোক ( শ্রীবিগ্রহ নিকটস্থ প্রদীপ বা আরতির আলোক ) দর্শন করিবে মাত্র, সে সব আলোকে অন্য কোন সংসার কার্য্য করিবে না, অন্যের নিবেদিত অন্নাদি ভোজন করিবে না ( অর্থাৎ নিজের নিত্যসেবা পরিত্যাগ করিয়া অন্যের নিবেদিত প্রসাদাদি সেবনে স্বধর্ম্ম-ব্যভিচার দোষ—অতএব নিজের সেবা কার্য্যাদি পূর্ব্বক অন্য-নিবেদিত প্রসাদাদি সেবা করিবে, অন্যথা নহে ), অথবা সাধারণস্থিতিশীল আসক্তিময় নিবেদিত বস্তু গ্রহণ করিবে না। কিন্তু সবিশেষ ভক্তি বলে যাঁহারা বলী, তাহারা উপবাসাদি-দিনে আমার নিবেদিত প্রসাদাদি গ্রহণ করিবেন, অন্যভাবে নিযুক্ত করিবে না, যেহেতু স্মৃতি বলিতেছে,—

> "ষড়্ভির্মাসোপবাসৈস্তু যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্।
> বিষ্ণোর্নৈবেদ্যসিক্থেন পুণ্যং তদ্ভুঞ্জতাম্ কলৌ॥
> হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ।
> পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ॥"

ছয় মাস উপবাস করিয়া যে ফল, আমার নিবেদিত অন্নভোজনে সেই ফল কলিযুগে জীব পাইবে, অতএব মন্নিবেদিত প্রসাদ ভোজন কর। যাহারা হৃদয়ে আমার রূপ-চিন্তা, মুখে আমার নাম, উদরে আমার নিবেদিত প্রসাদ, এবং মস্তকে আমার চরণামৃত ও নিবেদিত পুষ্পমাল্যাদি নির্ম্মাল্য ধারণ করে, তাহারা অচ্যুত অর্থাৎ ক্ষয় রহিত

হইয়া আমার নিত্যসঙ্গী হইতে থাকে। অপর দেবতার নিবেদিত বস্তু আমাকে নিবেদন করিতে নাই, আমাকে অগ্রে নিবেদন করিয়া পরে সবকে নিবেদন করিবে। যাহা জগতে মঙ্গলদায়ক এবং নিজের অতি প্রিয় যে বস্তু সেই সব আমাকে অর্পণ করিলে, সেই সব পদার্থ অসীম চিণ্ময় ব্রহ্ম-স্বরূপ লাভ করে। অতএব প্রিয় জিনিষ মাত্রেই সবই আমাকে দান করিবে। সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, প্রাণ, সর্ব্ব জীব, আমার মঙ্গলময় পূজার স্থান বলিয়া জানিবে; অতএব যাকে যেমন বিধান সেই অনুসারে পূজা করিবে, কাহাকে কোন উদ্বেগাদি দিবে না। হে উদ্ধব! সূর্য্যকে উপস্থানাদি তিন প্রকার সূক্ত ( উত্তম কথিত বেদবিহিত শ্লোক ) দ্বারা, অনলে ঘৃতাহুতি দ্বারা, উত্তম ব্রাহ্মণকে অতিথিসৎকার দ্বারা, গাভীবৃন্দকে যবস ( তৃণাদি ) দ্বারা, কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবকে বন্ধুবৎ-সম্মান দ্বারা, হৃদয়-আকাশে ধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা, ও প্রাণ-দৃষ্টি দ্বারা বায়ুতে আমাকে আরাধনা করিবে। স্নানকালে জলে অবস্থান পূর্ব্বক জলাদি-তর্পণ-দ্রব্যের দ্বারা, ভূমিতে মন্ত্রময়ী অর্চ্চণার দ্বারা, বিবিধ ভোগ্যবস্তু দ্বারা আত্মাতে আত্মা-স্বরূপ আমাকে পূজা করিবে, সর্ব্বভূতে সমদর্শী দৃষ্টিদ্বারা দেহতত্ত্ব জ্ঞাত আমার যজন ( যজ্ঞ ) করিবে। সকল অধিষ্ঠানস্থানে আমার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এই ঐশ্বর্য্যময় চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকে সুস্থিরচিত্তে ধ্যান পূর্ব্বক অর্চ্চণা করিবে। আমার পূর্ণ মাধুর্য্যময় সর্ব্বেশ্বর দ্বিভুজ মুরলী-ধারী গোপমূর্ত্তিকে এই মূর্ত্তির প্রাণস্বরূপ জানিয়া উচ্চ শ্রেণীর ভক্তকুল সেই রূপেরই ধ্যান করিবে। এইরূপে আমাতে নিবিষ্টচিত্ত ভক্তগণ মদর্থে অগ্নিহোত্র যজ্ঞাদি ( ইষ্ট বস্তু ) ও কূপখননাদি ( পূর্ত্ত বস্তু ) অনুষ্ঠান করিবে। আমাতে সৎভক্তি ও মৎসম্বন্ধীজ্ঞান, ভক্ত সাধুগণের সঙ্গ দ্বারা হয়; অতএব আমার ভক্ত সাধুগণের সেবা সর্ব্বদা করিবে।

জ্ঞান-ভক্তি-মার্গে এই সকল বহিরঙ্গা ভক্তি কার্য্যের প্রয়োজন; শুদ্ধ ভক্তিমার্গে হে উদ্ধব! সৎসঙ্গের দ্বারা সাধুগণের প্রধান আশ্রয় আমার প্রাপ্তি ও সংসার-তরণের প্রধান উপায়, ইহা ভিন্ন অন্য উপায় আর নাই ইহা সম্যক প্রকারে অবধারিত হইয়াছে; অতএব এই সৎসঙ্গ-রূপী অন্তরঙ্গা ভক্তির সাধনা মদ্-ভক্ত মদ্গত প্রাণ সাধু-সঙ্গ-বিনা হইবে না। হে উদ্ধব! সৎসঙ্গ প্রভাবে যে ভক্তি তাহা অব্যভিচারিণী, আর জ্ঞান-কর্ম্ম-কাণ্ড-মার্গে যে ভক্তি তাহা ব্যভিচারিণী; যেহেতু জীব জ্ঞান-কর্ম্ম-কাণ্ড-মার্গে অবস্থান করিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি করে; এই হেতু ব্যভিচার দোষ হয়; শুদ্ধভক্তিমার্গে যাহারা, তাহারা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-মান-অপমান-জয়-পরাজয় প্রভৃতি কোনদিকে দৃষ্টি করে না এই জন্য ব্যভিচার দোষ হয় না। আমি সদাই তাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করি। হে যাদব! তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ, সখা বলিয়া পরম-রহস্য-মূলক গুপ্ত-তত্ত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর; এই বলিয়া করুণানিধি সৎসঙ্গপ্রভাবে ভক্ত ও ভক্তোত্তমগণের বর্ণনা করিতেছেন, যথা,—

"ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এবচ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞ ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গ সর্ব্বসঙ্গাপহা হি মাম্॥
সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণ গুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষুঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রা স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তম প্রকৃতয়স্তস্মিং স্তস্মিন্ যুগেঽনঘ॥

বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্র-কায়াধবাদয় !
বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথবিভীষণঃ ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজোগৃধ্রো বণিকপথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্য যজ্ঞপত্ন্যাস্তথাপরে ॥
যে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতা-তপ্ত-তপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥
কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগা।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥
যং ন যোগেন সাঙ্খ্যেন দানব্রত তপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায় সন্ন্যাসৈ প্রাপ্নুয়াৎ যত্নবানপি ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত।

হে সখে! যোগের দ্বারা অর্থাৎ আসন প্রাণায়ামাদি দ্বারা আমি জীবের বাধ্য হই না, সাংখ্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, ধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তিবিহীন অহিংসাদি কার্য্য, বেদ-অধ্যয়ন, তপঃ (দৈহিক ক্লেশকর অগ্নিবেষ্টিত ভূখণ্ডে বসিয়া আমার ধ্যান এইরূপ সাধনাকে তপ কহে), ত্যাগ (সন্ন্যাস), ইষ্ট (অগ্নিহোত্র যজ্ঞাদি), পূর্ত্ত (কূপ-সরোবর-অথিতিশালাদি নির্ম্মাণ), এবং দক্ষিণা (দান), এই সবের দ্বারা আমি জীবের বাধ্য হই না। ব্রত ( একাদশী ব্রত ; এখানে একাদশী বলিলে এইরূপ একাদশী বুঝিতে হইবে—আমার ভক্তিহীন হইয়া, স্বর্গে যাব, যমকে ফাঁকি দেব, ভাল স্বামী পাব, ইত্যাদি কামনা লইয়া বিধান-রহিতভাবে চোখ-কাণ বুজাইয়া একটি দিনরাত উপবাস করি, প্রভাত হলেই বাঁচি, এইরূপ যে আমার জন্য একাদশী সেই আমার ধ্যান পূজা প্রভৃতি কিছুই যাহাতে নাই,এইরূপ বাসনা যুক্ত অন্যান্য ব্রতাদি বুঝিবে), যজ্ঞ (দেবপূজা), ছন্দ (গুপ্তমন্ত্র), তীর্থ ( তীর্থভ্রমণ ), নিয়ম ( নিয়মিত আহারবিহার প্রভৃতি ),

যম ( ইন্দ্রিয় সংযম ) এই সকলের দ্বারা আমি তেমন বাধ্য হই না, সৎ-সঙ্গের দ্বারা আমি যেমন জীবের বাধ্য হই। হে সখা! সৎসঙ্গের দ্বারা দৈত্য, রাক্ষস, মৃগ, খগ ( পক্ষী ), গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ ( সর্প ), সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, এবং মানবের মধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, নারী, অন্ত্যজা ( পুলিন্দচণ্ডাল প্রভৃতি ) যে যে যুগে সৎসঙ্গ করিয়াছে, সেই সেই যুগে সৎসঙ্গ প্রভাবে রাজসিক তামসিক প্রকৃতির জীবকুল, হে পরম পুনীত উদ্ধব! আমার চরণকে প্রাপ্ত হইয়াছে। সেসবের দৃষ্টান্ত দেখ সখা, ত্বাষ্ট্র ( বৃত্রাসুর ), কায়াধব ( প্রহ্লাদ ), বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, ঋক্ষ ( জাম্বুবান ), গজ ( কুম্ভীর যাহার শুণ্ড গ্রাস করিয়াছিল ; গজ শ্রীহরিকে স্মরণ করার জন্য তিনি আসিয়া সুদর্শনচক্রে কুম্ভীরকে ছেদনপূর্ব্বক গজকে উদ্ধার করিয়াছিলেন), গৃধ্র (জটায়ু), বণিকপথ ( তুলাধার অর্থাৎ বাণিজ্যজীবি কোন বণিক), ব্যাধ (ধর্ম্মব্যাধ) প্রভৃতি সৎসঙ্গের প্রভাবে আমাকে পাইয়াছে। যাহারা বেদাদি গ্রন্থ পাঠ করে নাই, শ্রেষ্ঠত্বসূচক কর্ম্ম করে নাই, ব্রত-তপস্যাদি-কার্য্যহীনা, যজ্ঞকারী-ব্রাহ্মণপত্নীগণ, বৃন্দাবনের পুলিন্দ-কন্যা-ফল-বিক্রয়কারিণী প্রভৃতির মুখে আমার নাম শ্রবণ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রজ গোপীগণ আমাকে দর্শন পূর্ব্বক কেবল প্রীতির দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। শুধু গোপীগণ নয়—আমার দর্শনের দ্বারা ব্রজের মধ্যে গাভীগণ, নগ, ( যমলার্জ্জুন ও অন্যান্য ব্রজের তরুলতা ), মৃগ ( হরিণ ) ও মূঢ়বুদ্ধি কালীয়নাগাদি আমার প্রেম প্রাপ্ত হইয়া আমাকে লাভ করিয়াছে।

সখা! যাহাকে যোগের দ্বারা, সাংখ্য-মীমাংসা দ্বারা, দান-ব্রত-তপ-যজ্ঞদ্বারা, ভাষা-জ্ঞান-জনিত পাণ্ডিত্য দ্বারা, বেদ-পাঠ-সন্ন্যাসাদি দ্বারা, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া মানবকুল প্রাপ্ত হয় না, এমন যে আমি কৃষ্ণ,

সেই আমাকে ব্রজগোপীগণ ও অন্যান্য উচ্চ-নীচ-শ্রেণীর ব্রজবাসিগণ অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়াছে। করুণানিধির এই উপদেশ-মধ্যে তিন শ্রেণীর সৎসঙ্গের দ্বারা জীব আমাকে প্রাপ্ত হয় এই জ্ঞাত হওয়া যায়। এক সৎ আমার ভক্ত—যেমন নারদাদি; নারদের দ্বারা প্রহ্লাদের হরি প্রেম লাভ। দ্বিতীয় সৎ আমার নাম বা কৃষ্ণভক্তিদায়কশাস্ত্র ভাগবতাদি, যাহা শ্রবণের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম জীব প্রাপ্ত হয়। যেমন পুলিন্দকন্যাদের মুখে কৃষ্ণনামরূপগুণ প্রভৃতি শুনিয়া যজ্ঞপত্নীগণের কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি। তৃতীয় সৎ নিজেই শ্রীকৃষ্ণ! এখানে তৃতীয় সৎসঙ্গ নিত্যমুক্ত জীবরূপে লীলাকারীদের সম্ভব। যেমন ব্রজগোপীগণ নিত্য মুক্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র বা নাম শুনিবামাত্র তাঁহাকেই পতিরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। কিন্তু নিত্যবদ্ধ জীব ত তেমন ভাবে কৃষ্ণকে পতিভাবে ভাবিতে পারিবে না। বদ্ধজীবের পক্ষে নাম শাস্ত্র গৌণভাবে, এবং কৃষ্ণভক্ত সাধুজনের সঙ্গ দ্বারা প্রধানভাবে কৃষ্ণপ্রেম আসিবে। অন্যথা পারের উপায় কিছুই নাই।

দৈবীমায়া জীবকে এতই অসুর করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহাদের মৎস্যাদি ভোজন নিষেধ করিলে, তাহারা বলিতে থাকে, আমাদের মাতাপিতা মৎস্যমাংস ভোজন করিয়াছে, তাহাদের রক্তবীর্য্যে যখন আমদের জন্ম, তখন মৎস্যমাংস খাওয়া আমাদের ধর্ম্ম; সেইরূপ মূর্খদিগকে জিজ্ঞাসা করি কাহার পিতা চুরিবৃত্তিতে জীবনধারণ করিয়াছে বলিয়া তাহাদের পুত্রাদি সেই চুরিবৃত্তিটি তাহাদের ধর্ম্ম বলিয়া কি রাখিবে? কৃষ্ণভক্ত রাগমার্গের হউক বা বিধিমার্গের হউক, জীবহত্যাদি কার্য্য তাঁহারা যে করেন না—ইহার সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগ সাধনলহরীতে স্কন্দপুরাণের উক্তি গ্রহণ হইয়াছে; নারদ হরিভক্তিপরায়ণ জীবহত্যাকার্য্যাদিহীন ব্যাধ-শিষ্যকে কহিতেছেন, যথা—

"এতে নহ্যাদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণঃ।
হরিভক্তি প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পর তাপি নঃ॥

অর্থাৎ হে ব্যাধ! তোমার হৃদয়ে যে অহিংসাদি গুণ আসিয়াছে তাহা তোমার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে; কেননা তুমি এখন হরি-ভজনে নিযুক্ত হইয়াছ, সেই হরি-ভজনপ্রবৃত্তি তোমার ব্যাধজাতির যে জীব-হত্যাদি প্রবৃত্তি তাহা নাশ করিয়াছে; হরি ভক্তি যাহারা গ্রহণ করিয়াছে তাহারা কখনও পরদুঃখদায়ক হয় না। লম্বা লম্বা তিলক করিয়া বা হরিনামের দোহাই দিয়া যেসব মৎস্যমাংসভোজীরা মন্ত্র দিয়া গুরু সাজিয়াছে তাহারা গুরুবেশে মূর্ত্তিমান যে পাপ, তাহা বুদ্ধিমান মানবকুলই অনুভব করুক। এইরূপ কদাচারী গুরুর কাছে উপদেশ লওয়া যা' আর অন্ধকে পথ জিজ্ঞাসা করা তা'। যাঁহার কৃষ্ণচরণ চিন্তা ভিন্ন মনে কোন কামনা নাই, সেই কৃষ্ণ-চিন্তা করিতে করিতে যিনি আত্মহারা হইয়া শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী ভক্তি-অঙ্গ-যাজন করেন না,—যেমন কোন উত্তম কৃষ্ণ-ভক্ত কৃষ্ণচিন্তাজনিত-বিষয়ে আসক্তিনিবন্ধন, ব্রাহ্মমূহুর্ত্তে উঠিয়া নৈমিত্তিক দন্তধাবনস্নানাদি সদাচারবিহিত কার্য্যাদি করেন নাই, বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সেই কার্য্য করিতেছে, এই রূপ অবিধি অনুযায়ী যে ভক্তি-অঙ্গ-যাজন তাহা তিনি করেন, ইহা ভিন্ন নিষিদ্ধ যে পাপাচার—মৎস্যমাংসাদি ভোজন প্রভৃতি যিনি করেন না,—তাঁহারাই প্রকৃত বিধিধর্ম্ম ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভজন করেন। অর্থাৎ কৃষ্ণ চিন্তায় আসক্ত হওয়ার জন্য বিধি ভক্তি আচরণ যিনি ভুলিয়া যান, বিধি-ভক্তি ত্যাগ করিতে বাসনা নাই, কিন্তু পাপাচার কার্য্যাদি (জীব হত্যাদি) যিনি স্বপ্নেও করেন না বা করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারাই বিধি ধর্ম্ম ছাড়িয়া কৃষ্ণ ভজন করেন। যাঁহারা মৎস্যমাংসাদি ভোজন করিয়া কৃষ্ণ ভজন করে বা ভজন করিতে আদেশ দেয় এবং

মুখে রাগমার্গের বেদবিধি ছাড়া ভক্ত বলিয়া প্রকাশ করে, তাহারা নরপশু বা বৈষ্ণববেশী রাক্ষস, অথবা কংসদৈত্যাদির অনুচর জানিবে। ভ্রমবশতঃ যদি কোন উত্তম কৃষ্ণভক্ত সাধক পাপাচারে পতিত হয়, তবে করুণানিধি কৃষ্ণ প্রায়শ্চিত্তের বিধান না করিয়া স্বীয় ভক্তকে শুদ্ধ করেন ; চৈতন্যচরিতামৃতে এ সম্বন্ধে বর্ণন আছে, যথা—

"বিধিধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥
অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করেন না করে প্রায়শ্চিত্ত ॥"

শ্রীমদ্ভাগবৎ একাদশ স্কন্ধে নবযোগীন্দ্রসংবাদ উপলক্ষে করভাজন যোগীন্দ্র উক্তিতে কহিতেছেন, যথা,—

"স্বপাদ মূলং ভজতপ্রিয়স্য
ত্যক্তান্য ভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্ছোৎপতিতং কথঞ্চিৎ—
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥"

অর্থাৎ পরমেশ্বর হরি একমাত্র নিজচরণ চিন্তাকারী, অন্য চিন্তা-হীন ভক্তকে এতই ভালবাসেন যে, সেই ভক্ত প্রমাদবশতঃ পাপ কর্ম্মা-দিতে পতিত হইলে তিনি তাহার হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া পাপবাসনাদি নাশ করেন। শুদ্ধসত্বগুণ হিংসাদি কার্য্য রহিত হইয়া যাহারা শাস্ত্র-বিধি-অনুসারে ভক্তি ভুলিয়াছেন, অথচ কৃষ্ণের সহিত প্রাণের তুল্য ভালবাসা স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষাতে মনোনিবেশ করিয়াছেন তাহারা রাগানুগামার্গের ভক্ত।

করুণানিধি কৃষ্ণ একমাত্র সকলের আশ্রয়, তিনি ভিন্ন সর্ব্ব সুখদাতা জগতে আর কেহই নাই ; এই জন্য সর্ব্বশাস্ত্র অন্বেষণকারী চিরসুখ-

প্রার্থী কোন এক মুনি বলিতেছেন, চৈতন্যচরিতামৃতে সনাতন শিক্ষাতে লিখিত, যথা,—

"শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা ব্যক্তি ভগিনী ॥
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা,
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভগবানেব শরণম্ ॥"

অর্থাৎ আমি সর্ব্ব-সুখ পাবার আশায়, এ জগতে সকল সুখদাতা কে? এই কথা সকল শাস্ত্রের মাতৃস্বরূপিনী (অর্থাৎ যাহা হইতে সকল শাস্ত্রের বা সকল শাস্ত্রজ্ঞানের আবির্ভাব) সেই শ্রুতিমাতা (বেদরূপা মাতা) তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে তিনি তোমার আরাধনা পথ দেখাইয়া দিয়াছেন (তোমার আরাধনা করিলে সর্ব্বসুখ পাইব এই বলিয়াছেন), মাতা যেমন বলিয়াছেন, তেমনি স্মৃতিরূপা ভগ্নীও প্রকাশ করিতেছেন, (এখানে মূল বেদ মাতৃ-স্বরূপা তাহা হইতে উৎপন্না স্মৃতিশাস্ত্র তাঁহার কন্যা স্থানীয়া, জীবের ভগ্নী-তুল্যা হইয়াছে), আর সেই শ্রুতিজাত-সহোদর পুরাণাদি ভ্রাতৃগণ মাতা ও ভগ্নীর অনুগামী হইয়াছেন, অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি সকলেই একবাক্যে নানা যুক্তি করিয়া তোমার আরাধনার কথা ব্যক্ত করিতেছেন; এই হেতু জানিয়াছি হে মুরহর কৃষ্ণ! তুমি ভিন্ন আমার আর আশ্রয় কে আছে?

"কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি আর জীবশক্তি ॥"

—ইতি চৈতন্যচরিতামৃত।

বিষ্ণুপুরাণ এ সম্বন্ধে প্রমাণ দিতেছেন, যথা,—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়াশক্তিরিষ্যতে ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঐশর্য্য-বিলাস-রূপ-বিষ্ণুর তিনটি শক্তি আছে। তন্মধ্যে চিৎস্বরূপ পরাশক্তি, অপরা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা জীবশক্তি, তৃতীয়া অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা মায়াশক্তি; এই মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া জীবের ত্রিতাপজ্বালা ভোগ হইতেছে; শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি আবার ত্রিধারূপে প্রকাশ পাইতেছে, যথা,—

"সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিনরূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥"

কৃষ্ণ এতই সুন্দর এতই সুখদায়ক যে সকলেই সেই চিরসুন্দরকে প্রেম-ভক্তিযোগে আরাধনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করে; সেই সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী কহিতেছেন,—

"অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি ॥"

মানবরূপে গোপবেশধারী সেই পরাৎপর ব্রহ্ম করুণানিধি কৃষ্ণের অনন্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও চৌষট্টি যে প্রধান গুণ, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সর্ব্বজনে অবগত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হউক :—

"অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ ॥

বিবিধাদ্ভুত-ভাষাবিৎ সত্যবাক্য প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসু-পাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষু শুচির্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্ত-সুহৃদ্ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্রক্তলোকঃ সাধু-সমাশ্রয়ঃ।
নারীগণ-মনোহারী সর্ব্বরাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্ব্বিগাহা হরেরমী॥
সদা স্বরূপ-সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্য নূতন।
সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিতঃ॥
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ কোটী ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
অবতারাবলী-বীজং হতারি গতিদায়কঃ॥
আত্মারাম গণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।
সর্ব্বাদ্ভুত-চমৎকার লীলা-কল্লোল বারিধিঃ॥
অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলী-কুল-কূজিতঃ॥
অসমানোর্দ্ধ-রূপ-শ্রী-বিস্মাপিত-চরাচরঃ।
লীলা প্রেম্নাপ্রিয়াধিক্য মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ॥
ইত্য সাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ং।”

অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণ নেতা (সকলের চালনকর্ত্তা), সুরম্যাঙ্গ (অতি

মনোহর অঙ্গ বিশিষ্ট), সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত ( সর্ব্ব প্রকারের উত্তম লক্ষণ যাঁহার দেহে বর্ত্তমান), রুচির (সৌন্দর্য্যের দ্বারা নয়ন মনের তৃপ্তিদায়ক), তেজস্বী (স্বীয় তেজে অবস্থানকারী ও সর্ব্ব তেজ ম্লানকারী), বলীয়ান (অতিশয় বলশালী), বয়সান্বিতঃ (সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়, সর্ব্বগুণযুক্ত, নানা-বিলাসবান কৈশোর-বয়স-বিশিষ্ট ), বিবিধাদ্ভুত-ভাষাবিৎ ( নানাবিধ অদ্ভুত অদ্ভুত ভাষাভিজ্ঞ), সত্যবাক্য ( যাহার কথা কখনো মিথ্যা হয় না), প্রিয়ম্বদ (অপরাধী জনের প্রতি যিনি মধুর বাক্য প্রয়োগ করেন), বাবদূক (যাহার বাক্য শ্রুতিমধুর অর্থ পরিপাট্যযুক্ত তিনিই বাবদূক), সুপাণ্ডিত্য ( নিখিল বিদ্যাজ্ঞাতা ), বুদ্ধিমান (পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারকারিণী বুদ্ধি যাহাতে পূর্ণাশ্রয় করিয়াছে), প্রতিভান্বিত (কোন প্রস্তাব উঠিলে নূতন নূতন উত্তর দিয়া মীমাংসা করিতে যিনি সক্ষম ), বিদগ্ধ ( যিনি সর্ব্বোত্তম রসিক ), চতুর ( একই সময়ে বহু কার্য্য সম্পন্নকারী ), দক্ষ ( দুঃসাধ্য কার্য্য শীঘ্র সম্পন্নকারী ), কৃতজ্ঞ (সেবাদি কার্য্য কে কি প্রকার করিয়াছে তাহা যিনি পূর্ণরূপে জ্ঞাত ), সুদৃঢ়ব্রত ( যাহার প্রতিজ্ঞা কখনও অন্যথা হয় না ), দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ ( দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্যকারী ), শাস্ত্রচক্ষু ( যিনি শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করেন তিনি শাস্ত্রচক্ষু ), শুচি ( সকলের পবিত্রকারী অথচ দোষ রহিত ), বশী ( ইন্দ্রিয়গণ যাহার বাধ্য ), স্থির (যতক্ষণ ফলোদয় না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধীরচিত্তে কার্য্যকারী ), দান্ত ( দুঃসহ ক্লেশ সহনশীল ), ক্ষমাশীল ( অপরাধ সকলকে সহ্যকারী ), গম্ভীর ( যাহার ইচ্ছা কেহই সহজে জানিতে পারে না ), ধৃতিমান্ ( আকাঙ্ক্ষারহিত বিষাদেও শান্ত ), সম ( ক্রোধদ্বেষহীন ), বদান্য ( যাহার ন্যায় দাতা কেহই নাই ), ধার্ম্মিক ( যিনি নিজে ধর্ম্ম কার্য্যকারী অন্যকেও ধর্ম্মকার্য্যে প্রবর্ত্তক ), শূর ( যুদ্ধে উৎসাহ দাতা ও অস্ত্রপ্রয়োগে বিচক্ষণ ), করুণ ( যিনি পর-

দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না ), মান্যমানকৃৎ ( জগতে মাননীয় ব্যক্তিগণের যথোচিত সম্মান দানকারী ), দক্ষিণ ( সরল মনোজ্ঞ চরিত্র ), বিনয়ী ( অহঙ্কারহীন যথাযোগ্য আচরণকারী ), হ্রীমান্ ( লোকাচার অনুসারে লজ্জাশীল ), শরণাগত পালক ( আশ্রিতজনের রক্ষক ), সুখী (যিনি ভোগী ও দুঃখের নাম মাত্র যিনি জানেন না ), ভক্ত-সুহৃৎ ( যিনি ভক্তের একমাত্র বান্ধব এবং ভক্তই যাহার একমাত্র বান্ধব ), প্রেমবশ্য ( যিনি সেবার অপেক্ষা না করিয়া প্রেমের দ্বারা বাধ্য হন ), সর্ব্বশুভঙ্কর ( সকলেরই হিতকারী ), প্রতাপী (যিনি স্বীয় তেজে শত্রুগণকে তাপিত করেন ), কীর্ত্তিমান ( নির্ম্মল কীর্ত্তিতে যশস্বী), রক্তলোক ( সমস্ত লোকের অনুরাগভাজন ), সাধুসমাশ্রয় ( সাধুগণের একান্ত পক্ষপাতী ), নারীগণ-মনোহারী ( সুন্দরীগণের চিত্তমোহনকারী ), সর্ব্বারাধ্য (অগ্রে সকলেরই পূজনীয় ), সমৃদ্ধিমান্ ( মহাসম্পত্তিশালী ), বরীয়ান্ ( সকলের মধ্যে প্রধান ), ঈশ্বর ( স্বাধীন এবং যাহার আজ্ঞা কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না ), শ্রীহরিতে এই পঞ্চাশৎ ( পঞ্চাশ ) গুণাবলী সমুদ্রলহরীবৎ অসীম। অবশিষ্ট গুণাবলী এই,যথা,—সদা স্বরূপ সম্প্রাপ্ত (মায়িক কার্য্যের অবশীভূত ), সর্ব্বজ্ঞ ( সকলের মনের কথা ও দৃশ্যমান বস্তু মাত্রেরই তত্ত্ব যিনি অবগত ), নিত্য নূতন ( দেখিতে দেখিতে যিনি নূতন সৌন্দর্য্য ধারণ পূর্ব্বক সকলকে মুগ্ধ করেন ), সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গ ( নিত্য-জ্ঞান-সুখ-স্বরূপ-সর্ব্বজ্বালাদূরকারী-শীতল-অবিকৃত-ত্রিভঙ্গ-দেহ ), সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত ( অখিল সিদ্ধি যাহার বাধ্য ), অবিচিন্ত্য মহাশক্তি ( ইনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী পর্য্যন্ত সকলেরই সৃষ্টি কর্ত্তা, ব্রহ্মরুদ্রাদির মোহনকারী ও ভক্তজনের প্রারব্ধ-খণ্ডনকারী ), কোটী ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ ( ইঁহার দেহে অগণ্য. ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান ), অবতারাবলীবীজ ( ইহা হইতেই সমস্ত অবতারের উদ্ভব ), হতারি গতিদায়ক ( নিহত শত্রুগণের মুক্তি-

দাতা), আত্মারামগণাকর্ষী ( মায়ারহিত ও আনন্দে অবস্থানকারী মুনিগণের মনকেও যিনি আকর্ষণ করেন ), সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার লীলাকল্লোলবারিধি (সর্ব্বপ্রকারে অদ্ভুত লীলাকারী ), অতুল্য-মধুর-প্রেমমণ্ডিত-প্রিয়-মণ্ডল ( ইঁহার প্রিয়বর্গ অনুপম মধুর প্রেমে ইঁহাকে বাধ্য করেন ), ত্রিজগন্মানসাকর্ষী-মুরলীকলকূজিত ( ইঁহার মুরলীর মধুর ধ্বনিতে ত্রিজগৎ আকৃষ্ট হয় ), অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী-বিস্মাপিত চরাচর ( ইঁহার অসাধারণ-রূপ-মাধুরী-দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইতে থাকে) ; এই চৌষট্টি প্রধান গুণাবলীর মধ্যে চারিটি গুণ শ্রীকৃষ্ণে বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয় ; অর্থাৎ সেই গুণ চারিটি শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাতে লক্ষিত হয় না । এমন সুমধুর লীলা বৈচিত্র দেখাইতে, সুমোহন প্রেম দ্বারা অগণ্য অনুগত ( ভক্ত ) গলাইতে, বাঁশীর গানের মাধুরিতে মনকে মুগ্ধ করিতে এবং শ্যামসৌন্দর্য্যের দ্বারা নয়ন জুড়াইতে কৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহই পারে নাই। অর্থাৎ, সবিশেষ লীলা, সবিশেষ প্রেম, সবিশেষ বেণুবাদনমাধুরি, সবিশেষ রূপমাধুরি, গোবিন্দ ভিন্ন আর কাহাতে নাই। সর্ব্বনায়ক-চূড়ামণি এই পরম ব্রহ্ম করুণানিধি কৃষ্ণ নিত্য-নব-বৃন্দাবনে প্রাণপ্রিয়া শ্রীরাধার সহিত অবস্থান করিতেছেন। হে জীব ! সর্ব্বসুখ পাবার আশায় চিরসুখপ্রদ বৃন্দারণ্যের ধ্যান কর। তাহা অতি অপূর্ব্ব, যথা :—

"ততো বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পরমানন্দ বর্দ্ধনম্।
সর্ব্বর্ত্তু কুসুমোপেতং পতত্রিগণনাদিতম্ ॥
ভ্রমদভ্রমরঝঙ্কারমুখরীকৃতদিঙ্মুখম্।
কালিন্দী জলকল্লোল সঙ্গী মারুত সেবিতম্ ॥
নানা পুষ্পলতাবদ্ধ বৃক্ষ ষণ্ডৈশ্চ শোভিতম্।
কমলোৎপলকহ্লার ধূলিধূসরিতাম্বরম্ ॥

তন্মধ্যে রত্নভূমিঞ্চ সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্ ।
তত্র কল্পতরূদ্যানং নিয়তং রত্নবর্ষিণম্ ॥
মাণিক্যশিখরালম্বী তন্মধ্যে মণিমণ্ডপম্ ।
নানারত্ন গণৈশ্চিত্রং সর্ব্বতঃ সুবিরাজিতম্ ॥
নানারত্নলসচ্চিত্রবিতানৈরূপ-শোভিতম্ ।
রত্ন-তোরণ-গোপুর-মাণিক্যাচ্ছাদনান্বিতম্ ॥
দিব্য-ঘণ্টাযুক্ত মুক্তামণিশ্রেণী বিরাজিতম
কোটী সূর্য্যসমাভাসং বিমুক্তং ষট্ তরঙ্গকৈঃ ॥
তন্মধ্যে রত্নখচিতং রত্নসিংহাসনং মহৎ ।
তত্রস্থ রাধিকাকৃষ্ণৌ ধ্যায়েদখিল সিদ্ধিদৌ ॥”

অর্থাৎ সেই হেতু নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি কৃষ্ণকরুণানিধির একমাত্র বিরাম-স্থল শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান করিবে। এই শ্রীকানন পরমানন্দ বর্দ্ধক, অচিন্তনীয় শক্তিপ্রভাবে ষড়ঋতুর কুসুম সকল এখানে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া যেন সর্ব্বদা হাস্য করিতেছে। এই স্থান নানাবিধ সুকণ্ঠ পক্ষীকুলের নাদে সর্ব্বদা শব্দায়মান। মধুপানমত্ত-ভ্রমরকুল গুন গুন স্বরে গান করার হেতু এই কানন দিঙ্মুখে কে যেন বসিয়া সুমোহন বীণা বাজাইতেছে এইরূপ ভ্রম হয়। নিকটে কল্লোলনাদিনী উর্ম্মিময়ী কালিন্দীনদী পুলিনবক্ষ চুম্বন করিতেছে, তরঙ্গ-সঙ্গী-শীতল-সুগন্ধ-বায়ু যে কানন ভূমির স্থাবরজঙ্গমাত্মক জীবকে সেবন করিয়া তপনতাপ-জ্বালা অনুভব করিতে দিতেছে না; পুষ্পবদনে হাস্যকারিণী লতাকুল যে স্থানে বনস্পতিকুলকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে; সরিৎ, সরসী, হ্রদসমূহ যে স্থানে কমল, উৎপল, কহ্লার প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ, এবং সেই সকল জলজ কুসুমের রেণুরাজি সমীর-সঞ্চালিত হইয়া যে কাননের ক্ষুদ্র-বৃহৎ মার্গ আচ্ছন্নপূর্ব্বক ধূসর বর্ণ করিয়াছে; যেখানে অযুত

সূর্য্যের প্রভাসদৃশ জ্যোতিবিশিষ্টা চিন্তামণি-রত্নময়ী-ভূমি বিদ্যমান এবং যে স্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রমোদোদ্যানের পাদপসকল রত্নবর্ষী কল্পতরু নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; যেখানে মাণিক্যময় পর্ব্বতের শিখরদেশে মণিময়-মণ্ডপগৃহ নীলকান্ত-বৈদূর্য্য প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য নানাবিধ রক্তপীত-বর্ণের মহামূল্যবান রত্ননির্ম্মিত চিত্রদ্বারা মণ্ডিত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছে; যে গৃহের মধ্যে নানা রত্নের চিত্রযুক্ত বিতানরাজী (চন্দ্রাতপসমূহ) শশীতারকাকুল শোভিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছে; যাহার রত্নময় তোরণ (বহির্দ্বার) ও গোপুর (পুরদ্বার) মাণিক্য-মণ্ডিত-কৌষেয়-বস্ত্রাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত; দিব্য-ধ্বনি-উদ্গারিণী ঘণ্টাসকল মণি-মুক্তাদামে বিভূষিত হইয়া যেখানের মণিভিত্তিতে ঊর্দ্ধ-দেশে সংলগ্ন আছে; যে গৃহের মধ্যে সমুদিত-কোটীসূর্য্য-প্রভা-বিস্তার-কারী একটী সুমহৎ সিংহাসন স্থাপিত; সংসার-সমুদ্রের শোক-মোহ জরা-মৃত্যু-ক্ষুৎ-পিপাসারূপ ষট্ তরঙ্গ যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেই রত্ন-সিংহাসনে অখিল কাম-কর্ম্ম-সাধনার সিদ্ধিদাতা আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় নিত্য-কিশোরী-কিশোর-রূপ রাধাকৃষ্ণ পরস্পর কণ্ঠ আলিঙ্গনপূর্ব্বক সহাস্য-বদনে অবস্থিত আছেন। ওরে মানব! মানবত্ব পাইবার জন্য এই শ্রীবৃন্দাবনের সহিত কিশোর-বয়সের নায়ক-নায়িকা দুটীকে ধ্যান করো। আহা কোটী কোটী সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্ব্বর্ত্তী চিদানন্দ-মূর্ত্তি এই রাধা ও গোপবেশ কৃষ্ণ-বিগ্রহকে ধ্যান না করিয়া যাহারা কেবল জ্যোতি ধ্যান করে বা জ্যোতি ভাবে, তাহারা যে নীচে পড়িয়া আছে তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। নিরাকার জ্যোতি স্বরূপ ঈশ্বর ধ্যান করে যাহারা, তাহারা এত বড় সাকার বিশ্বরাজ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ভাবে না যে নিরাকার হইতে সাকার উৎপত্তি হইতে পারে না; সাকার হইতে সাকারের উৎপত্তি চির স্বতঃসিদ্ধ। আমরা

চারিদিকে দেখি সাকার মানুষ হইতে সাকার মানুষ, সেইরূপ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষ, গো হইতে গো,—এইভাবে সাকার ঈশ্বর হইতে সাকার বিশ্ব-সংসারের উৎপত্তি। তিনি সর্ব্বরূপের জনক; অর্থাৎ মানবরূপে মানবকে, বৃক্ষরূপে বৃক্ষকে, পক্ষী হইয়া পক্ষীকে—এই ভাবে সর্ব্বরূপকে ধরিয়া সর্ব্ব রূপকে জন্ম দিতেছেন ও দিয়াছেন। কিন্তু নিজের ও নিজ জাতির রূপকে দেখিতে শিখিয়াছি, অপর ও অপর জাতির রূপকে দেখিতে শিখি নাই বলিয়া আমরা বিশ্বরূপ করুণানিধি কৃষ্ণকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। মালীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মালী! তোমরা বাগানে কে কে আছ?" সে বলিল,"প্রভু, আমি একাই আছি।" আমি বলিলাম,"তা হতে পারে না, সকল জগতের স্রষ্টা ঈশ্বর ভিন্ন আর কেউ একা থাক্‌তে পারে না। তুমি যখন সর্ব্বস্রষ্টা নও, তখন তুমি এক কখনই থাক্‌তে পার না।" সে মূর্খ বলিল, "আমি মিথ্যা বলি নাই ঠাকুর! আমি একাই আছি।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "অমন সুন্দর ফুলফলের গাছ আছে, অমন সুন্দর কোকিল গান কর্‌ছে, তবু তুমি একাকিসে?" সে বলিল, "গাছ-পাখী কি আমার সঙ্গী নাকি?" আমি বলিলাম, "যে দিন সঙ্গী কর্ত্তে পার্‌বে, সেই দিনে তোমার সর্ব্বদুঃখ শেষ, ও সেই দিনই তুমি জীবন্মুক্ত মহাত্মা!" 'বাঁশবনে ডোম কাণা'র ন্যায় অল্পবুদ্ধি মানবেরা রূপের মাঝে রূপকে হারাইয়া নিরাকারবাদী হয়।

যে প্রেমময়ী কৃষ্ণজ্ঞানে তমাল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, সেই সর্ব্বেশ্বরী প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধার গুণ এখন সকলে শ্রবণ কর—

"অনন্তগুণ রাধিকার পঞ্চবিংশতি প্রধান।
যেই গুণে বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান॥"

—ইতি চৈতন্যচরিতামৃত।

উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে শ্রীপাদ রসিকাচার্য্যরূপগোস্বামী নিখিলেশ্বরী শ্রীশ্রীরাধার অনন্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও পঞ্চবিংশতি যে প্রধান গুণ তাহা বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

"অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা॥
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাঙ্‌ নর্ম্ম-পণ্ডিতা।
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-শালিনী॥
সুবিলাসা মহাভাব পরমোৎকর্ষতর্ষিণী।
গোকুলপ্রেমবসতির্জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশাঃ॥
গুর্ব্বর্পিত-গুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা।
বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব॥"

অর্থাৎ জীবকুলের শুভ সম্পাদন জন্য বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার উৎকৃষ্ট পঞ্চবিংশতি গুণ কীর্ত্তন করিব। প্রথম গুণ মধুরা (মধুর ন্যায় কায়মনো-বাক্যের অনুপম সৌন্দর্য্যে যিনি নিখিল জগতের নয়ন-মনের তৃপ্তি দিতে সক্ষমা), দ্বিতীয় গুণ নববয়া (কিশোর বয়সে নিত্য স্থিতিশালিনী যিনি নিত্য নব কিশোরী), তৃতীয় গুণ চঞ্চল নয়না (হরিণ ও খঞ্জনের ন্যায় অসীম সুখপ্রদ চঞ্চল-নেত্রযুগল যিনি ধরিয়াছেন), চতুর্থ গুণ উজ্জ্বলস্মিতা (উজ্জ্বল আলোক অন্ধকার নাশ করে সেইরূপ মধুর হাসিতে যিনি মনের ঘোর বিষাদরূপ অন্ধকার নাশ করিতে সমর্থা), পঞ্চম গুণ চারু সৌভাগ্যরেখাঢ্যা (যে সকল রেখা কণ্ঠকরতলাদিতে থাকিলে অতুলনীয়া সৌভাগ্যশালিনী হয়, সে সমুদয় যাহাতে সুচারুরূপে বর্ত্তমান)

ষষ্ঠ গুণ গন্ধোন্মাদিত-মাধবা ( অঙ্গ-সৌগন্ধে যিনি মাধব শ্রীকৃষ্ণকে কুসুম-গন্ধে অলির ন্যায় উন্মাদিত করেন ), সপ্তম গুণ সঙ্গীত প্রসরাভিজ্ঞা ( যিনি বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে তাললয়যুক্ত সঙ্গীত বিস্তৃতরূপে অবতারণা করিয়া নিখিল সঙ্গীত-অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বিলজ্জিত করিতে নিপুণা ), অষ্টম গুণ রম্যবাক্ ( যাঁহার শ্রুতিমধুর বাক্যালাপ শ্রবণে নিখিল সংসার পুলকিত হয় ), নবম গুণ নর্ম্ম-পণ্ডিতা ( যিনি সুমোহন ক্রীড়াকৌতুকাদিতে বিজ্ঞা ), দশম গুণ বিনীতা ( দাসীবর্গকেও যিনি বিনয়পূর্ব্বক কথা বলেন ), একাদশ গুণ করুণাপূর্ণা ( আশ্রিত অতি ঘৃণ্য-জীবও যাঁহার দয়া হ'তে বঞ্চিত হয় না ), দ্বাদশ গুণ বিদগ্ধা ( রস পণ্ডিতা ), ত্রয়োদশ গুণ পাটবান্বিতা, ( চতুরা শিরোমণি ), চতুর্দ্দশ গুণ লজ্জাশীলা, পঞ্চদশ গুণ সুমর্য্যাদা ( যাঁহার ন্যায় সম্মানপাত্রী নিখিল সংসারে আর নাই ), ষোড়শ গুণ ধৈর্য্যশালিনী ( ধীরভাবে সমুদয় কার্য্য সম্পন্নকারিণী ), সপ্তদশ গুণ গাম্ভীর্য্যশালিনী ( সমুদ্রলহরীবৎ অসীম সুখবাসনাপুঞ্জ যাঁহার হৃদয়ে উত্থিত ও লুপ্ত হয়, বাহিরে প্রকাশ হয় না) অষ্টাদশ গুণ সুবিলাসা ( সর্ব্বোত্তম বিলাসকারিণী ) ঊনবিংশ গুণ মহাভাব পরমোৎকর্ষতর্ষিণী ( কৃষ্ণপ্রেমানন্দে অশ্রুকম্পপুলক হইতে সুদীপ্ত সাত্বিকমূর্চ্ছাদি সমুৎপন্ন হইবার আকরস্বরূপা যিনি ), বিংশ গুণ গোকুল-প্রেম-বসতি ( নিখিল গোকুলজনের প্রীতিপাত্রী ), একবিংশ গুণ জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশা ( যাঁহার মঙ্গলময় যশে অখিল সংসার ব্যাপ্ত ), দ্বাবিংশ গুণ গুর্ব্বর্পিত-গুরুস্নেহা ( গুরুজন যাঁহাকে গুরুস্নেহে আনন্দ দেন), ত্রয়বিংশ গুণ সখীপ্রণয়িতাবশা (সখীজনের প্রণয় বশীভূতা ), চতুর্বিংশগুণ কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা ( কৃষ্ণপ্রিয়াগণশ্রেষ্ঠা ), পঞ্চবিংশতি গুণ সন্ততাশ্রবকেশবা (সর্ব্বদা কেশব যাঁহার আজ্ঞাধীন) । বহু প্রকাশ করিয়া আর কি বলিব ; ইহা ভিন্ন শ্রীরাধাতে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সংখ্যাতীত-অনন্ত

গুণ বর্ত্তমান আছে! আহা এমন সর্ব্বশক্তিময়ী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের হর্ত্রী-কর্ত্রী-বিধাত্রী শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া আনন্দ দিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ কেননা এই প্রেমময়ীর সুমধুর রাধানাম বাঁশীর স্বরে উচ্চারণ করিবেন? যাঁহারা এই রাধাতত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন তাঁহারা রাধানাম পূর্ণভাবে উচ্চারণ করিলে কোন এক আনন্দরাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বাক্‌শক্তি রহিত জড়ের ন্যায় হইবে, বাহিরের সব কথা ভুলিয়া যাইবে, নয় আনন্দ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইবে, তাহার কোন অন্যথা নাই। সেই জন্য পরমতত্ত্ববেত্তা শ্রীপাদশুকদেব গোস্বামী ভগবতকথাকালীন এই নাম উচ্চারণ না করিয়া কেবলমাত্র সঙ্কেতে শ্রীকৃষ্ণের উপর ইহার পূর্ণ অধিকার ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

"অনয়ারাধিতং নুনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নোবিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামানয়দ্রহঃ॥"

ইতি রাস পঞ্চাধ্যায়।

রাসলীলাকালীন শ্রীরাধাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলে ব্রজ-গোপীবৃন্দ এই কথা বলিয়াছেন যে ইহার দ্বারা ভগবান ঈশ্বর হরি ব্রজেন্দ্রনন্দন সম্পূর্ণ আরাধিত (সুপূজিত) হইয়াছেন; যেহেতু কৃষ্ণ আমাদের সকলকে ত্যাগ করিয়া প্রীতমনে নির্জ্জনে তাঁহাকে লইয়া আনন্দ ভোগ করিতেছেন।

এখন ভাগবতবক্তা শ্রীপাদশুকদেব গোস্বামী যে ভাবে এই শ্রীকৃষ্ণ-হৃদয়েশ্বরী শ্রীরাধাকে আরাধনাকারিণী মধুরভক্ত-শিরোমণি-স্বরূপা করিয়া স্বসংকল্প সিদ্ধ করিয়াছেন, সেই ভাবে করুণাময়ী বৃন্দাবনেশ্বরী অবস্থান করিয়া তাঁহার প্রিয়ভক্তজনের আনন্দ বর্দ্ধন করুন। জগতে এই অখিলব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী শ্রীরাধা নায়িকারূপে এবং অখিলব্রহ্মাণ্ডেশ্বর

শ্রীকৃষ্ণ নায়করূপে মধুরলীলা সম্পাদন পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ রাজ্যে চির-বিরাজ করিতেছেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী কহিতেছেন—

"ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণি ॥
নায়ক-নায়িকা দুই রসের আলম্বন।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥"

অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন গোপপুত্র শ্রীকৃষ্ণতুল্য নায়ক (পুরুষ) আর কেহই নাই এবং বৃষভানুগোপপুত্রী শ্রীরাধাতুল্যা নায়িকা (নারী) আর কেহই নাই। এই নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন প্রেম, ইহাই জগতে শৃঙ্গার, মধুর অথবা উজ্জ্বল-রস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মধুর ভাবে কৃষ্ণ করুণানিধিকে পাইতে হইলে, সচ্চিদানন্দ রাজ্যে গমন করিতে হইলে, এই রাধাকৃষ্ণরূপ যুগল-চন্দ্রমাকে হৃদয়-গগনে উদয় করাইতে হইবে। তাই বলিতেছেন নায়ক-নায়িকা দুটী মধুর রসের প্রধান আলম্বন (আশ্রয়)। সেই মধুর রসাশ্রয়ী রাধা ও ব্রজেন্দ্রনন্দন ভিন্ন শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। মধুর রসের ভক্তদিগের এই দুটী প্রধান আশ্রয় ও সাধ্য বস্তু। কি ভাব লইয়া এই যুগল-চন্দ্রমাকে আশ্রয় করিতে হইবে অন্তরঙ্গ রায় রামানন্দ শ্রীমন্ গৌরসুন্দরকে যাহা বলিয়াছেন তাহা চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত, যথা—

"রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্য ভাবের না হয় গোচর ॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥

সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখী-লীলা বিস্তারিঞা সখী আস্বাদয় ॥
সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তাহা যেই করে অনুগতি ॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥"

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কহিতেছেন, যথা—

"বিভুরপি সুখরূপ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ।
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রস পুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ।
শ্রয়তি ন পাদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ ॥"

ঈশ্বর চিচ্ছক্তি ( জ্ঞানশক্তি ) ভিন্ন যেমন পুষ্টি লাভ করেন সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের ভাব সর্ব্বব্যাপক আনন্দঘন ও স্বপ্রকাশ হইলেও সখী ব্যতীত ক্ষণকালের জন্য রস পোষণ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সেই সখীগণের পদ কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি আশ্রয় না করেন? আত্ম সুখ ভোগের জন্য তাঁহারা কি মধুর রসপাত্রী হন—তাহা নহে। রাধাকৃষ্ণের সুখ সংঘটনে বা দর্শনে তাঁহাদের সুখ সেই জন্য কহিতেছেন—

"সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা সে করায়।
নিজ কেলী হৈতে তাতে কোটী সুখ পায় ॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা ॥

কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজসেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটী সুখ হয়॥"

কিন্তু করুণাময়ী প্রেমনিধি রাধিকা নিজ স্বভাবে সখীগণকে কৃষ্ণ-সঙ্গসুখ দেন; তাই বলিতেছেন—

"যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম॥
নানা ছলে কৃষ্ণ প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্ম-কৃষ্ণসঙ্গ হতে কোটি সুখ পায়॥
অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট।
তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রিয়া সাম্যে তারে কহে কাম নাম॥"

কামক্রিয়া অভিনয়ের তুল্য বলিয়া কাম নামে অভিহিত হইলেও প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষের যে কাম-বিলাস তাহা ব্রজগোপিকাগণের নহে, উহা শুদ্ধ প্রেম মাত্র জানিবে। সূর্য্যকিরণ প্রাকৃত-অগ্নিতুল্য জ্বালা বিশিষ্ট অনুভূত হইলেও প্রাকৃত অগ্নিদ্বারা যে প্রাকৃত রন্ধনাদি কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা সূর্য্যকিরণে যেমন সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ ব্রজদেবীগণের অপ্রাকৃত কামে প্রাকৃত কামের কার্য্যাদি লক্ষিত হয় না। তবে নির্জ্জল মরুবালুকাতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া যেমন প্রাকৃত অগ্নির রন্ধনাদি কার্য্য সম্পন্ন করে, সেইরূপ মরুভূমির ন্যায় কঠিন-হৃদয়-পশ্বাচার-বালুকাপূর্ণ মানবের চিত্তে ইহা প্রাকৃত কামবৎ হইতে পারে; কিন্তু ভক্তি-গঙ্গা-প্রবাহিতা সৎসঙ্গ-বিজ্ঞান-শস্যফল-পাদপসমন্বিত সরস-মানব-হৃদয়-ক্ষেত্রে ইহা প্রেম বা অপ্রাকৃত কাম

নামে অভিহিত। এতৎ সম্বন্ধে গৌতমীয় তন্ত্র প্রমাণ দিতেছেন, যথা—

"প্রেমৈব গোপরামানাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়া ॥"

অর্থাৎ গোপিকাগণের যে শুদ্ধ প্রেম তাহা কামপ্রথার তুল্য শ্রীকৃষ্ণে গমন করিয়াছে, এই জন্য কামতুল্য-প্রেমকে ভগবানের প্রিয় সখা উদ্ধবাদি বাঞ্ছা করিতে থাকেন। প্রাকৃত কামের কার্য্য ও অপ্রাকৃত কামের কার্য্য রামানন্দ রায় মহাপ্রভুকে শুনাইতেছেন, যথা—

"নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাপর্য্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপী-ভাববর্য্য ॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার ॥
সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ হয়;
বেদধর্ম্ম ত্যজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥"

সেই রাগানুগা ভক্তিমার্গ কেমন তাহা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী নিজ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥"

অর্থাৎ অভীষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী যে একটী প্রেমময়ী তৃষ্ণা থাকে, তাহা হইতে একটি পরমাবিষ্টতা উৎপন্ন হয়; যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা হইতে

এই পরম আবেশভাব উৎপন্ন, সেই প্রেমময়ী তৃষ্ণার নাম রাগ; রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। এই রাগানুগা ভক্তি ব্রজবাসি জনে প্রকাশিত, সেই সম্বন্ধে কহিতেছেন, যথা—

"বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥"

অর্থাৎ ব্রজবাসি জনে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিতা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিকেই রাগানুগা ভক্তি বলে। এই রাগানুগা ভক্তির শেষ পক্ক অবস্থা কি তাহা কবিরাজ গোস্বামীর ভাষাতে এইরূপ, যথা—

"এই মত যেই করে রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি॥
প্রীত্যঙ্কুরে রতি ভাব হয় দুই নাম।
যাহা হইতে বশ হয় শ্রীভগবান॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হইলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণ ভক্তি রসের সেই স্থায়ী ভাব নাম॥
কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্ব অনর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হইতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম॥

প্রেমা ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড-সার।
শর্করা, সিতা, মিশ্রি শুদ্ধ মিশ্রি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল ক্রমে বাঢ়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদি তৈছে বাঢ়য়ে আস্বাদ॥
অধিকারীভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর॥
প্রেমাদিক স্থায়ী ভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥
বিভাব, অনুভাব সাত্ত্বিক ব্যভিচারী।
স্থায়ী ভাব রস হয় মিলে এই চারি॥
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্ব আস্বাদনে॥
দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন উদ্দীপন।
বংশী স্বরাদি উদ্দীপন কৃষ্ণাদি আলম্বন॥
অনুভাব স্মিত নৃত্য গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর॥
নির্ব্বেদ হর্ষাদি তেত্রিশ ব্যভিচারী।
সব মেলি রস হয় চমৎকারকারী॥"

প্রেমাদিতে স্থায়ী ভাব সামগ্রী মিলিত হইয়া কৃষ্ণভক্তিরসের যে সর্ব্বানন্দকর বিকার তাহা সংঘটিত হয়; সেই স্থায়ীভাব চারিটি ভাবের দ্বারা প্রকাশ পায়; চারিটি যথা—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ও ব্যভিচারী-ভাব। দধিতে খণ্ড (খাড় শর্করা), মরিচ ও কর্পূর

মিলিত হইলে যেমন রসালা নামক আস্বাদবিশিষ্ট অপূর্ব্ব রস বস্তু উৎপন্ন হয় সেইরূপ স্থায়ীভাবে উক্ত চারিটি ভাব মিলিয়া অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-ভক্তি রস হইয়া থাকে। যে অবলম্বনে স্থায়ীভাব উৎপন্ন, তাহাকে বিভাব কহে। ইহা দুই প্রকার—যথা, আলম্বন বিভাব আর উদ্দীপন বিভাব; ইহার মধ্যে কৃষ্ণাদি আলম্বন বা আশ্রয় বিভাব; এবং বাঁশীর ধ্বনি প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব; যেহেতু বংশীধ্বনি প্রভৃতিতে কৃষ্ণস্মৃতি জাগরিত করে। স্থায়ী ভাবের কার্য্য প্রকাশের নাম অনুভাব; ভগবদ্ প্রেমমত্ত ভক্তের স্মিত ( ঈষৎ হাস্য ), উল্লাসভরে নৃত্য ( নাচ ), আনন্দে গীত ( লীলা কীর্ত্তন ), উদ্ভাস্বর ( উজ্জল দিব্যকান্তি ) এইসব অনুভাবহেতু ভক্তের শরীরে প্রকাশ পায়। সাত্বিক অনুভাবের দ্বারা স্তম্ভ ( স্তম্ভবৎ অবস্থান ), অশ্রুপাত, কম্পন, পুলক ( রোমাঞ্চ ) ইত্যাদি ভক্তের শরীরে প্রকাশ পায়। আর ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা নির্ব্বেদ ( অনুতাপ ), হর্ষ ( আনন্দ প্রকাশ ) প্রভৃতি তেত্রিশ প্রকার ভাব ভক্তের শরীরে প্রকাশ পায়। এই ভাবে চমৎকার-জনক কৃষ্ণভক্তি রস সৃষ্ট হইয়া পাঁচটি মুখ্য নামে অভিহিত হইতে থাকে। এই পাঁচটি মুখ্যের ভিতরে পূর্ব্বোক্ত চারিটি ভাব, প্রত্যেকটীর ভিতরে থাকিবে। পাঁচটি মুখ্যভাব, যথা—

"পঞ্চবিধ রস শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।  
মধুর শৃঙ্গার নাম সবাতে প্রাবল্য ॥  
শান্তরসে শান্তরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়।  
দাস্যরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাঢ়য় ॥  
সখ্য বাৎসল্য রস পায় অনুরাগ সীমা।  
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥

রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণে রূঢ়, অধিরূঢ় গোপিকানিকরে॥
অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার।
সম্ভোগে মোদন বিরহে মোহন নাম তার॥”

যাহাতে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ উদ্দীপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, সেই মহাভাবকে মোদন কহে। হ্লাদিনীসার অর্থাৎ প্রেম সর্ব্ববিধ ভাবের উদ্গমে উল্লাসী হইলে তাহাকে মাদন কহে। এই মাদন পরাৎপর অর্থাৎ প্রেমাবস্থার শেষ সীমা কেবলমাত্র শ্রীরাধাতে প্রকাশ—

“মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্প মোহনে দুই ভেদ॥
চিত্রজল্প দশ অঙ্গ প্রজল্পাদি নাম।
ভ্রমরগীতার দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ॥
উদ্‌ঘূর্ণা বিবশ চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান॥
সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার॥
বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বরাগমান।
প্রবাসাখ্য আর প্রেম বৈচিত্ত্য আখ্যান॥
রাধিকাদ্যে পূর্ব্বরাগ প্রসিদ্ধ প্রবাসমানে।
প্রেম বৈচিত্ত্য শ্রীদশমে মহিষীগণে॥”

নিজ তুল্য অবস্থা অপর কাহাকে দেখিয়া স্বীয় পতিবিচ্ছেদজনিত চিত্তভাব তাহাতে আরোপ করার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য ইহা শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে উত্তরার্দ্ধে দ্বারকা-রাজমহিষী গীতাতে প্রকাশ, যথা—

"কুররি বিলপসিত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে ;
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্ গাঢ় নির্ব্বিদ্ধচেতা ;
নলিন-নয়ন হাসোদার লীলেক্ষিতেন ॥"

অর্থাৎ হে কুররি! এই জগতে তুমিই একাকিনী নিদ্রাশূন্যা হইয়া শয়নের ইচ্ছাও করিতেছ না, যেহেতু উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছ। আমাদের পতি শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি এই রাত্রিকালে কোন নিভৃত স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে নিদ্রা যাইতেছেন, হে সখি! সেই নলিন-নয়নের উদার-হাস্যভঙ্গী ও কটাক্ষপাতন দ্বারা আমাদের ন্যায় তুমিও বুঝি আকর্ষিত-চিত্তা হইয়াছ। করুণানিধি কৃষ্ণের এই রসময়ী লীলার রসাস্বাদ ভক্ত ভিন্ন কেহ করিতে সক্ষম নয়; তাই শ্রীমন্ গৌরসুন্দর শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে কহিলেন—

"এই রসাস্বাদ নহে অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে ॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত

ভক্তি রসামৃতসিন্ধুতে এ সম্বন্ধে দক্ষিণবিভাগে প্রকাশ, যথা—

"সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রস।
তৎ পাদাম্বুজ সর্ব্ব স্বৈর্ভক্তৈ রেবানুরস্যতে ॥"

অর্থাৎ এই ভগবৎ রস অভক্তদিগের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে দুরূহ, সেই কৃষ্ণকরুণানিধির চরণকমল যাহাদের সর্ব্বস্ব হইয়াছে, এই ভাবের ভক্তগণ সর্ব্বদা উহা আস্বাদন করিয়া থাকেন। কলিহত জীবকে এই রস আস্বাদনের উপযোগী করিবার জন্য যুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীসনাতনকে কহিয়াছিলেন—

"শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তি-স্মৃতি-শাস্ত্র করি করিহ প্রচার॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত।

বৈষ্ণবীয় ভক্তি-স্মৃতিশাস্ত্র-অনুসারে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-আচার না ধরিলে জীবের উদ্ধার আর নাই। এই বৈষ্ণবীয় ভক্তি-শাস্ত্র (শ্রীমদ্ভাগবত-পদ্মপুরাণাদি) ও বৈষ্ণবীয় স্মৃতি-শাস্ত্র (নারদ-পঞ্চরাত্র-হরিভক্তি-বিলাসাদি) যাহারা মানে না, সেই কৃষ্ণভক্তিরহিতগণের সঙ্গ কোন প্রকারে উচিত নহে; এ সম্বন্ধে শ্রীগৌরাঙ্গও শ্রীসনাতনকে কহিয়াছিলেন—

"বরং হুতবহ জ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্॥"

অর্থাৎ প্রজ্বলিত হুতাশনে শিখাযুক্ত-পঞ্জরের মধ্যে অবস্থান সেও ভাল, তথাপি যেন শ্রীকৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সহবাসরূপ-পীড়া ভোগ করিতে না হয়।

ঈশ্বরচিন্তাবিমুখ মায়ার লাথি-ঝাঁটা খাইয়া কুক্কুরের ন্যায় যাহারা যেখানে সেখানে ঘুরিতেছে, ঐহিক সুখের জন্য যাহারা নদীতীরে বকের ন্যায় সাধু সাজিয়াছে, দুর্ব্বল অজ্ঞান জীবকে লোভ দেখাইয়া যাহারা স্বার্থসাধনপূর্ব্বক মূর্খ লোকের কাছে বলশালী ভাগ্যবান বলিয়া পরিচিত হইতেছে, তাহারা এই অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে ব্যভিচার পূর্ণ বলিয়া মনে করে; কিন্তু জিতেন্দ্রিয় বীরপুরুষ যাঁহারা, তাঁহারা এই লীলাকে ভবমহাসাগর তরণের একমাত্র তরণি-জ্ঞানে সমাশ্রয় করিতেছেন। এক মানুষ-পশু এক দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর! তোমাদের কেষ্ট ঠাকুর ত বড় অন্যায় করেছে; একজনের মনকষ্ট দিয়ে, একজন আবার কেউ নয়, তার মামা আয়ান

ঘোষ, তার বৌ আধিকে”—বনের পশুটি এমন পণ্ডিত যে রাধিকে নাম উচ্চারণ করিতে পারে না, তিনিই আবার রাধাকৃষ্ণ-চরিত্র সমালোচনা করিয়া সন্দেহযুক্ত হইয়াছেন—“তাকে নিয়ে আসলীলেটা করা ভাল দেখায় কি? তোমরা ঠাকুর যাই বল না কেন, আমার কাছে স্বামীকে নিয়ে হক্ আর পরের বউ-ঝি নিয়ে হক্ ও কুচ্ছোলীলেটা ভাল দেখায় না।” আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, “তোমার ন্যায় জ্ঞানী পণ্ডিতের কাছে ভাল দেখায় না এ সত্য কথা বটে; কিন্তু ভাই আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—কুচ্ছোলীলা (কুৎসা লীলা, নিন্দনীয় লীলা—মানুষটি বড় পণ্ডিত বলিয়া কুৎসা শব্দের পরিবর্ত্তে কুচ্ছো শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক দেবভাষার অভিনব সংস্কার করিয়াছে) এ লীলাটি কাহার করা উচিত?” সে বলিল “বেকরা বউয়ের সঙ্গে করা উচিত?” আমি বলিলাম “তা ভাল বটে, কিন্তু বেদব্যাস ঋষির বুদ্ধি বোধ হয় ভাল ছিল না বলে, দ্বারকাতে কৃষ্ণের অষ্টাধিক ষোল হাজার রাজমহিষী থাকা সত্ত্বেও তাঁদের লইয়া রাস-লীলার কথা লেখেন নাই, রাসলীলা কেবল ব্রজের ভিতর তাঁর স্বামীকে ও গোপকামিনীদের লইয়া লিখিয়াছেন; আর বেদব্যাসের বা দোষ দিব কিসে, দোষ সব কৃষ্ণের; কেন না সে যা করিয়াছে বেদব্যাস তাহাই লিখিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাসা করি—তুমি বোধ হয় কুচ্ছোলীলা-টিলা এ সব কিছু কর না?” সে বলিল তা “আমি কর্‌ব কেন? আমার যে বিয়ে করা বউ আছে, আমি তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তা কর্ত্তে পারি।” আমি তখন বলিলাম “যা ইচ্ছে ত করো. কিন্তু কোথায় বউকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করো?” সে তখন সহাস্যমুখে, আমাকে বলিল “ঠাকুর যেন জানে না, ঘরের ভেতর আবার কোথায় কর্‌ব!” আমি বলিলাম, “কোন্ ঘরের ভেতর, ঠাকুর ঘরের ভেতর, না

গোয়াল ঘরের ভেতর?” অমনি সেই মূর্খ বড় বড় চোখ ক’রে আমার দিকে চাহিয়া বলিল “ঠাকুর তুমি কি ক্ষেপেছ? আমচন্দ! আমচন্দ! ঠাকুর ঘরে, গোয়াল ঘরে এ সব কুচ্ছো কাজ মানুষে করে কি?” আমি হাসিলাম, বলিলাম, “এই তুমি বললে যে বিয়ে করা বউয়ের সঙ্গে যা কিছু করা যায় সব ভাল,এ যায়গায় কুচ্ছো কাজ আবার হ’ল কেন?” সে বলিল” তিরি (স্ত্রী) জাতির সঙ্গ করা কুচ্ছো বৈ কি? কুচ্ছো না হলে গোপ্তভাবে মানুষ এসব করে কেন? ঠাকুর দেবতারা কি এসব কুচ্ছো দেখে না শোনে; এই জন্য এসব কাজ লুকিয়ে চুপে চুপে কর্ত্তে হয়।” আমি ধৈর্য্যহারা হইয়া উত্তেজনা-সহকারে তখন বলিতে লাগিলাম “ও মূর্খ বিষয়ী শূকরতুল্য মানুষ! তুমি নিজে পাপ কাজ করুছ, তা লুকাবার চেষ্টা কর্‌লেও ঈশরশক্তি-প্রভাবে তা তোমার মুখ হ’তে আপনিই প্রকাশ হচ্ছে; তোমার ভাব আবার সংসার-পাপপুণ্যের অতীত শ্রীকৃষ্ণে আরোপ করিয়া তাঁর চরিত্রে সন্দিহান হইতেছ। যে করুণানিধি কৃষ্ণ তোমায় ধরা দিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে চরিত্রদোষযুক্ত মনে করিয়া কালসর্পিনী নারীজাতিকে সতী সাজাবার মন্ত্র দ্বারা বাধ্য করে হৃদয়ক্ষেত্রে যেমন স্থান দিয়েছ, তেমনই তার বিষ-জ্বালায় অনন্তকাল রাত্রিদিন জ্বলে-পুড়ে মর্‌ছ! ওরে মূর্খ! তুই বল্‌লি যে দেবতারা এ সব কুচ্ছো দেখে না। সত্য কথা! তোরা নারীজাতি নিয়ে পাপকার্য্য করিস্, তাই লুকিয়ে চুপে চুপে দেবতাদের দেখ্‌তে দিস্ না; কিন্তু আমার করুণানিধি কৃষ্ণ যখন রাসলীলা করিয়াছেন, তখন দেবগণ বিমান-আরোহণপূর্ব্বক সস্ত্রীক এই লীলা দর্শনপূর্ব্বক আত্মহারা হইয়া ব্রজগোপীর দাসত্ব স্বীকার করযোড়ে সজল নয়নে প্রার্থনা করিয়াছেন। গন্ধর্ব্বপতি চিত্ররথাদি এই রাসবিহারী ও

রাসবিহারিণীগণের জয়গানপূর্ব্বক স্বর্গীয়-কুসুম বর্ষণ করিয়াছেন। এই রাধাকৃষ্ণ-লীলা-মূলক রাসলীলা-যুক্ত-কথা শুনিবার জন্য পরীক্ষিৎ সকাশে দেবগণ-ঋষিগণ পর্য্যন্তও ছিলেন! অতএব শ্রীকৃষ্ণের এ রাস লীলা ব্যভিচার-লীলা নয়, সচ্চিদানন্দ প্রেমময়-লীলা। এই লীলা গান করিয়া মানব, মানব হইতেছে ও হইবে। এই গোপনারীগণের সহিত রাসলীলার মহিমা শ্রীমদ্ভাগবত যাহা কহিতেছেন, তুই তা শ্রবণ কর্—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণো,
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃনুযাদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীর॥"

অর্থাৎ ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়াকথা শ্রবণপূর্ব্বক যে অপরের কাছে ইহা বর্ণন করিবে, সেই ধীর ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে শ্রেষ্ঠভক্তি লাভপূর্ব্বক হৃদ্‌রোগস্বরূপ নারীজাতির সহিত সম্ভোগবাসনা যে কাম, তাহাকে শীঘ্রই দূর করিবে। অতএব নারীজাতির সহিত সম্ভোগ চরিতার্থ রাস-লীলা নহে। সম্ভোগবৃত্তি নাশ করাই রাসলীলা। যে সম্ভোগবৃত্তির জন্য রাসলীলাকে কুৎসিত লীলা বলিয়া তোমরা কৃষ্ণচরিত্রে সন্দিহান হও, সেই সম্ভোগবৃত্তি তোমাদের শরীরে প্রবল এবং কামভোগে আসক্ত তোমরা, সেইহেতু তোমাদের চরিত্র কৃষ্ণচরিত্রে আরোপ করিয়া নরকে যাইবার পন্থা পরিষ্কার করিতেছ। শ্রীকৃষ্ণ কামভোগে অনাসক্ত সমুদ্রবৎ সর্ব্ব-বাঞ্ছা-পূর্ণকারী সর্ব্বেশ্বর একমাত্র পুরুষ। তোমাদের কাছে বিবাহিতা পত্নী যা, আর বাজারের বেশ্যা তা, যেহেতু তোমরা নারীজাতিকে কেবল মাত্র উপভোগ্যা করিয়া রাখিয়াছ; সর্ব্বজীবে ভালবাসা

পরিত্যাগ করিয়া নিজের দেহের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া; সেই মল-মূত্রাধার প্রতিমাটিকে স্বর্গের সোপান জ্ঞানে সর্ব্ব চিন্তা ত্যাগ করিয়াছ। আজ তুমি মরিলে তোমার স্বর্গসোপান নারীটি কোথায় থাকিবে জান? হয় লুক্কায়িত ভাবে নয় প্রকাশ্যে আবার কারও স্বর্গে দিতে থাকিবে! তুমি বুঝি পুরুষ? হাঁ হাঁ, নারীজাতিকে যখন খেটে খেটে খাওয়াতে শিখেছ, নারীকে পোষণ কর্‌বার জন্য যখন পরের চাকর হতে শিখেছ, তখন পুরুষ বৈকি! এখন এই স্থানে একটি মীমাংসা পাওয়া যায়; অর্থ দিয়ে বেশ্যার কাছে গিয়ে যে সুখ পাও, সেই সুখ বিবাহিতা পত্নীর কাছে অর্থ দিয়ে তোমরা গ্রহণ করো। সুস্থ দেহে নিঃসম্বল অবস্থায় ঘরে একমাস বসিয়া থাক, তোমার বিবাহিতা নারী যদি পরিশ্রমপূর্ব্বক বস্তু সংগ্রহ করিয়া সমান-স্নেহে তোমাকে পালন করে, তবে জানিবে সে স্ত্রী, নতুবা সে অর্থসুখপ্রয়াসিনী বেশ্যা ভিন্ন কিছুই নয়। একটি স্ত্রীর ভরণপোষণ করিতে সারাজীবন ত্যক্ত ভাবে কাটাইতেছ; একদিন অর্থাদি না পাইলে নারীজাতির মধুর ভর্ৎসনা তোমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হয়; আর বৃন্দাবনের এই কাল পুরুষটির দিকে দেখ দেখি, ইনি কেমন ভাবে নারীজাতির কাছে সম্মান পাইতেছেন; ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, তাহা গোপীগীতাতে প্রকাশ, যথা—

"সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা।
বরদনিঘ্নতো নেহকিং বধঃ॥"

হে মদনক্রীড়ার নায়ক! আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসী; কোন স্বার্থের দাসী নয়, তবে কেন আমাদের বাসনা পূর্ণ করিতেছ না! তুমি ত আমাদিগকে চরণে দাসী করিবে বলিয়া বরদানপূর্ব্বক আমাদের এখানে আনিয়াছ; হে বরদ! এতাদৃশ অবস্থায় সব ত্যাগ

করিয়া যখন আমরা এখানে আসিয়াছি, তখন তুমি কেন আমাদিগকে দাসী করিতেছ না! অর্থাদি চাই না, চাই শুধু তোমার চরণসেবা করিতে, তবে কেন আমাদের চিত্তে দর্শন না দিয়া আঘাত করিতেছ! ইহা কি যন্ত্রণা দিয়া বাণবিদ্ধা-হরিণীর বধ করার তুল্য হইতেছে না!! মূঢ় জীব! একটি নারীর ভরণপোষণে সারা জীবন দিতেছ; আর শত কোটী গোপী শ্রীকৃষ্ণের বিনামূল্যের দাসী হইয়াছে! তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ তুমি কেমন পুরুষ, আর বৃন্দাবনের ওই কালো ঠাকুরটি কেমন পুরুষ! পুরুষ থাকে ত একমাত্র উনিই জগতে আছেন। তুমি নারীতে আসক্ত নারী ভিন্ন কিছুই নও। আর পতি-পরায়ণা সতী থাকিতে হয়ত ব্রজগোপীকারাই আছেন। পরম পুরুষ ও পরম সতীকুলের চরিত্র বিশেষরূপে না লিখিয়া, বেদব্যাস সাবিত্রী-সত্যবান এবং বশিষ্ঠ-অরুন্ধতী প্রভৃতির চরিত্র লিখিয়া শান্তি পান নাই, সেই জন্য নারদের উপদেশে এই শ্রীমদ্ভাগবতমূলক ব্রজগোপীবৃন্দ ও গোপীজনবল্লভের চরিত্র লিখিয়া পরম শান্তি পাইয়াছেন। মায়ারহিত বনবাসী ঋষি-তপস্বীগণের শান্তিদায়িনী যে রাসলীলা তাহা কখন কলুষ-ভাবাপন্ন হইতে পারে না। কুলবতী নারীগণের লজ্জা ত্যাগ মরণের তুল্য; পরম-সতী গোপীগণ পরম-পতি শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য সেইরূপ লজ্জাত্যাগরূপ মরণের পথে অগ্রসর হইয়াছেন; বস্ত্রহরণ-লীলাতে পরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উলঙ্গ-অবস্থায় গোপীগণের যে গমনাদি, ইহাই গোপীবৃন্দের লজ্জা-ত্যাগরূপ মরণ-তুল্য হইয়াছে। কৃষ্ণের জন্য গোপীগণ যেমন মরিয়াছে তেমন আর কেউ পারিয়াছে কি? শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে গোপীদের যে প্রেম-প্রলাপ-ময় বিরহদশা দেখা যায়, সেইরূপ দশা কিছুমাত্র কোন মানবশরীরে প্রকাশ পাইলে সেত ঈশ্বরত্বকে প্রাপ্ত হইবে! এমন স্বার্থহীনা প্রেমময়ী

নায়িকা-চিত্র কোন জগতে কি দেখা যায়? গোপীগণ গোপীগীতাতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—গোপীবৃন্দের উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে নিকটে রাখিয়া কেবল তাঁহাকে সুখী করি, তিনি যাহা প্রার্থনা করেন তাহা দিয়া তাঁহাকে সুখী করিব—এই ভাবে বলিতেছেন—

"চলসি যৎ ব্রজাচ্চারয়ণ্‌ পশুন্‌
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্‌।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥"

হে নাথ! তুমি যখন গোচরণ করিতে করিতে ব্রজভূমি (গোচারণ-ভূমি) হইতে গমন কর, তখন কঙ্কর-নবদূর্ব্বাঙ্কুর তোমার নলিনতুল্য কোমল-চরণে লাগিয়া কতই না দুঃখ দিতে থাকে, ইহা চিন্তা করিয়া আমাদের মন ঘোর বিষাদ-মালিন্য প্রাপ্ত হয়; সেই কোমল-চরণ প্রাণ-প্রিয়তম অন্ধকারপূর্ণ বৃন্দাবনের কাঁটাকঙ্করযুক্ত কুঞ্জ-পথে চলিতেছে; ইহাতে আমাদের বক্ষে শেলাঘাতের ন্যায় দুঃখ আনয়ন করিতেছে। ইহাতে গোপবালাগণের কি প্রেম-পিপাসা জানা যায়! নিঃস্বার্থ কৃষ্ণসুখ দেবার প্রেমপিপাসা নয় কি? তাঁহাদের উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে নয়ন-সম্মুখে রাখিব, প্রাণ দিলে যদি কৃষ্ণ সুখী হয় তাহা করিব, তথাপি নয়নের মনের বাহিরে প্রিয়বন্ধুকে যাইতে দিব না। কোন দেশে এমন প্রেমময়ী দেবীগণের আবির্ভাব আছে কি? আমার জন্য যাঁহাদের প্রাণদানব্রত, সেই প্রেমময়ী কামিনীকুলের চরণ ধরিয়া "তোমাদের ন্যায় সুখদায়িনী কে আছে, এই প্রেমসুখ সর্ব্বদা আমাকে দিয়ো"—এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাশ্রু-পাতন-বিনয়তাপূর্ণ-কৃতজ্ঞতা-স্বীকারে কি কামুকতার প্রকাশ পায়? শ্রীকৃষ্ণ কি কামুক? ব্রজগোপীরা কি কামুকা? কাম ত তাহাকে বলে, স্ত্রী-পুরুষের

ক্ষণকাল-সম্ভোগময়ী, পাত্রাপাত্র-জ্ঞানরহিতা যে বাসনা। গোপী ও কৃষ্ণের প্রেমবাসনা কি ক্ষণকাল জন্য? তাহা নহে; কৃষ্ণের অন্তরে চিরদিনের জন্য গোপী, ও গোপীদের অন্তরে চিরদিনের জন্য কৃষ্ণ বাস করিতেছেন। দ্বারকাবাসকালে রুক্মিণী-আদি বিবাহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কামুকতা প্রকাশ পায় নাই; সতীশিরোমণি গোপীদের উজ্জ্বল প্রেম-চিত্র জগতে দেখাইবার জন্য নিজের বহির্কঠোরতা দেখাইয়াছেন. আর মনে মনে গোপীদের ধ্যান ধরিয়াছেন। রূপে-গুণে অতুলনীয়া ব্রজ-দেবীগণ দ্বারকাবাসকালে শ্রীকৃষ্ণে সেই পূর্ণ প্রেমময়ী ছিলেন তাহা, কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-সহিত মিলিত হইয়া গোপীগণ যাহা বলিয়াছেন. তাহা শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিতেছেন, যথা—

"আহুশ্চ তে নলিননাভপদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার-কূপ পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপিমনস্যুদিয়াৎ নঃ॥"

হে পদ্মনাভ! তোমার চরণকমল সংসারকূপে পতিত জনগণের উদ্ধার করিবার প্রধান অবলম্বনস্বরূপ, গভীর জ্ঞানী যোগেশ্বরগণের উহা চিন্তনীয়; গৃহে অবস্থানকারী আমাদের মনে ওই চরণ সদাই যেন উদয় হয়। এই শ্লোকের মুখ্য-উদ্দেশ্য চৈতন্যচরিতামৃতকার বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার উক্তিতে প্রকাশ করিতেছেন, যথা—

"রাজবেশ হাতী-ঘোড়া-মনুষ্য-গহন,
কাঁহা গোপবেশ কাঁহা নির্জ্জন কানন॥
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
পাই যদি তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে।
উদয় করয়ে যদি তবে বাঞ্ছা পুরে ॥”

মূঢ় জীব! শ্রীরাধার কি অবিচল প্রেম তাহা দর্শন কর; রাজমহিষীবৃন্দ সহিত কৃষ্ণকে দেখিয়া সেই প্রেমলিপ্সা যেন প্রিয়তমের প্রতি অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। বহুবল্লভ হইলেও সে আমার ভিন্ন অন্য কারও নয়! চিরদিন রাধিকার এই ভাব। অন্যান্য মহিষীরা কৃষ্ণকে সুখ দিতেছেন, আমি দিতে পারিলাম না, এইভাবে তিনি দুঃখ ভোগ করিতেন। কিন্তু কদাপি তিনি যে মহিষীদের প্রতি ঈর্ষাযুক্ত হইতেন তাহা নহে; বরং তাহাদের গৌরব করিয়া নিজের লঘুতা প্রকাশ করিতেন, তাহা শ্রীরাধার মাথুর বিলাপে প্রকাশ যথাঃ রসিক চণ্ডীদাসের ভাষায়—

“কোন্ সে নগরে, নাগব রহিল, নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন্ গুণবতী, গুণেতে বেঁধেছে, লুবধ ভ্রমর মোর ॥”

অথবা রসিক শশীশেখরের ভাষায়—

চিরদিবস ভেল হরি, রহল মথুরাপুরি,
অতয়ে হাম বুঝল অনুমানে
মধু নগর যোষিতা, সবহুঁ তারা পণ্ডিতা,
বাঁধল মন সুরত রতিদানে ॥
গ্রাম্য গোপবালিকা, সহজে পশুপালিকা
হাম কিয়ে শ্যাম সুখ ভোগ্যা।
( তারা ) রাজকুলসম্ভবা, ষোড়শী নব গৌরবা,
যোগ্যজনে মিলয়ে যেন যোগ্যা ॥”

সর্ব্বগুণনিধান ভগবৎ পুরুষকে অসীম বাধাবিঘ্নের মধ্যে রহিয়া কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহা সতীশিরোমণি রাধা ভিন্ন আর

জগতে কেহই দেখাইতে পারে নাই; এইহেতু কৃষ্ণবহির্মুখ মায়িক-পতি আয়ানের অধিকারে রাধিকাকে কৃষ্ণ নিজের ইচ্ছায় রাখিয়াছেন; অন্যান্য গোপবালাগণের তত্ত্ব ঠিক সেইরূপ। নিজের বস্তু অপরের অধিকারে রাখিয়া দিলে সে বস্তু কি অপরের হয়? প্রভুর দ্রব্য ভৃত্যের রক্ষণাবেক্ষণরূপ-অধিকারে থাকে, ভোগ-অধিকারে থাকে না। সেইরূপ বিশ্বপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী গোপীগণ, অন্যান্য গোপগণ ভৃত্যের ন্যায় তাঁহাদের রক্ষকমাত্র। রাজার অবিদ্যমানে নিম্নশ্রেণীর দাসীদের দুষ্ট রাজভৃত্যযোগে যেমন গর্ভ-পুত্রাদি হয়, সেইরূপ নিম্ন-শ্রেণীর গোপীদের পুত্রাদির কারণ জানিবে। রাজপাট-মহিষী রাধা, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে এ সব সম্ভব নাই। সর্ব্বদাই গোপীগণ কৃষ্ণকে স্বামীরূপে যখন ভাবিয়াছেন, তখন তাঁহারই ত কৃষ্ণের নিত্যপত্নী। কেউ কাহাকে যদি স্বামীরূপে ভালবাসে, মাতা-পিতার ইচ্ছাও তদ্রূপ, সংসারের ঘটনাপ্রযুক্ত যদি সেই বিবাহপ্রথা বন্ধ হইয়া অপর কাহার সহিত বিবাহ হয়, কিন্তু সেই বিবাহিতা বালিকা যদি সেই পূর্ব্ব বন্ধুকে—যাকে মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল তাকে—না ভুলিয়া পূর্ব্ব ভালবাসা তাহার সহিত সমভাবে রাখে, তবে তাহার কি ব্যভিচার দোষ হয়? না সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখান হয়? বিচার করিলে জানা যায় ইহাতেই পরম সতীত্ব থাকে। সেইরূপ গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ প্রথম হইতে স্থির, ও সংঘটিত হয়; তবে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার প্রভাবে তাহা অন্যের সহিত সংঘটিত হইয়াছে প্রেমের পরমোজ্জ্বল-জ্যোতি প্রকাশ জন্য। ইহা ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণাদি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবে। কৃষ্ণকে সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বেশ্বর ভগবান বলিতেছে; অতএব তাঁহার মাতা কে পিতা কে, আর মামা-মামী কে ইহাতে জানা যায় না। তবে এই

মাত্র প্রকাশ, যে ভক্ত তাঁহাকে যেমন ভাবে ভালবাসে, তিনি সেই ভাবে সেই ভক্তের বাসনা পূর্ণ করেন। অথবা তিনি নিজেই নিজের মাতা-পিতা-ভাই-বন্ধু বা স্বামী-মামা জানিবে। একদিন এক স্ত্রী হাসি করিয়া তাহার স্বামীকে বলিল "তুমি যখন অন্নদাতা, তখন অন্নদাতা ত একটি পিতা শাস্ত্রে বলে—অতএব তুমি আমার পিতা।" তখন স্বামী হাসিয়া কহিল "মাতৃতুল্য মহানসে"—অর্থাৎ রন্ধনকার্য্যে মায়ের তুল্যজনকে দিবে, তুমি রন্ধন করিয়া যখন আমাকে দাও, তখন তুমি ত মাতৃতুল্য, অতএব তুমি আমার মা।" এইরূপ হাস্য-সূচক বাক্যে সেই স্ত্রী কি স্বামীর মা হইল, না স্বামী স্ত্রীর পিতা হইল! সকলেই জানিতেছে যে তা কখনই হয় না, একে বলে মাত্র হাসি। সেইরূপ কৃষ্ণের স্বামী রাধা বা মামা আয়ানঘোষ কেবল হাস্যজনক বাক্য জানিবে। সেই মূর্খ তখন আমার পদধূলি লইয়া বলিল, "ঠাকুর ক্ষমা দাও, একথা আর কখনও বলব না।" আমি কহিলাম "কৃষ্ণে মতিরস্তু।"

জগতে ভগবানের যে অবতার, তাহা আত্ম-সুখভোগী-জীবহত্যা-কারী-ঘাতক-শ্রেণীর জীবেরা মানে না। কেননা এইরূপ মানিলে, তাহাদের পাপ-বাসনা মিটাইতে যে বাধা পড়িবে। তাহারা যে কাহাকে মানে, তাহা জানা যায় না; মুখে মাত্র ঈশ্বর কহিয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বর-বস্তু যে কেমন, এবং তাঁহাকে পাইলে বা দেখিলে এই মানবের কি অবস্থা হয়, এসব তাহাদের মধ্যে কিছুই দেখা যায় না। শেষ কথা, এইসব জীবকুল ঈশ্বরবহির্মুখী কল্পিত-উপাসক, শান্তির রাজ্যে অশান্তি-উৎপাদক ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেহেতু যাঁহার মনে ভগবানের চিন্তা আছে, তিনি মানুষ কেন সর্ব্বত্র ভগবানের প্রকাশ অনুভব করেন। যাহার মনে ভগবানের চিন্তা নাই, তাহার

ভগবান কোথাও নাই। সরল-বুদ্ধি জীব এই সব ম্লেচ্ছ নাস্তিকদের সঙ্গে থাকিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব ভুলিয়া জীবহত্যাদি কার্য্যকেও মানবের ধর্ম্ম মনে করিতে থাকে। তাহারা বিশ্ব-ব্যাপী জীব দেখাইয়া, জীব না মারিলে জীবের চলে না—ইহার প্রমাণ খুব দেখাইবে, কিন্তু জীবে দয়া যে কেমন ভাবে দেখাইতে হয়, তাহা তাহারা জানে না। ইহার মধ্যে সে বলিবে, জীবেদয়ার মধ্যে, নিজকে নিজের স্ত্রী-পুত্রাদিকে রক্ষা করিতে পারিলে জীবেদয়া দেখান হইবে। আর ওই যে ছুটিয়া পালাইতেছে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য, সেই ছাগ-মহিষ প্রভৃতিকে পাঁচ-জনে ধরিয়া তার গলায় অস্ত্র দাও, উহাতে কোন দোষ নাই। যে এমনভাবে ছাগ-গরু-মহিষ প্রভৃতি না মারিল, তাহারা কাপুরুষ বা নারীজাতির মধ্যে জানিবে। আমরা ছাগ-গরু-মহিষ মেরে এদের মাংস ভোজন করিয়া খুব বলবান হইব, বীর হইব, এই কথা যারা চিন্তা করে, সেই মানুষ-পশুরা ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘোর-নরক-যন্ত্রণা চির-দিনের জন্যই ভোগ করে। সে পশুরা জানেনা যে, মানবের জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত যে ভোজন, তাহাকে ধরিলে সে কিছুই বলিবে না, পলাইবে না, কেননা বিশ্বপতির আদেশে তাহা জীবের ভোজন-রূপে নির্দ্দিষ্ট। যাহা ভোজন নহে, সেই পালাইবে, সে পলাইবার ছলে জীবকে শিক্ষা দেয়,—ভাই! আমি তোর ভোজন নয়, তুই আমাকে মারিস্ না; কিন্তু পাষাণ-হৃদয় রাক্ষস-প্রবৃত্তি মানুষ তাহার সে নিষেধ-চেষ্টা দেখিয়াও দেখে না। যাহারা ঈশ্বর-সৃষ্ট, নিজ ভ্রাতৃতুল্য জীবকে নিষেধ-সত্ত্বেও সংহার করে, ঈশ্বরের জীব বলিয়া ভয় করে না, তাদের তুল্য জীবকে ঈশ্বর কত যে ভালবাসিবেন, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। যে দুষ্ট পুত্র পিতার বস্তু নষ্ট করে, পিতা তাহাকে শাসন করিতে গেলে সে পিতাকে মানে না, পিতার উপদেশও গ্রহণ করে না।

এইহেতু জগৎ-পিতা ভগবান দুষ্টদলন, ধর্ম্মস্থাপন জন্য ধরাতলে ভক্তের আহ্বানে অবতার গ্রহণ করেন; জীবহত্যাকারী মূঢ়-জীবেরা সেই অবতার মানে না। না মান নরকভোগ কর। পিতাকে না মেনে কুপুত্র হও, স্বামীকে না মেনে ব্যভিচারিণী বেশ্যা হও, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, এই না মানার জন্য তোমাকে জগতে ঘোর দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। আজিকার সুখ দেখিয়া তুমি মনে করিতেছ এই সুখ আমার চিরদিন থাকিবে; তাহা তোমার সম্পূর্ণ ভুল নয় কি? বসন্তকালের পর ঘোর আতপ-জ্বালা-দায়ক গ্রীষ্মকাল আসে তা কি তুমি জান না? ধনশালী মানুষ অর্থহীন দরিদ্রকে পীড়ন করিয়া ভৃত্য সাজাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছ, তার করুণ ক্রন্দনে দয়ালু না হইয়া পাষাণের মত তিরস্কার করিতেছ; এই সময়ে তোমার বা তোমার পিতামাতার দরিদ্র-দশার সেই ঘোর যন্ত্রণা চিন্তা করিলে না? কত হা হা করে কেঁদেছে, সে কথা তোমার মনে নাই! ভাব দেখি, এই অপরকে ভৃত্য সাজায়ে নিজে নামমাত্র রাজার তুল্য ভাব দেখায়ে, কৌশলক্রমে ধন-সঞ্চয়ের ভবিষ্যৎ ফল কি! ফল ঘোর-যন্ত্রণা-নরক মাত্র। যা সাজাচ্ছ তাই সাজিবে, যা করূচ তাই করিবে। যেমন দুঃখ দিচ্ছ, তেমনি দুঃখ পাইবে। যাকে কাঁদাচ্ছ সে আবার তোমাকে তেমনি কাঁদাইবে। ইহাতে কোন অন্যথা নাই। আঘাত করিলে, যেমন প্রতিঘাত উঠে, ধ্বনি করিলে যেমন প্রতিধ্বনি হয়, সেইরূপ এই ভব-সমুদ্রে সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে তোমাকে আকুল হইতে হইবে! নিজে আচরণ করিয়া সকলকে যদি সুখের সাজে সাজাতে, আঘাত কবিলে প্রতিঘাত না করিয়া স্থির হইবার উপায় যদি করিতে সকলকে আপন বলিয়া যদি কোলে করিতে, তাহা হইলে সকলেই তোমাকে সুখ দিত, কোলে করিত, দুঃখের নাম মাত্র

জানিতে না। যেহেতু জগতে অপরের আঘাত দিয়া যে সুখ, সেইটি দুঃখের প্রতিঘাতরূপে জানিবে। অর্থাৎ দুঃখ দিয়া সুখী হইলে, দুঃখ সঞ্চয় করা থাকিবে। ধ্বনি প্রতিধ্বনির দৃষ্টান্তে তাহা বুঝিয়া লও।

সুখী করিবার জন্য অপকবুদ্ধি শিষ্যাদিকে শাসন-তিরস্কার সুখী হইবার হেতু জানিবে। দুঃখ পাইবে বলিয়া অপক্কবুদ্ধি শিষ্যাদিকে যাঁহারা শাসন-তিরস্কার না করেন, ভবিষ্যতে তাঁহারা নিজেই দুঃখভোগ করেন। যেহেতু কুশিষ্যাদির দ্বারা গুরুদেবের কলঙ্ক-দুঃখ প্রকাশ হয়। অনুগত-জন ভিন্ন শিষ্য করা বা শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত অনুচিত। বাধ্য করিয়া শিষ্য করা নয়, শিষ্য হওয়া মাত্র জানিবে। যে তোমার সুমধুর উপদেশে-আচরণে দ্রবীভূত-চিত্ত হইয়া তোমার চরণে মন-প্রাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তাহাকে শিষ্য বা শাসনের পাত্র করো, তাহাতে তোমার পরম সুখ লাভের উপায় হইবে। অর্থাদি পাবার জন্য যে তোমার অনুগত, তাহাকে শাসন বা দুঃখদান করিও না; যেহেতু অর্থলুব্ধ ব্যক্তি সময়ে ওই দুঃখ তোমাকে প্রতিদান করিবে। জগতে অর্থের দ্বারা প্রভুত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করিও না। যেহেতু অর্থের দ্বারা প্রভুত্ব লাভ করা, আর জীবহত্যা করিয়া দস্যুত্ব লাভ করা সমান জানিবে। অর্থলুব্ধ পিশাচ-প্রবৃত্তি মনুষ্যেরা কৃষ্ণভক্ত সাধুগণকে উপদেশ দেয়,—সাধুরা বনে থাকে, গায়ে ছাই মাখে, ফল-মূল খায়; তোমরা মানুষের ঘরে আসিয়া ভাল ভাল ভোগ্যবস্তু ভোগ করো, তোমরা আবার কিসের সাধু! সেই মানুষ-পিশাচদের উদ্দেশ্য এই যে এই সব কৃষ্ণভক্তদের উপদেশে অনেকের ধর্ম্মপথে মন যাইবে, আমাদের অর্থ-উপায়-পিশাচ-স্বার্থসিদ্ধির কৌশল মানবেরা বুঝিতে পারিবে, তাহাতে আমাদের আর কেহই মানিবে না, সংসারে থাকা দায় হইবে; এই সব কৃষ্ণভক্তদের মনে ক্রোধ আনয়ন

করিব, যাহাতে ইহারা লোকালয়ে না আসে। কিন্তু এই সব মানুষ-কুকুরদের ডাকে কৃষ্ণভক্ত-রূপ হাতী বিচলিত না হইয়া লোকালয়ে আসিয়া কত কৌশলে যে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করিতেছেন, তাহা মহাত্মা-জনগণই অনুভব করিবেন।

অপরের সুখ দিয়া সুখী হইলে, সুখের প্রতিঘাত উঠিবে; অর্থাৎ সুখ দিয়া সুখী হইলে, সুখের সঞ্চয় থাকিবে। সুখী করিয়া সুখী হইব, ইহাই দুঃখপূর্ণ জগতে সুখী হইবার ও সুখ পাইবার সর্ব্ববাদীসম্মত শ্রেষ্ঠ উপায়। এই সুখী হইবার ও সুখী করিবার উপায় ঈশ্বরভক্ত সাধু ভিন্ন আর কেহই জানে না। যেহেতু কৃষ্ণভক্ত সকলকে কৃষ্ণভক্ত নিজের তুল্য করিয়া সুখী করিতে চেষ্টা করেন, বর্ণাশ্রমের জীব তেমন করিতে সক্ষম নহে। বর্ণাশ্রমের কোন ব্রাহ্মণ অনুগত কোন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রকে ব্রাহ্মণ করিবে না, অথচ তাহাকে ভৃত্য সাজাইয়া নিজের স্বার্থসুখ ভোগ করিবে। অতএব সকলকে এক ও সুখী করিতে কৃষ্ণভক্ত-বৈষ্ণব ভিন্ন আর কেহই নাই। এই জন্য বৈষ্ণবতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবতেজে সর্ব্বতেজ নাশ হয়, ইহা আর্য্যশাস্ত্রে সবিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। বৈষ্ণবীয় অস্ত্র সুদর্শনের তেজে ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসার ব্রহ্মতেজ ধ্বংস, অম্বরীষের চরিত্রে লিখিত, অনেকেই জানে। অতএব হে জীব! বৈষ্ণব পদা-বলম্বী হইয়া জগতে সুখী হও, ও সুখী করিতে চেষ্টা করো। কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবের আর একটি মহান গুণ যে তিনি কাহাকে দাস করিতে ইচ্ছা করেন না। অথচ বিশ্বসংসার আপনা হতেই তাঁহার দাস হইতে ও তাঁহার চরণে মনপ্রাণ বিক্রয় করিতে চেষ্টা করে, এবং করিয়া থাকে। যিনি জগৎকে নিজের তুল্য দেখিতেছেন, তাঁহার এতাদৃশ সৌভাগ্য উদয় নিশ্চয় হইবে।

এখন অবতার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইতেছে। অনেকে বলিতে পারে, স্বয়ং ভগবানের অবতার জগতে হইতে পারে না। আমি বলিলাম—কেন হইতে পারে না? তখন একজন বলিল, ভগবান অযোনি-সম্ভব! অবতার যত, অধিকাংশ যত ভাল ভাল অবতার, যেমন রাম, কৃষ্ণ, এঁরা যোনি-সম্ভব; কেননা কৌশল্যার গর্ভে রাম, দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণ, অতএব এরা ঠিক ভগবান নয়! ভগবানের কিছু তেজমাত্র। আমি দেখিলাম, লোকটি জীব-হত্যাকারীর মধ্যে; শাস্ত্রযুক্তি সে মানে না, ভগবানের নাম-রূপ যে কি, তাঁহাকে ভাবিলে জীবের যে কি হয়, সে সব বিষয়ের কোন খবরই রাখে না। বাহিরের সরল যুক্তি দেখাইয়া আমি বলিলাম, কৌশল্যার বা দেবকীর গর্ভে জন্ম বলিয়া ঠিক ভগবান কেন হইল না? সে বলিল—কৌশল্যা বা দেবকীকে ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে আবার কৌশল্যা বা দেবকী গর্ভে ধরিল; একি সম্ভব হয়! মানুষ যে ভগবানকে সৃষ্টি করে, তাঁকে আবার ভগবান বলে নাকি? ভগবান সর্ব্বশক্তিমান্! ক্ষুদ্রশক্তি-মানুষ তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে পারে না; অতএব রাম বা কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান নন্, ভগবানের সামান্য কিছু তেজমাত্র। আমি হাসিয়া বলিলাম, ওরে মূর্খ! মানবীর গর্ভে যদি ভগবানের কিছু তেজ প্রকাশ হইবার সম্ভব হয়, তবে সর্ব্বতেজ অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান ভগবান মানবীর গর্ভে আসিতে বাধা, এ কোন নির্ব্বোধ বিশ্বাস না করিবে? যে চুল্লীতে (আখা বা উনানে) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থাকে, সেই চুল্লীতে অন্নাদি-পাককারী মানবের সুখদায়ক অগ্নি কেন না থাকিবে? যেহেতু ধারণশক্তি বিশিষ্ট-আধার পরিমাণতুল্য অথবা অল্প আধেয় বস্তু গ্রহণ করিতে সক্ষম,—ইহা বিচার করিলে জানিতে পারিবে। অতএব কৌশল্যা বা দেবকীর

গর্ভে স্বয়ং ভগবান আসিয়াছেন, তুই অন্ধ এই জন্য তাঁহাকে চিনিবার শক্তি তোর নাই। এটা তোর অদৃষ্ট। ভগবান যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ভিতর যদি থাকেন, তবে তাহাতে কি ভগবান ছোট হন্? মানুষ সুখে থাকিবার জন্য গৃহ প্রস্তুত করিল, গৃহে বাস করিতে লাগিল, ইহাতে মানুষের কি লঘুত্ব প্রকাশ পাইল। সেইরূপ ভগবান মা যশোদাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার কোলে পুত্ররূপে শয়ন করাতে ভগবানের গৌরব কি নষ্ট হইয়াছে? তাহা নয়, বরং লীলার জন্য তাঁহার গৌরব সমধিক বাড়িয়াছে! ভগবান অযোনি-সম্ভব সত্য; যোনি-সম্ভবের মত দেখাইলেও তিনি যে অযোনি-সম্ভব ঠিক তাহাই আছেন। গ্রীষ্মের সময় পাখা সঞ্চালনে বায়ুর উৎপত্তি হয়। ইহাতে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ বায়ুর পাখার বাতাস যেমন একটি অপবাদ পড়ে; সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমন্ ভগবান ত্রিতাপজ্বালা-ভোগকারী মানবের সুখ-দানের জন্য, ভক্ত আমার মাতা, পিতা, বন্ধু, ভাই, ভগ্নী ও পত্নী ইত্যাদি অপবাদ গ্রহণ করেন। ইহাতে ভগবানের ভগবত্তার কিছু লাঘব হয় না, যেহেতু ইহার দ্বারা তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, চির প্রেম সুখ-পূর্ণ তাহার বিশেষ প্রকাশ হয়। কেন না সর্ব্বশক্তিমান ত তাঁহাকেই বলে, যিনি ক্ষুদ্র হইয়া ক্ষুদ্রের কাছে, বৃহৎ হইয়া বৃহতের কাছে যাইতে সক্ষম হন। পাখার বাতাস বলিয়া সেই বাতাসকে বাতাস ভিন্ন যেমন আর কিছু বলা যায় না, সেইরূপ বিশ্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান ভগবান ভক্তের ভাবনা-অনুসারে মানবের তুল্য স্বামী পুত্র রূপে অবতীর্ণ হইলেও, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান ভিন্ন তিনি আর কিছুই নন্। মানুষের মত জন্মিয়াছেন, মানুষের মত দেখিতে বলিয়া, তিনি তোমার মত মানুষ নন্। তাঁর কার্য্য আর তোমার কার্য্য আলোচনা করিলে তুমি দেখিবে তিনি মানুষাকারে অমানুষ! পাখার বাতাস বলিতে যেমন কোন

দোষ নাই, সেইরূপ যশোদার ছেলে ভগবান, ইহা বলাতে কোন দোষ নাই। কেননা ওই ভাবের মধ্যে জীবগণ ভগবানকে যে ধরিতে শিখিয়াছে! ভগবান নিজেই যখন যোনি সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং নিজসৃষ্ট-যোনি হইতে তিনি যদি উৎপন্ন হইয়া প্রকাশ হন (পূর্ব্বে মানুষের গৃহনির্ম্মাণ-দৃষ্টান্তের ন্যায়), তবে তাহাতে তিনি যোনিজাত সাধারণ মানুষ নহেন্, অপ্রাকৃত চিন্ময় মানুষ। যাহারা শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় যোনিতে পড়িয়া থাকে, তাহারাই যোনিজাত বলিয়া ভগবানকে মানে না, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ঈশ্বর-ভক্ত শ্রেষ্ঠ-মানবেরা জানেন—ঈশ্বর যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি সর্ব্ব-সময়ে সর্ব্বশক্তিমান্ সুখধাম ভিন্ন আর কিছুই নন্। বৃষ্টিধারা সর্ব্বত্র পতিত হয়, চিরদিনই এইরূপ পড়িবে; কিন্তু তাহা মানবের সর্ব্বসময়ে সুখদায়ক হয় না। এই কারণ মানুষ জল ধরিবার জন্য পুষ্করিণী, পাতকুয়া, কলসী প্রভৃতি আধার করে, তবেই ত সেই জল মানবের নানাভাবে সুখদায়ক হয়। কজন মানুষ বৃষ্টির জলে স্নান করিতেছে, এবং চাতক পাখীর মত ঊর্দ্ধমুখে হা করিয়া জলপান-পূর্ব্বক জীবনধারণ করিতেছে? ধরিতে গেলে কেহই এমনভাবে বৃষ্টির জলে সুখ পায় না। সেইরূপ ওরে মূর্খ-মানুষ! সর্ব্বত্র ভগবানের অবস্থান থাকিলেও বৃষ্টির জল ধরিবার ন্যায়, তাঁহাকে ধরিবার জন্য ভক্তিভাবরূপ আধার করিতে হয়; তবেই তিনি সব সময়ে মানবের সুখ-দাতা হইবেন। এই ভক্তি-ভাব-আধার না করিলে, ঈশ্বর থাকিলেও তাহা মানবের সুখ-দায়ক নয়; অতএব সেরূপ ঈশ্বর থাকাও যা আর না থাকাও তা। যেহেতু জল উঁচু যায়গায় বর্ষণ হয় সত্য, কিন্তু সেখানে থাকে না, সরোবরের তুল্য নীচু স্থানে থাকে। মা যশোদা মাতৃভাবের আধার হইয়াছেন, ভগবান চিরদিন তাঁহার পুত্ররূপে তাঁহাতে আছেন, গোপীগণ পত্নী-

ভাবের আধার হইয়াছেন, ভগবান পতিরূপে তাঁহাদের কাছে সদাই বর্ত্তমান আছেন। এইরূপ সখ্য-ভাব প্রভৃতি জানিবে। মূঢ় মানবেরা এই ভক্তিভাব গ্রহণ না করিয়া, পাষণ্ড-দস্যুরূপে পরিণত ও মানুষাকারে অদ্ভুত পশুর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। বৃষ্টির জল জল, আর নদী-পুষ্করিণী প্রভৃতির জল জল নয়, ইহা কোন্ মূর্খ বলিবে? বিশেষতঃ বৃষ্টিধারার জল অপেক্ষা নদী-পুষ্করিণী প্রভৃতির জল সব সময়ে মানুষের উপকারী ইহা কে না জানে? সেইরূপ বিশ্বব্যাপী, সর্ব্ব-শক্তিমান্ সর্ব্বমুক্ত ভগবান যে ভগবান, ভক্তের ভক্তি-আধারেস্থিত ঠিক সেই ভগবান। যে পরিমাণে জল-পানের পিপাসা, মানব যেমন সেই পরিমাণে সর্ব্বদা জলপূর্ণ সম্মুখের স্থান হইতে জল গ্রহণ করে, সেইরূপ সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ ভগবানকে মানবের যতদূর গ্রহণ করিবার সামর্থ্য, ততদূর ভক্তি-আধারে গ্রহণ করিতেছে। ইহাতে সেই ভগবান ছোট হইল তাহা নহে, তাহাতেই তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। যেহেতু ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন—তাঁহার প্রতি অঙ্গে সর্ব্বেন্দ্রিয় থাকে; অর্থাৎ ভগবান যদি কাহাকে চরণদ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তাহাতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, হস্ত, পদ, মুখ, শিশ্ন, পায়ু, মন প্রভৃতির কার্য্য-সুখ অনুভব হয়; এইরূপ হস্ত প্রভৃতির দ্বারা স্পর্শ করিলে হয় জানিবে। আর এইভাব না থাকিলে সর্ব্বশক্তিমানের কার্য্য জানা যায় না। অতএব ভক্তি-আধারে-স্থিত মানবরূপে পরিণত ভগবান, সেই যে বিশ্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান ভগবান, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। আর একটি কথা এই যে—মানবের দুঃখ নাশ লইয়া কথা; ঈশ্বরকে ভক্তি-আধারে ধরিয়া তাহার দুঃখ-নাশ হইলে সব গোল মিটিয়া যায়; এবং এই ভাবেই ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমানত্ব প্রকাশ পায়। প্রতিবাদী মূর্খ মানুষটী বিনয় করিয়া বলিল "ঠাকুর! এই

ভাবে ভ্রম যেন আমার সব সময়ে দূর হয়।" আমি বলিলাম—দিনরাত কৃষ্ণকরুণানিধির স্মরণ করো। এখন হে তাপিত জীব! যে করুণানিধি ব্রজবাসীজনের মুখ্য চারিটি ভাব-রসে আবদ্ধ হইয়া চিরদিন সচ্চিদানন্দ উপাধিতে ভূষিত, ব্রজভূমির নিত্য-নব-সুখপূর্ণ সেই রসলীলা চিন্তা করিয়া এস আমরাও কৃতার্থ হইতে চেষ্টা করি। শ্রীশ্রীকৃষ্ণকরুণানিধি প্রবন্ধের আদ্যন্ত্য যাহা আলোচ্য, সেই ভক্তি-মধুর ও ভক্তি-মধুপ প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ ছন্দ-বাক্যে বিরচিত হইয়া প্রবন্ধহার চম্পু লক্ষণের উৎকর্ষতা সম্পাদন করুন :—

কৃষ্ণভক্ত মাতাপিতা কৃষ্ণভক্ত প্রাণ।
কৃষ্ণভক্ত বন্ধুভ্রাতা কৃষ্ণভক্ত জ্ঞান॥
কৃষ্ণভক্ত গুরু-দেব-দেবী-ধন-জন।
কৃষ্ণভক্ত বল কৃষ্ণভক্ত প্রাণ-মন॥
কৃষ্ণভক্ত-সহচরী সহ সদা বাস।
জনমে মরণে কৃষ্ণ-ভক্ত-দাস-দাস॥
এইরূপে ব্রজ-পথে পাগল হইয়া।
ভ্রমণ করেন ভক্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
অকস্মাৎ তবে তাঁর দরশন হয়।
ব্রজভূমি-রসময়ী সুখ শুধু রয়॥
সেই নিত্যসুখ কিবা করহে শ্রবণ।
যে সুখ-কণিকা মাগে বিধি-ত্রিলোচন॥
এক অহোরাত্রের সূত্র-অনুসারে।
শ্রীরাধা-নামের বলে লিখিব বিচারে॥
পূর্ব্বাহ্ন সময়ে যে রসের আহবান।
যাহা শুনি সখা-বেশে আসে ভগবান॥

তাহা হইতে আরম্ভিনু ব্রজরস-গান।
যাহা শুনি দ্রবীভূত কঠিন পাষাণ॥
কৃষ্ণভক্তি গান গাব কি তার বিচার।
কৃষ্ণভক্তি-রসে পূর্ণ হউক সংসার॥
ভাবাশুদ্ধি-লৌহে ভক্তি-পরশ-সংযোগ।
কাঞ্চন হইবে জানি, মহান্ সুযোগ॥
কৃষ্ণ বলি আঁখিজল ফেলে একবার।
তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নাশে দুঃখ-ভার॥
নিরন্তর কাঁদে যাঁরা কৃষ্ণের কারণে।
তাঁহাদের কত সুখ কহিব কেমনে॥
ব্রজগোপ-গোপী যত কৃষ্ণের কারণে।
নিরন্তর কাঁদে ভাবে স্বাভাবিক মনে॥
তাই তাঁহাদের কাছে বাঁধা ভগবান।
সেই ব্রজবাসী-ভাব শুনো ভাগ্যবান॥
নন্দীশ্বর গিরিপর অতি সুমোহন।
নন্দালয় মণিময় বেষ্টিত কানন॥
বিচিত্র পাবন সরঃ মণিময় ঘাট।
পুষ্পরেণু-বিভূষিত চারু-ব্রজবাট॥
গোপ-গোপী-ধেনুরবে মুখরিত স্থান।
ওই দেখ পুরদ্বারে কিশোভা বিধান॥
উড়িছে বিচিত্র ধ্বজা পুষ্পমাল্য-গলে।
পত্রপুষ্পবিমণ্ডিত কুম্ভ যার তলে॥
বাজছে মঙ্গলবাদ্য নন্দের নিলয়ে।
কৃষ্ণ যাবে গোচারণে ঘোষে দিকৃচয়ে॥

শিঙ্গা-বেণু রব করে সকল রাখাল।
সজল-নয়নে চেয়ে আছে ধেনুপাল॥
প্রফুল্ল-বদন সব প্রফুল্ল-নয়ন।
গোপবেশ কৈশোর বয়স সুমোহন॥
তিলক-মণ্ডিত চারু সুন্দর কপাল।
সখা জন্যে ছুটাছুটি করে গোলমাল॥
কখন ভিতরে যায় কখন বাহিরে।
এখন এল না বলি সদা ঘুরেফিরে॥
সখ্যরসে তবে সবে করে আহ্বান।
যাহাতে সন্তুষ্ট বিশ্বপতি ভগবান॥

## অথ সখ্য-রস

### থা রাগ

আয় আয় সখা, যাই গোচারণে
যাহাতে পরাণ বাঁচে।
বাঁশীটি বাজায়ে, আয়রে চলিয়ে
যা দেখিয়া মন নাচে॥
দেরী করা নাহি সাজে।
তোর হাসিমুখ, দেখিতে দেখিতে ;
লাগিব আপন কাজে॥
কাজ কিছু নয়, কাজ মাত্র ছল,
কাজ তোর সঙ্গে খেলা।
এই কাজ বিনু তোকে না পাইব
তাই কাজে নাহি হেলা॥

হাসিছে কমল ডাকিছে বিহঙ্গ
ফোটে ফুল নানা জাতি।
দেখিতে দেখিতে, যাব ব্রজপথে,
আয়রে পথের সাথী ॥
নামেতে রাখাল, সাজবিরে তুই
কাজেতে রাখাল মোরা।
বনে তুই রাজা, মোরা তোর প্রজা
আয়রে মাখনচোরা ॥
খেলার পণেতে হারিস যখন
কাঁধে চাপি তোর ভাই।
তুই ত চাপিস, অনেক সময়,
ইথে দোষ কিছু নাই ॥
যদি নাহি যাও, গোচারণে কানু
কেঁদে কেঁদে যাব ঘরে।
তোর চাঁদমুখ, দেখিতে দেখিতে
নিচয় যাইব মরে ॥
গৃহে বসে রাজা, হইতে না চাই,
বিষ-সম সদা লাগে।
তোর সনে ভাই, রাখালিয়া সুখ,
ইহা মন সদা মাগে ॥
ভাল ননী-ছানা ক্ষীর-দধি-সর
মিঠাপান গুয়া ওরে।
নিয়েছি বাঁধিয়া চাখিয়া চাখিয়া
খাওয়াইব সব তোরে ॥

কদম্বের বনে, লুকোচুরি খেলা,
বকের মতন বসি।
হাসাইব তোরে আর কত করি,
আয় ভাই কালশশী ॥
গলা ধরাধরি, আর কোলাকুলি,
ছুটাছুটি দিকচয়ে।
বনমালা গেঁথে, পরাব পরিব,
দাঁড়াব ত্রিভঙ্গ হয়ে ॥
গোপের কামিনী, পথ দিয়া যায়,
দধি বেচিবার তরে।
দেখাইয়া দিব, সাহায্য করিব,
লুঠিও যতন করে ॥
পরি পীতধড়া সুমোহন চূড়া
আয়রে হাসিয়ে ধেয়ে।
পুলিনবিহারী দাস-প্রভু তুই,
কতক্ষণ রব চেয়ে ॥
এইরূপে ভাবমত্ত ডাকিছে রাখাল।
বাহিরিল দ্রুতগতি যশোদাদুলাল ॥
কালোরূপে আলোকরি চলিছে নাচিয়া।
দিবসেতে পূর্ণচন্দ্র এল কি নামিয়া ॥
পিছে চলে বলরাম কাঁধে লয়ে হাল।
ধবল-কনক-তনু লোচন বিশাল ॥
কভু নিমিলিত আঁখি অধরেতে হাসি।
অভিনব দিনমণি উদিত কি আসি ॥

বেড়িল গোপের ছেলে ধেনুপাল ডাকে।
শৃঙ্গ-বেণুরবে সব শব্দকুল ঢাকে॥
যশোদাকে বুঝাইল কেহবা আসিয়া।
কেঁদো না মা শীঘ্র আসি এবোল বলিয়া॥
বল-কানু যায় আর ফিরে ফিরে চায়।
বলে মা কেঁদ না ফিরে আসিব ত্বরায়॥
ব্রজবালা দেখে সব অট্টার উপরে।
ভুবনমোহন যায় গোচারণ তরে॥
এইরূপে চলে সব করে হাঁকাহাঁকি।
উড়িল গোরজ দিল সুখদৃশ্য ঢাকি॥
এক সঙ্গে রবিশশী এ ব্রজ-গগনে।
গোধূলি মেঘেতে ঢাকা পড়িল কেমনে॥
কাঁদিয়া জননী ছুটী ভিতরে চলিল।
কৃষ্ণসখা-কণ্ঠ ধরি কহিতে লাগিল॥

## যথা রাগ

চল চল গোচারণে।
আমার সদাই, মন পড়ে আছে
প্রাণসখা জেনো মনে॥
তোমাদের জন্য, কতই যে ভাবি,
দেরীর কারণ মা।
তোমাদের মত, খেলিবার সাথী,
কোথাও পাইব না॥

আমার আমি ত, তোদের দিয়েছি
তোদের যে কিছু নাই।
সেসব নিয়েছি, সুখ-ব্রজ-লীলা,
ইহাকে ত বলে ভাই॥
আমার হইয়া, গালি দেয় মোরে,
সে আমার প্রাণসম।
আমার না হয়ে, স্তব করে মোরে
আমি তার পক্ষে যম॥
যা দিয়ে সাজাবি, যা দিয়ে ভুলাবি,
তাহাতেই মোর সুখ।
পুলিনবিহারী- দাস-প্রভু কহে,
ভক্তি বিনে শুধু দুখ॥
শুনিয়া গোপাল সব পুলকে মাতিয়া।
কৃষ্ণ মোর সখা মোর বলয়ে নাচিয়া॥
যমুনার সন্নিকট প্রান্তর বিশাল।
গোবর্দ্ধন-গিরিতট সমূহে গোপাল॥
মুঞ্জবন কুঞ্জবন ভাণ্ডীর কানন।
কাম্যবন মধুবন বহুলা-কানন॥
মধুর শ্রীবৃন্দাবন-আদি যত বনে।
রাম-কৃষ্ণ সখা সঙ্গে ভ্রমে গোচারণে॥
নানা বর্ণে কত ফুল সব বনে ফুটে।
সৌরভে উন্মাদ অলি পত্রে বসে ছুটে॥
নাগেশ্বর-চম্পক-মালতী-জুঁইফুল।
বকুল-অশোক-কুন্দ সুগন্ধ অতুল॥

শেফালিকা-গন্ধরাজ সুন্দর গোলাপ।
স্থলপদ্ম-মাধবিকা হরে মনস্তাপ ॥
নিখিল সুন্দর পুষ্প নাম কব কত।
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বনে ফুটে বহু শত ॥
মঞ্জরী-মণ্ডিতা নব তুলসীর বন।
ব্রজবনে সর্ব্বত্র যে হরে নেত্র-মন ॥
পনস-রসাল-বিল্ব-লেবু-রম্ভা-তাল।
দ্রাক্ষা-দাড়িম্বাদি-পিলু-জম্বীর বিশাল ॥
বারো মাস দেয় ফল সে স্থানের গুণে।
কন্দমূল নানাবিধ নাম কেবা গুনে ॥
নানা ফল নানা মূল নানা ফুল দিয়া।
ব্রজভূমি কৃষ্ণসেবা করে হর্ষ-হিয়া ॥
হেররে ভাবুক তুমি ভাবের নয়নে।
কি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য ব্রজবনে ॥
বিমল সরসীকুল স্থানে স্থানে রয়।
কমল-কুমুদ হাসে সকল সময় ॥
মণিময় ঘাটে কেলী-কদম্বনিকর।
বেড়িয়াছে কুঞ্জসহ সব সরোবর ॥
মীন-মরালাদি জলচর জীবচয়।
খেলে তাহে সবাকার প্রফুল্ল হৃদয় ॥
ভ্রমর-গুঞ্জন আর কোকিলের গান।
সদাই শুনিয়া সবে জুড়ায় পরাণ ॥
ব্রজ-বনদেবী শ্রীকৃষ্ণের সুখ তরে।
রেখেছে সকল দ্রব্য অতি সমাদরে ॥

শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া গিরিবর-নেত্রে ধারা।
নির্ঝর রূপেতে বহে হয়ে আত্মহারা॥
সে চরণ ধোয়াইতে যমুনা সাদরে।
তরঙ্গ-সুন্দর-কর সুবিস্তার করে॥
বনস্পতিকুল দিয়া পুষ্প উপহার।
নত-শাখে অভ্যর্থনা করে চমৎকার॥
মধুপতি বনে এল দুন্দভি-গভীরে।
সিংহ জানাইল নাদে কানন-বাসীরে॥
মৃগ-মৃগী ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করে।
শুক-সারি বন্দী-গীত গায় মধুস্বরে॥
লতাকুল পুষ্প-লাজ করে বরষণ।
শাখা-ব্যজনীতে করে চামর-ব্যজন॥
বাদক ভ্রমর তুলিয়াছে বীণা-তান।
গায়ক কোকিল পক্ষিসহ গাহে গান॥
মাধবীর গন্ধদ্রব্য দেয় সমীরণ।
দেখি সখা সহ কৃষ্ণ পুলকিত মন॥
কহেন এ বন-শ্রী যার অঙ্কগত।
সখাগণ তারা শ্রেষ্ঠ রাজা সুসম্মত॥
বনে থাকে দুষ্ট পাপী দলনের তরে।
মোর ভক্ত নৃপ যায় গ্রামের ভিতরে॥
আত্ম-সুখে ভোগী করে দরিদ্র-পীড়ন।
তারা দস্যু রাজা হয় নরকভাজন॥
এইরূপে কহে কথা করে গোচারণ।
কখন তমাল-কান্তি করেন বর্ণন॥

কস্তুরিকা মৃগনাভি ভাণ্ডার খুলিয়া।
নিকুঞ্জ হইতে কৃষ্ণে দেখে লুকাইয়া॥
ভাগ্যবতী পুলিন্দীরা নিজ-কর্ম্ম ভুলি'।
সে রূপমাধুরি দেখে ফুল্ল-মুখ তুলি॥
সুভূষিত নিকুঞ্জ-মণ্ডপ মণিঘর।
কুণ্ডতীরে স্থানে স্থানে শোভিছে সুন্দর॥
হিংসাদ্বেষহীন পশু মাঝে ধর্ম্মজ্ঞান।
ব্রজধামে বিরাজিত দেখ বিদ্যমান॥
হেন ব্রজে সখা সহ নিত্য গোচারণ।
ইচ্ছামত সখ্যরস করে সম্পাদন॥
এদিকে শ্রীরাধা-কুঞ্জে সখিগণ সহ।
মধুর মূর্ত্তির জাগে মধুর বিরহ॥
গোচারণকাল হইতে এ বিরহ হয়।
পূর্ব্বরাগ হইতে বরণিব সে বিষয়॥
সংক্ষেপে কহিব শাখাচন্দ্র ন্যায় প্রায়।
মধুর ভক্তের মর্ম্ম যাহে জীব পায়॥
কোন সখী শ্রীকৃষ্ণের রূপ গোচারণ।
নব-অনুরাগিণীরে করায় শ্রবণ॥
তাহা হইতে সূত্র করি বর্ণিব সকল॥
রসিক ভাবুক দেখো অতীব বিমল॥
বসন-ভূষণ-হীনা উন্মাদিনী প্রায়।
দেখি সখী প্রিয়-গীত প্রিয়াকে শুনায়॥

## অথ মধুর রস

### যথা রাগ

কঞ্জ-লোচন লোল, তনু নীল-কমল,
কঞ্জ-মুখে মধুহাস।
কমল-করপুটে, মুরলী সুধারণ,
কটিতটে পীতবাস॥
কানু কি সুখের নিধি।
তাপিত-জন-মন স্মৃতি-সুখ-সায়র,
বিরচিল কোন বিধি॥
সুকোমল কুটিল, অলকা-অলিদল,
চুম্বিত-কোমল-গণ্ড।
ব্রজ-কামিনীকুল, মন-বশীকরণ
উত্তোলিত ভুজ-দণ্ড॥
কৈশোর-সুচপল, শ্রীচরণ-চপল,
চপল-নূপুর-সঙ্গ।
চপল গোপ-বাল, সঙ্গহি-বিচলন,
মূর্ত্তি মোহন-ত্রিভঙ্গ।
কত শারদ-চাঁদ নখ-চাঁদে ক্ষরিত
চারু-তিলক-ললাট।
গোপ-যুবতীজন, নয়ন-সুঅঞ্জন
ভঞ্জন লজ্জা-কবাট॥

নিবিড়-কুঞ্জকুল- কেলী-কোবিদ-বর,
শিখি-পিঞ্ছ-চূড়াধারী।
সুচঞ্চল কুণ্ডল- কপোল-বিমণ্ডিত
বনমালা মনোহারী॥
রতন মণিগণ- কনক-আভরণ-
ভূষিত শ্যামল অঙ্গ।
শ্রীপুলিনবিহারী- দাস-প্রভু সুন্দর
জীবন-মরণ সঙ্গ॥
পুলকিতা বিনোদিনী হাসি পুনঃ কয়।
কি কহিলে আরো কহো শুনি সমুদয়॥
শুনিতে বড়ই সাধ কহো পুনর্ব্বার।
শুনি সখী কহে পুনঃ রূপের বিচার॥

যথা রাগ

কালো বরণে কে ভুবন উজোর গো,
স্বরূপ কার পদে লুটে।
কার বেণুগানে, ভুবন পাগলগো
কার গুণে বন্ধন ছুটে॥
নন্দ-নন্দন মনোহারী।
গোপিকা-চকোরী- শারদ-সুধাকর,
সুন্দর-বরবপু-ধারী॥
ক্ষীণ-কটিতটে, পীত-ধটি আটাগো
কিবা সে বিজুরী-সুভাস।
চঞ্চল-কুটিল- লোচন-রক্তিম গো
চাঁদবদনে সুধা-হাস॥

নিরঞ্জন-কেলী- কদম্ব-বন-প্রিয়,
ললাটে সুতিলক-রেখা।
কুসুম-ভূষণে, সদাই ভূষিতগো,
কালিন্দীকূল পর দেখা ॥
অলক-কলাপে অলিকুল-সংলাপ
পরিমল-গৌরব-অন্ধ।
কুটিল কটাক্ষ দূতী পটু চালক,
নাশক লোক-লাজ-বন্ধ ॥
মুক্তা-মণিমাল- জটিত-প্রবাল গো,
গুঞ্জা-ধবল অবতংস।
বদর-কপোল- চুম্বন-মকরন্দ
ধ্যান করে মধুপবংশ ॥
কিশোর-বয়স, নব-সুখ-দায়ক,
ময়ুর-পাখা চূড়া সাজে।
সরোজ-চরণে, নুপুর-রাজহংস,
মধুর-সুমধুর গাজে ॥
নীলিম শরীর, সুচন্দন-লেপন
নিখিল-ভুবন-আনন্দ।
পুলিনবিহারী- দাস-প্রভু-সুন্দর,
সবহু সুখ-সার কন্দ ॥

শুনিয়া সখীর বাণী ভরিল লোচন।
ঢর ঢর আঁখিজল করয়ে মোচন ॥
সখিকণ্ঠ আলিঙ্গিয়া কহিছে শ্রীরাধা।
যা শুনিয়া দূরীভূত হয় ভব-বাধা ॥

## যথা রাগ

যখন দেখেছি, আপন নয়নে,
কালার বচন-চাঁদে।
গুরু গুরু হিয়া, আপনা আপনি,
সেই হতে প্রাণ কাঁদে॥
( সই ) বল না করিব কি।
শ্যাম দরশন, বিনা প্রাণ মোর
আকুল করিব কি॥
শয়নে স্বপনে, গমনে ভোজনে
কানুর স্মিরিতি জাগে।
সে মধুর হাসি, অধরেতে বাঁশী
দেখিতে বাসনা মাগে॥
কিবা শুভক্ষণে, দেখিনু তাঁহারে,
কেনবা হইল দেখা।
দেখিয়া অবধি, লাগিল এ মনে,
পাষাণে যেমন রেখা॥
বহুরূপ দেখি, জগতের মাঝে,
কভু না পরাণ কাঁদে।
কালরূপ দেখে, প্রাণ কেন কাঁদে,
পড়িয়া পিরিতি ফাঁদে॥
শ্যাম দরশন বিনু এ ভূষণে,
ভীষণ যন্ত্রণা পাই।
লোক-অপবাদ, ভূষণ পরেছি,
ভূষণ ত্যজেছি তাই॥

অবলা সরলা, কুলবতী বালা,
কি উপায়ে তাঁরে পাবে।
নতুবা তোমরা, থাকিতে সজনি,
কেঁদে কি এ প্রাণ যাবে॥
সুবল শ্রীদাম, সে মধুমঙ্গল
তাঁদের সমান বিধি।
করিত আমায়, যাইতাম বনে,
হেরিতাম গুণনিধি॥
কানুকে মিলাও, ভূষণে সাজাও
তবে পাবে সব সুখ।
নহে ভিখারিণী, রহিবে রাধিকা
সখিহে না করো দুখ॥
শ্যামের বিরহে ভূষণ পরিয়া
যে ধনি পুলকে রয়।
পুলিনবিহারী- দাস-প্রভু তার
মিলিতে কঠিন হয়॥
কৃষ্ণ মোর হবে ইহা মনেতে জানিয়া।
পুনর্ব্বার কহে ধনি আকুল হইয়া॥

## যথা রাগ

তাঁর সে মধুর হাসি তাঁর সেই বাণী।
তাঁর সে চলনভঙ্গী মোর হেতু মানী॥
তাঁর সে নয়ন-ভঙ্গী আমারে যে চায়।
মোর তরে কাঁদিয়ে সে আমারে কাঁদায়॥

কালীয়-দমন পরদিনের ঘটনা।
যে হইল শুনে সই করো বিবেচনা॥
সবার পিছনে ধরি সুবলের গলা।
মোর গৃহ-পানে চেয়ে আসে সেই কালা॥
যখন দেখিলা মোরে অট্টার উপরে।
"ওই বলে" কেঁদে মূর্চ্ছা সখা স্কন্ধ পরে॥
কাঁদিয়া সুবল মোরে সঙ্কেত যে করি।
লয়ে গেল নন্দালয়ে সখাকেগো ধরি॥
হায় কি পাষাণী কেন তখন না গেনু।
তা দেখিয়া কোন্ প্রাণে ফিরে ঘরে এনু॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সই শুতিলু শয়নে।
তাঁর মধুর মূরতি দেখিরে স্বপনে॥
শিয়রে বসিয়া আঁখিজল সে মুছায়।
কেঁদ না বলিয়া মুখ চুম্বে শ্যামরায়॥
মদন-পুলকে মোর ভাঙিল স্বপন।
আর না দেখিতে পেনু সে চাঁদবদন॥
তোমরা মরমসখি করো কোন বিধি।
পেয়ে পুনঃ হারাইনু কানু-গুণনিধি॥
মিলন-নিরাশে মৃত্যু-আশা উঠে চিতে।
সেই মুখ মনে পড়ে, না পারি মরিতে॥
মরি যদি এই দেহ দেখাইবি তাঁরে।
জন্মান্তরে এই দেহ দান-অঙ্গীকারে॥
এশুভ-মিলন সুখলাগি অনুরাগে।
পুলিনবিহারী দাস-প্রভু সদা জাগে॥

এইরূপে মধুর রসের আহ্বান।
শুনিয়া করুণানিধি আকুল পরাণ॥
সুবলের কণ্ঠ ধরি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
সুবল মরম কহি করয়ে আশ্বাস॥
গোচারণ ভার অন্য সখাপর দিয়া।
কভু রহে অন্তরালে যুকতি লইয়া॥
শ্রীরাধার প্রিয় নর্ম্ম-সখী যত জন।
সবে মিলনের হেতু করে অন্বেষণ॥
প্রথম মিলন মাত্র হয় যে নিশায়।
তৎসহ নৈশ-বিলাস কহি সূত্র প্রায়॥
দিবস-মিলন-আদি বিবিধ বিলাস।
অন্যান্য রসিকজন করিল প্রকাশ॥
আমি মাত্র চারি রস-স্ফূর্ত্তির কারণ।
সূত্রাকারে করে যাই দিগ্‌দরশন॥
মধুর রসের সহ শুভ-সম্মিলন।
নিশিতে ভাবুক করিবেক দরশন॥
বাৎসল্য রস মূরতি দিন শেষ-ভাগে।
সুখময়-ব্রজমাঝে যেই ভাবে জাগে॥
সেই সুরস মূরতি কর দরশন।
মাতৃরূপা যশোদার স্নেহ সম্বোধন॥

## অথ বাৎসল্য-রস

কোন বনে গেলি অবসান বেলি,
এখন এলি না ঘরে।
আয়রে গোপাল, আয়রে দুলাল,
মন যে কেমন করে॥
তুইরে নয়নমণি।
হয়ে আছি অন্ধ, ও বাপ গোবিন্দ,
তো বিহনে যাদুমণি॥
হইলে সকাল, লইয়া গোপাল
সখাসঙ্গে গেলি বনে।
ক্ষুধা কি পিয়াস, লাগে নাই তোর
মোর কথা নাহি মনে॥
যতনে রেখেছি, ক্ষীর-সর-ননী
পথ-পানে আছি চেয়ে।
তোর মা মা বুলি, শুনিতে আকুলী
আয়রে আয়রে ধেয়ে॥
নুপুর-রণিত, কোমল চরণ
কঠিন কাননভূমি।
গোচারণ হেতু, বেদনা লেগেছে
ক্রোধে কি এস না তুমি॥

বলি তোর বাপে, আর সেই গোঠে,
যাইতে দেব না মুই।
চাঁদপারা বধূ, বিয়ে দিব তোরে
ঘরেতে থাকিস তুই॥
বাপরে ওকৃষ্ণ, বাপরে ওকৃষ্ণ,
বাপরে ওকৃষ্ণ মোর।
ধৈরয ধরিতে, নাহি পারি আর,
না দেখে বদন তোর॥
ওই পাখী সব, করি কলরব,
ধরিছে বাসার কোণা।
মানের মাণিক, আয়রে আমার,
আয়রে কালিয়া সোনা॥
ত্রিভঙ্গিম ঠামে বামেতে হেলিয়া
মুখেতে মধুর হাসি।
বাঁশীটি বাজায়ে আয়রে চলিয়ে
আসিছে আঁধাররাশি॥
প্রখর রবির কিরণ লাগিয়া
শুকায়েছে ফুল-মুখ।
ননী খাওয়ায়ে সরস করিব
তবেত পাইব সুখ॥
কাঙালিনী মাকে, দুখ কেন দিস্,
পরের ছেলের ধারা।
এদাস পুলিন- বিহারী হে প্রভু,
তো বিহনে গৃহ-কারা॥

অপরাহ্নে যশোদার বাৎসল্যের ধ্বনি।
শুনিয়া আকুল প্রাণে আসে যাদুমনি॥
সঙ্গে সখা ধেনুদল আর বলরাম।
মা এসেছি বলে ছুটে আসে সুখধাম॥
মা কহেন কেঁদে কেঁদে নিষ্ঠুরের মত।
ভুলে কেন থাক বাপ দেরী দেখ কত॥
শুনিয়া করুণানিধি কণ্ঠ জড়াইয়া।
কহেন মধুর বাণী মধুর হাসিয়া॥

যথা রাগ

সময়ে এসেছি, দেখগো জননি,
গোচারণ হ'তে গেহে।
তোর ঠাকুরের, কৃপাতে জননি,
দুখ নাহি পাই দেহে॥
বনে সুখ ক'ব কত।
তোমার ভয়েতে, দেখেছে সকলে
প্রাণের প্রাণের মত॥
শ্রীদাম সুদাম, দাদা বলরাম,
প্রাণের সুবল মোর।
কত যত্ন করে, বলিতে না পারি,
মাথার দিব্যগো তোর॥
তোর মুখ মনে, পড়য়ে যখন
তখন বিমনা হই।
শতেক যতনে, ভুলায় তাহারা
জানে নাগো আমা বই॥

কত ভাল সখা, মিলেছে আমার
তবু তোরে নাহি ভুলি।
পুলিনবিহারী, দাস-প্রভু কহে,
নে মা মোরে কোলে তুলি॥

শুনি কোলে লয় মাতা শ্রীমুখ চরণ।
আঁচলে মুছায় আর করয়ে চুম্বন॥
আরতি করিয়া রাণী কৃষ্ণে লয় ঘরে।
সমাদরে সখাদের বিদায় যে করে॥
স্নানাদি করায়ে কৃষ্ণে করায় ভোজন।
হারা-রত্ন-প্রাপ্ত-সুখ, দরিদ্রে যেমন॥
রতন-পালঙ্কে কৃষ্ণ করেন শয়ন।
এই কালে দাস্যরস করে আগমন॥
রক্তক নামেতে ভৃত্য নন্দপুরে হয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবা করে এ সময়॥
পদ-সম্বাহন করে ভাসে অশ্রুজলে।
পদ চুম্বে হৃদি ধরে আর এই বলে॥

## অথ দাস্য-রস

### যথা রাগ

মতি থাকে তুয়া চরণে।
হৃদিমাঝে ধরি, ওপদ সেবিব
রেখোহে চরণ-শরণে॥

জনমে জনমে, ইহাই বাসনা
শুনো হে করুণানিধি।
ওরূপ দেখিব চরণ সেবিব
এমন করিবে বিধি॥
কত যে সুন্দর, এ চারু-চরণ
কেবা সে বলিতে পারে।
যে চরণ-রজ, ব্রহ্মা-শিব-আদি,
সহজে লভিতে নারে॥
শ্রীলক্ষ্মীর সদা, সেব্য যে পদ,
ভাগ্যেতে পেয়েছি আমি।
এ চরণ-সেবা সদাই আমায়
দিও হে গোকুলস্বামী॥
কত সুধা দ্বারা, রচিত চরণ,
চাঁদ-সুধা কাঁহা লাগে।
পুলিনবিহারী- দাস-প্রভু-পদ
পায় যত মহাভাগে॥

এইরূপে রক্তকাদি দাস্য-রসগণ।
মনানন্দে সেবা করে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
যোগনিদ্রা-ছল যবে করে প্রদর্শন।
ভৃত্য-বর্গ বাহিরেতে করেন গমন॥
এই অবসরে যথা মধুর-মূরতি।
যাইতে করুণানিধি করেন যুকতি॥
হিতৈষিণী বেণুবালা সঙ্গেতে লইয়া।
সঙ্কেত-নিকুঞ্জে যায় আকুল হইয়া॥

পূর্ব্বরাগ হইতে বরণিব এ বিষয়।
শ্রীরাধামিলন-হেতু যে রহস্য হয়॥
শ্রীরাধার প্রিয়-সখী আসি কোন জন।
সঙ্কেত-নিলয়ে কহে মরম-বচন॥

যথা রাগ

শুনহে করুণানিধি।
তোমার বিহনে, ব্যাকুলা অবলা,
করিবে হে কোন বিধি॥
লোক-অপবাদ. ভূষণ এখন
ভূষণবিহীন দেহ।
আপন বলিয়া, হৃদয়ে ধরিতে,
তোমা বিনে নাহি কেহ॥
ভূষণ ত্যজিয়া, গঞ্জনা-ভূষণ,
সাধ করে দেহে ধরে।
তোমার প্রণয়, ত্যজিতে কহিলে,
নয়নেতে ধারা ঝরে॥
হেন অনুরাগ, কোথা নাহি শুনি,
ভুবনে এমন কে।
তোমার বারতা, ভাবিতে ভাবিতে
পাগল হইল সে॥
কখন হাসয়ে, কখন কাঁদয়ে
কখন মুদিয়া আঁখি।
যোগিনীর পারা, বসিয়া ভাবয়ে
তোমারে নলিন-আঁখি॥

কখন কাঁপয়ে, তনুলতা তার,
কখন নিচল হয়।
ভূতে পাইয়াছে, কেহ কেহ কহে,
ঔষধি বাঁধিতে কয়॥
তোমার প্রসাদী, তাম্বুল চর্ব্বণ,
কেহ কেহ দিতে বলে।
কালিয়া নাগর, বৈদ্য এ রোগের
কেহ বা কহয়ে ছলে॥
তোমার কাহিনী, শুনিতে তাঁহার
দিবানিশি ক্ষণ-প্রায়।
তোমার বারতা, সদাই রটিতে,
বিরক্তি নাহিক তায়॥
প্রিয়-সখী-সঙ্গে, তোমার মিলন
যুকতি সদাই করে।
বুঝি গুণ-ধাম, করো বিবেচনা,
নতুবা বুঝিহে মরে॥
তুমি বিদগধ, সুচতুর শ্যাম,
তোমার অসাধ্য নাই।
পুলিনবিহারী দাস-প্রভু তুমি,
দেখে যেন সুখ পাই॥
শুনিয়া সখীর বাণী ভরিল লোচন।
সখী-হস্ত ধরি শ্যাম কহেন তখন॥

যথা রাগ

কি আর কহিব, তোমারে সজনি,
মরম-বারতা মোর।
নয়ন-বাণেতে, বিঁধিয়া রেখেছে
কিশোরী-নায়িকা তোর॥
কি আছে আমার কাছে।
আমার যা কিছু, তখন দিয়েছি,
সেই দেখিবার পাছে॥
যখন শুনেছি, সুবলের কাছে,
তার সুধা-রাধানাম।
ওই নাম দীক্ষা, হইল জানিয়া,
জপিতেছি অবিরাম॥
সিনান ঘাটেতে, সখীর সহিত,
এলায়ে কেশের ভার।
নীল সাটি দিয়া, কাঁচা সোনা জিনি,
দেহ ঢেকে যায় তার॥
আমারে দেখিয়া, মধুর চাহিয়া,
হাসিয়া বদন ঢাকে।
আর অকারণ, সে বুক ঢাকিতে,
বুঝিনু এ প্রাণ রাখে॥
এমন করিয়া, পরাণ হরিয়া
কঠিনীর মত সে।
নত-মুখে গেল, ফিরিয়া না দেখে,
পিছনে কাঁদিছে কে॥

সুচারু লোচনে, বিলোল-চাহনী,
অধরে ঈষৎ হাসি।
সে চারু-চলন, অঙ্গের দোলন
কেবল সুষমারাশি॥
কনক-কঙ্কন, মুকতার-হার
আর ভূষণাদি-সঙ্গে।
মোর প্রতি অঙ্গ, দাস হতে চায়
তাহার প্রত্যেক অঙ্গে॥
নুপুর-গঞ্জিত সে রাঙ্গা-চরণ
অঙ্গ-পরিমলে তার।
পাগল হইনু, মরমে পশিল
ভুলিতে না পারি আর॥
বুক দিয়া যদি, প্রাণ দিতে চায়,
এখনি যাইব আমি।
পুলিনবিহারী- দাস তাহা জানে,
যাও সখি সেথা তুমি॥
ব্রজদেবী-মণি হেথা বড়ই আকুল।
নয়নের জলে ভাসে অঙ্গের দুকুল॥
প্রাণসমা সখী এক আকুল হইয়া।
শ্রীরাধাকে কোলে করি কহেন কাঁদিয়া॥

যথা রাগ

(রাধে!) এ প্রেম নহেত ভালো।
কালার পীরিতি, ভাবিতে ভাবিতে
কনক-শরীর কালো॥

ভূষণ ত্যজিলি, ভোজন ত্যজিলি,
প্রাণ শুধু দেহে আছে।
কালা কালা করি, ইহা কি ত্যজিবি
না রবি মোদের কাছে॥
দুখের সাগরে, প্রেমের মাণিক
সহজে পায় বা কে।
ধৈরয ধরিয়া, কলঙ্কের ঢেউ
বুকেতে সহিবে যে॥
বহুজন-পতি, শ্যাম-বঁধুবর
বহু প্রতি তাঁর আশ।
তুই মোর বলি, তাঁর সুখ লাগি,
তোর বড় বিশোয়াস॥
সে তাহা বোঝে না, সকল রাখিয়া
রাখিতে আসিবে তোরে।
কমল ছাড়িয়া, ভ্রমর যেমন
ভ্রময়ে কুন্দের ঠোরে॥
কাঁদিতে আরম্ভ হয়েছে এখন
আর বা কাঁদিবি কত।
এ প্রেমের মাঝে, যতই কাঁদিবি
হাসিটি পাইবি তত॥
আসিবে নিশ্চয়, ইহা আমি জানি
সেও তোর তরে কাঁদে।
পূর্ণ-সুখ তার, এইখানে বাঁধা
তোমার পীরিতি-ফাঁদে॥

লোক-অপবাদ, গুরু-গনজন
ইহাতে সদাই ভয়।
পুলিনবিহারী- দাস-প্রভু মিলে
ধৈরয ধরিতে হয় ॥

এই ভাবে প্রিয় সখী প্রিয়াকে বুঝায়।
হেনকালে কৃষ্ণ-দূতী আইল তথায় ॥
আকারেতে কার্য্যসিদ্ধি বুঝিলেন মনে।
সেই সখী কহে তবে মধুর বচনে ॥

যথা রাগ

চামরিম-কেশিনী, চপলিম-হাসিনী,
চলো অভিসার-সাজে।
রতি-রস-রসিকে, মনো-সুখদায়িকে,
সঙ্কেত-বাঁশরী বাজে ॥
নীরবে-নিঝুমে কিয়ে মনোরমে
মলয়-সেবিতা রাতি।
চেয়ে পথপানে, মধু-নিধুবনে
আসে সে খেলার সাথী ॥ ধ্রু।
নিদ্রিত দূরজন, নির্ঝরধারা-রব,
কোকিল-প্রহরী জাগে।
মদন-মন্ত্র-গান, ভৃঙ্গ কুসুম-বুকে,
গাহে দেখো অনুরাগে ॥

চলোলো বররামা, ক্ষণপ্রভা সুষমা
চঞ্চল চরণগতি।
চন্দ্র চারু-বদনে, সুচকিত নয়নে,
যথা তব প্রাণ-পতি॥
চলো রাস-রঙ্গিনী, মদন-কুরঙ্গিনী,
প্রাণের সঙ্গিনী রাধে।
খঞ্জন-সুলোচনে, অঞ্জন-সুশোভনে,
শ্রীকৃষ্ণ তোমারে সাধে॥
লজ্জা-নাশকারক, হর্ষ-শুভ-জ্ঞাপক,
বক্ষবাস দূর করে।
কঞ্জ-লোচন বাম, বাম বাহুমূল তব,
নাচিছে পুলক-ভরে॥
তব নব-যৌবন, সফল করো বালা,
চলো বিলাস-নিকুঞ্জে।
গজ-গতি-গামিনী, গজমোতি-ধারিণী,
যথা মধুকর গুঞ্জে॥
হৃদয়-সরোবরে, উন্মাদ-বঁধু-বরে,
গজেন্দ্র কেলী-কদম্বে।
সুবাসিত চর্ব্বিত, তাম্বুল দিও বালা
চাপিয়া চারু-নিতম্বে॥
সুন্দরি সুধামুখি, ভাল করে বিরচিবি,
সুন্দর-তিলক-রেখা।
সুন্দর কালশশী, হেরিবে মধু-হাসি
সম্মোহন-বাণ লেখা॥

নব-প্রীতির নীরব ভাষা
রসিক বুঝিয়া লয়।
দাস পুলিন- বিহারী-প্রভু,
বুঝে করো যাহা হয়॥
সঁপিয়া শ্যামের করে প্রাণের রাধারে।
সুচতুরা সখি গেল বাহির দুয়ারে॥
রবহীনা কীর্ত্তিদা-নন্দিনী বক্ষে ধরি।
মুখ চুম্বি গণ্ডে গণ্ড দিয়া কহে হরি॥

## যথারাগ

নীরবে কেন শ্রীরাধে! কহো কহো কথা।
স্বপন-সুখ জাগিয়া করগো সর্ব্বথা॥
বাঁশরী সেধেছে শুধু তোর নাম সাধা।
শয়নে-স্বপনে-জাগরণে দেখি রাধা॥
তোমার কারণে রাধে ফিরি বনে বনে।
যে হেতু ভিখারী আমি পাইনু সে ধনে॥
বৈকুণ্ঠ-আদির সুখ দূরে পরিহরি।
রাধা-হেতু রাখাল-বেশেতে আমি হরি॥
গোপীকুলমণি তোরে পাইবার তরে।
গোপীভাবে গোপবেশ নিয়াছি সাদরে॥
রাধারত্ন লাভ হল এ ভব-সাগরে।
যাহতে সচ্চিদানন্দ নাম নর-ঘরে॥
মুই তোর তুই মোর ইহা দোঁহে জানি।
নিত্য নব ভাব হেতু পর-বধূ মানি॥

দেহ অধর-সুধা তৃষিত আমারে।
নিজগুণে লহো কিনে নিজের সখারে ॥
কেঁদেছ যাহার লাগি পথ-পানে চেয়ে।
তারে কিছু কহো রাধে নিকটেতে পেয়ে ॥
একটু হাসিয়া কহ মোর দাস বুলি।
সুখ-সিন্ধুতে ডুবিব সব দুঃখ ভুলি ॥
অলক্ত-লেপিত-পদ নখ-ইন্দু তব।
মম হৃদয়-গগনে হউক সম্ভব ॥
দাস পুলিনবিহারী প্রভু জাগে।
নিশিদিন রাধা-কৃপা হেতু অনুরাগে ॥

এ বোল শুনিয়া কথা না কহিয়া,
জড়ায়ে ধরিল গলা।
নাগরের বুকে বদন রাখিয়া
কাঁদিছে কি জানি ছলা ॥
রসিক বুঝয়ে, রসিকার ভাব
নাগর রসিক বটে।
কি জানি কি ভাবে, সে বদন তুলি,
চুম্বে ঘন অকপটে ॥
নাগরী-নয়নে, বারিধারা বহে,
অথচ ঈষদ্ হাসি।
উরসে করিয়া, নাগর শুতিল,
সুখের সাগরে ভাসি ॥
নাগরের বুকে, নাগরী শুতিল,
নয়ন মুদিয়া রহে।

এইরূপে মহা- স্থখ-সিন্ধু-স্রোত,
বৃন্দাবন-ব্যাপি বহে ॥
শ্রীরূপ-অনঙ্গ শ্রীপ্রেম-মঞ্জরী
আদি যত সখিগণ।
হেরয়ে নিকুঞ্জে, এই স্থখ-লীলা
স্থখ পায় অনুক্ষণ ॥
ভ্রমর-কোকিল- শুক-সারিকুল
গাহে রাধা-কৃষ্ণ জয়।
যাহার ভাবনে, সব স্থখ মিলে,
ভব বন্ধ পায় ক্ষয় ॥

এইভাবে অভিসার এমন মিলন।
যোগমায়া দ্বারা সব হয় সম্পাদন ॥
নিত্য নব স্থখ-লীলা সখিগণ সঙ্গে।
শ্রীরাধা-গোবিন্দ মোর করে কত রঙ্গে ॥
যে হেরেছে সে ডুবেছে এ স্থখ-সাগরে।
শোক-দুঃখ-জরা তারে পরশিতে নারে ॥
মধুর যুগলরূপ বসি কুঞ্জবনে।
কোন নিশি কহে কথা প্রফুল্ল-বদনে ॥
সেই সব স্থখ কথা করিব বর্ণন।
রাধাকৃষ্ণ-গত-প্রাণ করহ শ্রবণ ॥
কানু কহে আমি কালো গৌরাঙ্গী স্থন্দরী।
কেন মোরে প্রেম করে দিবস-শর্ব্বরী ॥
শুনি বৃষভানু-স্থতা কহে মধুস্বরে।
প্রেম-স্থধাকর হতে স্থধাধারা ক্ষরে ॥

যথারাগ

কালো নীলাকাশ-বুকে রবি-শশী-তারা হাসে
কালো কুঞ্জে তুমি কালোশশী।
কালো যমুনার জলে, কমল-কুমুদ খেলে
কালো কেশ সুষমার রাশি ॥
কালোর পীরিতি ভাল লাগে।
কালোর মাঝারে কত সুখদাতা আছে শত
বুঝিবে সে যত মহাভাগে ॥
কালো রজনীর বুকে, শ্রান্ত জীব মহাসুখে
কালো-নিদ্রা-অঙ্কগত হয়।
নয়ন মুদিলে কালো, কত সুখ সুধা ঢালে
সুখ-স্বপ্ন সুচিন্তা উদয় ॥
কালো-আকর মাঝারে, কত মণিমুক্তা হীরে
কালো-সিন্ধু সুষমার খনি।
কালো কুঞ্জে হাসে ফুল, কালো সে পাদপকুল
দেয় ফল কালো নেত্রে মণি ॥
কালো নীরধর বুকে, দামিনী হাসয়ে সুখে
ঢালে সুখ বরিষার ধারা।
কালো অন্ধকার ঘরে, প্রদীপ মহিমা ক্ষরে,
বুঝি কালো রূপ তুলে সারা ॥
আলোতে একটি আলো, চাঁদ কত তারা আলো
কালো নিশি মাঝে দেখো রয়।
চারু-রূপ সম্মিলনে কালোরূপ-সমুদ্ভব
কালো দেখে সব দেখা হয় ॥

দূরেতে দেখিত কালো, নিকটেতে সব আলো
কালো রূপ মাঝে আমি পাই।
পুলিনবিহারী দাস- মনোমোহন হে প্রভু,
দিবানিশি কালো গুণ গাই ॥
বলিতে বলিতে বালা হইয়া আকুল।
প্রিয়কণ্ঠ আলিঙ্গিয়া কহে সুমঙ্গল ॥

যথারাগ

দিন কি এমন আবে।
তোমার বদন দেখিতে দেখিতে
জীবন আমার যাবে ॥
তোমায় না দেখি, শতেক বরষ,
বাঁচিয়া কেবল দুখ।
তোমায় দেখিয়া, একদিন বাঁচি
কোটি বরষের সুখ ॥
এমন চিকন- কালো তুমি বঁধু,
এমন চিকন-কালো।
মনে হয় কালো রূপ মাঝে যদি,
ডুবে থাকি হয় ভালো ॥
কিবা মধু দিয়ে কালো-রূপ-গুণ
গড়িল সে কোন বিধি।
তুমি কালো বিনু, সুখ দিতে মোর
কেহ নাহি গুণনিধি ॥

মরম-বেদনা পরাণ বঁধুয়া,
তোমারে বলিব কি।
এইরূপ-বিনু, কিছু মোর ভালো,
লাগে না করিব কি॥
দেখিতে দেখিতে, তুয়া কালো রূপ
ঐছন সুন্দরময়।
হিয়-হার করি গলায় ধরিয়া
সোয়াস্তি নাহিক হয়॥
মেঘ-নভ-জল. শ্যাম তরুদল,
দেখি তুয়া পড়ে মনে।
গুরু গুরু হিয়া, নয়নেতে জল,
বহে মোর সেই-ক্ষণে॥
কেন হেন হয়, না জানি বঁধুয়া
কি গুণ করেছ মোয়।
যদি তাই করো, ভুলো না আমায়,
শপথি দিলাম তোয়॥
তব রূপ-গুণ, ভাবিতে ভাবিতে,
অধিক পাই যে সুখ।
মূঢ় লোক কেন তেমন ভাবে না
ওইত আমার দুখ॥
নিজ গুণে যদি, ভুলাইলে মোরে
নিজ-গুণে দিও দেখা।
পুলিনবিহারী দাস-প্রভু তুমি
দাও দান-পত্র লেখা॥

শুনিয়া করুণানিধি আকুল পরাণ।
কহিছে সাদরে চুম্বি সে চারু বয়ান ॥

যথারাগ

লিখে দিনু তব চরণে।
তোমার ভিখারী, ও শ্রীপদে স্থান,
দিও গো সকল জীবনে ॥
এইরূপ প্রীতি, করিবে কি সদা
বল বল চাঁদ-বদনে।
এইরূপ হাসি, দেখাবে কি মোরে
রাখিবে কি সুখ-সদনে ॥
তোমাকে কি গুণে, কিনিব বা আমি
কিনেছ নিজের সুগুণে।
যত কিছু বলি, প্রেমের বচন
তোমার নিকট গো শুনে ॥
তুমি মোর তরে, কাঁদিয়া শিখাও
তোমার কান্না গো কাঁদিতে।
মোর তরে ধ্যান ধরিয়া শিখাও
তোমার ধেয়ান ধরিতে ॥
তোমার নয়ন আমারে শিখায়
নয়নের ভঙ্গী করিতে।
মোর পদসেবা করিয়া শিখাও
তব পদসেবা ধরিতে ॥

মোর নাম ধরে ডাকিয়া শিখাও
তব নাম ধরে ডাকিতে।
তব চারু বুকে স্থান দিয়া মোরে
শিখাও বুকেতে রাখিতে ॥
মোর তরে তুমি সকল ত্যজিয়া
শিখালে ভিখারী সাজিতে।
তোমার ভিতরে আমারে হারাব
তোমারে ভাবিতে ভাবিতে ॥
মোর সুখরূপা তুমি এ সংসারে
যাহা ভাব সুখ দানিতে।
তাহাই প্রকাশ করিয়া দেখাই,
নিজে ওই সুখ পাইতে ॥
তুমি ও যে আমি, আমিও সে তুমি
জানিবে সকল সংসারে।
পুলিনবিহারী- দাস-প্রভু কহে,
লীলা হেতু দুই আকারে ॥
শুনি প্রেমময়ী কহে অতীব উচ্ছ্বাস।
লোচনে প্রেমাশ্রু বহে শুনে পীতবাস ॥

## যথারাগ

(বঁধু) কি জানি করম লেখা।
হেন দরশনে ঘটে যদি বাঁধা,
ভুলে কি দিবে হে দেখা ॥

যেদিন শুনেছি, আপন শ্রবণে,
তোমার মোহন বাঁশী।
সেই দিন হতে, দরশন আশে
হয়েছি তোমার দাসী॥
দেখিতে নয়নে, যে সুখ লাগয়ে,
তাহার অবধি নাই।
কি বিয়াধি হল, দরশ-লালসে,
চমকি চমকি চাই॥
দেখিতে দেখিতে, বাড়িল পিপাসা
অধিক বাসনা উঠে।
এ হেন বেশেতে, দেখিব তোমায়
এ বাসনা নাহি ছুটে॥
অতীব সাধের, দরশন-সুখ,
নাহি যদি জাগরণে।
সদাই সাধিব, স্বপন-কামনা,
দেখা দিও সে স্বপনে॥
ভিতর-বাহির যাই আর আসি
পথ দেখে হই সারা।
আমার যা কিছু, সুখের সকল
তোমাতে হয়েছি হারা॥
উজোর রজনী, নিখিল ধরণী
নীরব বিজন শান্ত।
পাতার পতনে, নেহারী চকিত,
আসিছে বলিয়া কান্ত॥

নিবিড় আঁধার, বরষার রাতি
হরষিত হয় হিয়া।
ঝটিকা বহনে, কবাট নড়নে
আগত বলিয়া পিয়া ॥
মলয় চালনে, কোকিল-বোলনে,
হাসয়ে ফুলের কুঞ্জ।
লুকাইয়া আছে, সখা ওইখানে,
মনে উঠে সুখপুঞ্জ ॥
ও দুটী নয়নে এ-দুটী নয়ন
মিলনে যায় হে দুখ।
পুলিনবিহারী- দাস-প্রভু-পাশে
মাগে সদা এই সুখ ॥

দুঁহু প্রেমমত্ত দুঁহু নবীন-কিশোর।
দুঁহু চাঁদ দুঁহু তাহে পিয়াসী চকোর ॥
বুকে বুকে মুখে মুখে ঘন-আলিঙ্গনে।
অঙ্গ অঙ্গ মিলাইয়া শোয় দুঁহুজনে ॥
যামিনীর শেষভাগে বিরহ-প্রকাশ।
মানসে দোঁহার রূপ দোঁহার বিকাশ ॥
কোন দিন প্রিয়া-কুঞ্জে প্রিয়-সহচরী।
কানুর সোহাগ পুছে মনে মোদভরী ॥
শুনি হাসি বিনোদিনী রসের উদ্গার।
করয়ে সখির পাশ পুলক অপার ॥

## যথারাগ

বলিতে না পারি সখি কানুর পীরিতি।
নারী ভুলাইতে নাহি তা সম রীতি ॥
কতই সোহাগ করি হৃদি-মাঝে রাখে।
চন্দন হই যদি বুকে-মুখে মাখে ॥
হৃদয়ে রাখিয়া মোরে তৃপ্তি নাহি পায়।
কোথায় রাখিব বলি কাঁদে আর চায় ॥
স্বহস্তে তুলিয়া ফুল মালাটি গাঁথিয়া।
সাজায় আমারে পিয়া হাসিয়া হাসিয়া ॥
ফুল দিয়া গাঁথে বেণী কতই যতনে।
ললাটে তিলক রচে চুম্বয়ে সঘনে ॥
চর্ব্বিত তাম্বুল মোর কাড়িয়া যে খায়।
দাসী হয়ে সরস আলতা লেপে পায় ॥
সাজায় অশেষ সাজে শেজ বিছাইয়া।
শোয়ায় আমারে পিয়া কোলেতে করিয়া ॥
নারী হয়ে ঘোমটাতে ঢাকি নিজ মুখ।
শোয় মোর বামভাগে কি কব কৌতুক ॥
সাগরলহরীসম প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
কানুর সোহাগ স্মৃতি উঠে মোর মনে ॥
কখন আসিবে পিয়া আমার কুটীরে।
কখন ভাসাবে মোরে সে সোহাগনীরে ॥
কখন দেখিব আমি সে চাঁদবদন।
যুগসম এ বিচ্ছেদে হয় প্রতিক্ষণ ॥

যেথায় রয়েছে কানু সে করুণানিধি।
উড়ি যাইতাম যদি পাখা দিত বিধি॥
কেবা না করয়ে প্রেম সে কানুর সনে।
কানুকলঙ্কিনী রাধা একই ভুবনে॥
ভনয়ে পুলিনবিহারী প্রভু-দাসে।
কানু বাঁধা চিরদিন তব প্রেম-পাশে॥
ভরিল লোচনে অশ্রু উন্মাদিনী-প্রায়।
সখীকণ্ঠ আলিঙ্গিয়া মধু হাসি গায়॥

যথারাগ

কেন দিনরাতি, তোমার মূরতি
আমার মরমে জাগে।
কি মোহিনী যাদু শিখিয়াছ তুমি,
কহ না আমার আগে॥
তাই বুঝি চিরসাথী।
এমন করিয়া গোপনে গোপনে
খাও মোর কুলজাতি॥
ভাবিতে চাহি না তোমার ভাবনা
ভাবিতে কেন বা দাও।
দেখিতে পাই না, তব অঙ্গ-গন্ধে
আমাকে কেন মাতাও॥
আবদ্ধ দুয়ারে ঘরের ভিতরে
যখন নিদ্রায় থাকি।

কবাট না খুলে লহো কোলে তুলে
জলেতে ভরাও আঁখি ॥
স্বপনের ঘোরে সোহাগে বাঁধিয়া
স্বপনের ঘোরে যাও।
কতই যে কাঁদি জাগিয়া না দেখে
তখন ফিরে না চাও ॥

গুপত-বেকত প্রেমের নাটুয়া,
হাসান কাঁদান-কামী।
পুলিনবিহারী- দাস-প্রভু তুমি,
তোমারে চিনেছি আমি ॥

শুনি প্রেমময়ী-বাণী ফেলি আঁখিজল।
সখী কহে শুধু তোর চরণ সম্বল ॥
জনমে জনমে এই চরণেতে দাসী।
করো প্রেমদেবী মন এই অভিলাষী ॥
এই ভাবে সখী সঙ্গে প্রিয়ের সংবাদে।
বিচ্ছেদ-সময় সতী যাপে মন সাধে ॥
এদিকে শ্রীবৃন্দারণ্যে গোচরণকাল।
রাধাভাব-মত্ত-মন মদন-গোপাল ॥
বাঁশরী বাজাব গিয়া নিকুঞ্জ-সদনে।
এই ছলে গিয়া কহে বেণুকে যতনে ॥

## যথারাগ

গাওরে ও মুরলীকে, তুলিয়া মধুর তানে।
ভুবন মাতিয়া যাক্ সুধা-রাধানাম-গানে ॥

যমুনা উজানবহ প্রেমময়ী-গীত শুনে।
তরু-লতা-পশু-পাখী জাগুক নামের গুণে॥
রাধা বিনে মরুভূমি সকল ভুবন তিনে।
তাই রাধা ধ্যানধরি নিরজনে নিশি-দিনে॥
মন রাধা প্রাণ রাধা রাধা নাম জপে গানে।
রাধা সুখের আগার অন্যে মন নাহি মানে॥
রাধা যদি নাহি ভুলে বাঁশী তোর গান-বলে।
নিচয় ভাঙ্গিয়া তবে ফেলিব যমুনা-জলে॥
সকল হউক রাধা মিলে থাকি প্রাণে প্রাণে।
আমার সকল কথা আমি জানি রাধা জানে॥
রাধা রাধা রাধা রাধা রাধা নাম-সুধা গাবে।
পুলিনবিহারী-দাস-প্রভু ভাব পাছে যাবে॥
এই ভাবে রাধাবেশে মুরলী বাজায়।
যমুনা উজান উঠে চরণ ধোয়ায়॥
প্রফুল্লিত তরুলতা ধেনু বৎস সব।
নয়নে প্রেমাশ্রু ঝরে শুনে বেণুরব॥
এদিকে গোপিকামণি নির্জ্জন কুটীরে।
ভাবিছে পিয়ার কথা কহিছে অধীরে॥

## যথারাগ

একলাটী ঘরে রহেছি শয়নে,
সঙ্গে আর কেহ নাই।
মোর প্রিয় তুমি রহেছ কোথায়
এস দেখে সুখ পাই॥

দেবো হে তোমারে সুখ।
তোমার পরাণে পরাণ মিলায়ে
বেঁটে নেবো সব দুখ॥
নয়নে নয়নে হাসিয়া হাসিয়া
যা কহেছ মনে আছে।
এস এ সময় সকল তা দিব,
যা আছে আমার কাছে॥
হৃদয়-পালঙ্কে শোয়াব তোমারে
আঁচলে মুছাব মুখ।
সহস্তে তোমার চরণ চাপিব,
ঘুচাব শ্রমের দুখ॥
সদা সঙ্গে থেকে সুখ দিতে চাই,
সময় নাহিত মেলে।
পুলিনবিহারী- দাস-প্রভু তুমি,
পাইবে এখন এলে॥

সখিগণ আসি হেরে উন্মাদিনী পারা।
উর্দ্ধদৃষ্টি হয়ে হাসে গোপী সারাৎসারা॥
দেখা পাবে দুইজন বলিয়া সাদরে।
শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ দেয় ভোজনের তরে॥
এইভাবে দিনগত রজনী উদয়।
সঙ্কেত-সময় লাগি ব্যাকুল হৃদয়॥
কোন দিন সঙ্কেত-নিকুঞ্জে অগ্রে গিয়া।
কহিতেছে শশীমুখী প্রিয় না দেখিয়া॥

## যথারাগ

চাঁদিনী রাতি কুসুম পাঁতি
ভাতিয়া মধুর হাসে।
মধুর গন্ধে অন্ধ ভ্রমর
লুটে পড়ে ফুলপাশে॥
সে কোথা আমার জাগে।
মোর নাম ধরে বাঁশী যে বাজায়
না ঘুমায় অনুরাগে॥
সাধের শয্যা যাহার লাগি
সাজাইনু ফুল দিয়া।
তাম্বুল সেজে, মালাটি গেঁথে
রেখেছি সাজাতে পিয়া॥
এমন কালে নটন-তালে
আসে যদি মোর সে।
সুখী করিয়া সুখী হইব
সে সুখ বুঝিবে কে॥
দূর কোকিল, দূর পাপিয়া,
দূর চকোর-স্বর।
পিয়া বিহনে তোদের বুলি
নহে মোর সুখকর॥
আমি শুনাব মোহন স্বর
আসুক আমার পিয়া।
দাস পুলিন- বিহারী প্রভু
বিনু জলে মোর হিয়া॥

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি আসি এ সময়।
প্রেম-প্রতিমাকে হাসি বক্ষে করি লয়॥
সে মিলন-সুখ কেবা বলিবারে পারে।
জড় প্রায় ভাবুক হেরুক দোঁহাকারে॥
কোন দিন কৃষ্ণপক্ষ নিশির মিলন।
অন্ধকার হেরি রাই বিচলিত মন॥
কেমনে আসিবে নাথ এ ঘোর আঁধারে।
কহিছে ভাসিছে সতী নয়ন-আসারে॥

যথারাগ

এ ঘোর আঁধার ঢাকিল সংসার
ঢাকে নাই শুধু তারা।
পথেতে পথিক না পারে চলিতে
অজানা সে পথহারা॥
কেমনে আসিবে তুমি।
কেমনে চলিবে কোমল চরণে
কঠিন কাঁকর-ভূমি॥
আমি ত কঠিন কঠিন এ পথে
চলিতে ভাল হে জানি।
তোমার নির্দ্দিষ্ট ঘরেতে বসেছি
ভাল মন্দ নাহি মানি॥
যদি এ পৃথিবী হইতাম আমি
বুকেতে চলিতে সুখে।
তাহা না হইনু সুখ দিতে এসে
তোমারে ফেলিনু দুখে॥

এখন উপায় এই মাত্র শুধু
যদি না চলিতে পার।
সঙ্কেত করিবে হৃদয়ে ধরিয়া
আনিব হে সুখাধার॥
কেমনে আসিবে, না এলে বাঁচি না
দুই দিক ভেবে মরি।
পুলিনবিহারী- দাস প্রভু তুমি
আসিও বিচার ধরি॥

রাধানাম-দীপ জ্বলে বদন-দুয়ারে।
অন্ধকার আর বল কি করিতে পারে॥
পথশ্রমে পিপাসিত-জনে দয়া করি।
দেহ গো অধরসুধা গোকুল-ঈশ্বরি॥
বলিয়া চুম্বিল মুখ নাগর আসিয়া।
চরণ নিরখে রাই মণি-দীপ নিয়া॥
সখিগণ আসি বসাইল দুই জনে।
বিবিধ-ভোগ্য-সুগন্ধ ভুঞ্জায় যতনে॥
নৃত্য গীত সবে মিলি করি কতক্ষণ।
নিকুঞ্জে কুসুম-সেজে করিল শয়ন॥
এই ভাবে নিত্যলীলা প্রতিদিন হয়।
যা ভাবিলে যা দেখিলে সর্ব্ব সুখোদয়॥
কোন দিন মেঘাচ্ছন্ন প্রাবৃট-সময়।
চিন্তে প্রেমময়ী অতি আকুল হৃদয়॥
দেখিল ভিজিছে প্রিয় গোচারণ-পথে।
ছুটিয়া লইব গিয়া এ হৃদয়-রথে॥

যাইতে না পারে লোকলজ্জার কারণ।
দূরে দেখে কাঁদে আর করে সম্বোধন॥

## যথারাগ

মেঘের ডাকেতে পরাণ কাঁপিছে
পড়িছে করকা-বৃষ্টি।
দামিনী-দমকে পবন বহিছে
জলে ভরে সব সৃষ্টি॥
কেন বা ভিজিছ বাটে।
তোমার কারণে আছি দাঁড়াইয়া
কত দুখে দিন কাটে॥
কেন যাও তুমি ও দুখের স্থানে
গোঠে বনে ঘাটে মাঠে।
এস তুমি এস, চরণ মুছায়ে
বসাব সুখের খাটে॥
কাদা কীচ লেগে ও রাঙ্গা চরণ
খুব ত মলিন হবে।
মাতোয়ারা প্রায় যদি যাও চলে
দেখিবে বেদনা রবে॥
বনপ্রিয় তুমি এতই হে যদি
হৃদি-কুঞ্জবনে রও।
পুলিনবিহারী- দাস প্রভু তুমি
কেন হেন দুখ সও॥

মেঘাচ্ছন্ন জলধারা পড়ে অনিবার।
কোথা গেল প্রাণনাথ যশোদাকুমার॥
আকুল হইয়া রাই বনপথে চায়।
অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ পায়॥
পশ্চাতে চাহিয়া দেখে আছে দাঁড়াইয়া।
নয়ন-মন-মোহন হাসিমুখ নিয়া॥
কেমনে আসিলে বলি নিজের আঁচলে।
চরণ মুছায় আর ভাসে প্রেম-জলে॥
নাগর চুম্বিল মুখ হাসি হাসি কয়।
মেঘের কারণে আজ এ মিলন হয়॥
প্রতিদিন ব্রজপথে যাবার সময়।
প্রেমময়ী দেখি কহে আকুল-হৃদয়॥

যথারাগ

আকাশের চাঁদ আকাশে ত থাকে,
ভাগ্যগুণে নেমে আসে।
যদি নেমে আসে, কে না বলো তারে
না রাখে হৃদয়াকাশে॥
কেন হে কঠিন পথে।
কেবা সে কঠিন, যাইতে দিয়েছে
না চাপায়ে হৃদিরথে॥
সুকোমল তুমি কমল-চরণ
সুকোমল স্থানে থাক।
সূরযের তাপে বদন শুকাবে,
যেও না মিনতি রাখ॥

যাব না বলিলে, কে যাইতে দেয়,
তুমি ত তেমন নও।
নিজে দুখ পাবে, মোরে দুখ দিবে,
কথাটি কিছু না কও॥
পরের মতন ঘরের মানুষ,
না দেখ পিছনভাগে।
বিদেশীর মত, কেন যাও চলে,
মনে বড় দুখ লাগে॥
একান্ত যাইবে, কথা না রাখিবে,
শুনো হে প্রাণের প্রাণ।
শুকাইবে মুখ, লুকাইয়া এসো,
খাওয়াব মাখন-পান॥
মরম বুঝিয়া সুখ দিতে পারে
জগতে কজন আছে।
পুলিনবিহারী- দাস প্রভু তুমি,
জানিবে সকল পাছে॥

বাহুদ্বারা সুবলের কণ্ঠ আলিঙ্গিয়া।
কি কহিল শ্রীরাধাকে সঙ্কেত করিয়া॥
গৃহমধ্যে সুবদনী করিল গমন।
সখাসঙ্গে কানু বনে পশিল তখন॥
প্রতিদিন অপরাহ্নে চাহি পথপানে।
কাঁদি কহে প্রেমমণি আকুল পরাণে॥

যথারাগ

যেই পথে গেলে, সেই পথপানে,
বারবার দেখি চেয়ে।
কত যুগ ধরি করিবে গো দেরী,
কখন আসিবে ধেয়ে॥
পাতিয়া রেখেছি কাণে।
এস কালোরূপে আলো করা চাঁদ,
শুনায়ে মুরলীতানে॥
কত নরনারী কত পশুপাখী,
গেল আর এল ঘরে।
দেখিবার তুমি, কেন নাহি এস,
তেমন বেশটী ধরে॥
ফুলের রচিত, পাগটি মাথায়,
গলে বনফুলমালা।
বিজলী সুহাসি, গোধূলিভূষিত,
বরণ চিকণকালা॥
আসিবে আঁধার, জ্বলিবে প্রদীপ,
বহিছে সন্ধ্যার বায়ু।
সোনার পাটেতে বসি সূর্য্যদেব,
গণিছে জীবের আয়ু॥
সময় থাকিতে, এস গুণনিধি,
পথ চলা হবে দায়।
আগমন-ধ্বনি, বাজিয়া উঠুক,
বাঁচুক যে মৃতপ্রায়॥

তোমার কারণে, কাঁদিছে যে জন,
এসে তারে দাও সুখ।
পুলিনবিহারী- দাস-প্রভু তুমি,
কখন দেখিব মুখ ॥

তারপর আসে কানু চারু-গোপবেশে।
হেরিয়া বদন সতী মত্ত সুখাবেশে ॥
নিশিতে সঙ্কেত স্থানে করিয়া গমন।
প্রিয়-সঙ্গে মিলি বাঞ্ছা করেন পূরণ ॥
কোন দিন যোগমায়া সহায় করিয়া।
গন্ধর্ব্ব বালার বেশ নাগর ধরিয়া ॥
রাধা-সখিবৃন্দ-সহ মিলিত হইল।
শ্রীরাধার সখী হ'ব আশা জানাইল ॥
কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব শিখি এই বড় আশ।
শুনি সখিগণ তারে নিল প্রিয়াপাশ ॥
প্রেমময়ী দেখি কৃষ্ণ-প্রেম-পিপাসিনী।
আলিঙ্গন করি বসাইল সুহাসিনী ॥
নবসখী নাম দিয়া প্রেম-বার্ত্তা কহে।
প্রেম-তরঙ্গিনী হ'তে প্রেম-স্রোত বহে ॥

যথারাগ

প্রেমের আকার অতীব মোহন,
প্রেম সব সুখধাম।
প্রেম প্রাপ্তি হলে সব প্রাপ্তি হয়,
নিত্যসুখ যার নাম ॥

নির্গুণ প্রেম যে হয়।
সত্ত্বগুণ হতে সেই প্রেম আসে,
জীবে দয়া যাহে রয়॥
গুণের মানুষ দেখিয়া যেজন,
গুণেতে মজিয়া কাঁদে।
নিরবধি যদি কাঁদে সেইজন,
সে পড়ে প্রেমের ফাঁদে॥
প্রেম বা পীরিতি একই ভারতী,
ভাবুক সকলে গায়।
প্রেম বা পীরিতি যাহাতে উদয়,
সে মোর কানুকে পায়॥
রাজসিক কাঁদে রাজসিক প্রেমে,
তামসিক তমগুণে।
সাত্ত্বিক দেখিয়া যে জন কাঁদিবে,
সে জিনে ভুবন তিনে॥
সত্ত্বগুণধাম মোর প্রাণনাথ,
তাঁর গুণে মজে কাঁদ।
পুলিনবিহারী- দাস-প্রভু সেই,
জগৎ আনন্দ ফাঁদ॥

শুনি নবসখী কহে মধুর বচন।
বহুজন-পতি কানু দেখি সর্ব্বক্ষণ॥
তাহাতে এ প্রেম রাখ কেমন করিয়া।
শুনি প্রেমময়ী কহে মধুর হাসিয়া॥

যথারাগ

বহু নদীসঙ্গমে সাগর কি ক্ষুবধ,
হিম ধারণে হিমবান।
বরষা জলধর জলধারা বহনে,
ঐছন পিয়া গুণবান॥
বহুবল্লভ হয় সে।
তথাপি মোর গণি, গরবে গরবিণী,
হিয়-মরমে মোর সে॥
আমার পিয়কে যে সুখ দেয় প্রিয় সে,
আমি তার দাসী সম।
আমার প্রিয় লাগি জগৎ কাঁদুক গো,
তবে আশা পূরে মম॥
করি যে অভিমান, পিয়-মন জানিতে,
নাহিত সপত্নী-ক্রোধ।
জানিয়া সুখ দিতে চাহি আমি সদা গো,
নিজ-সুখ নাহি বোধ॥
দুর্জ্জয় মান মোর, ইহার কারণে গো,
প্রকৃত প্রেম-স্বভাব।
যাহাতে মান নাই, তাহা ত প্রেম নহে,
শুধু প্রিয়-সুখ ভাব॥
সুখ নিতে কাঁদে সে, সুখ দিতে কাঁদি আমি,
এ জনম সুখ দিতে।
তাঁর ভাবনা ভেবে, ভুলিনু সকল গো,
আর নাহি কিছু চিতে॥

সুখ দিতে রৈঠিনু    সুখভোগী কাঁহা সো
ভাবিয়া সব আঁধার।
নারী-যৌবন-ধন    বিফলে গেল গো
কাঁহা কানু গুণাধার॥
জগতের বল্লভ,    হউক নারায়ণ
রটে লক্ষ্মী সহ নাম।
বহু গোপী হইলে,    কহত রাধাকৃষ্ণ
দেখ সব বিশ্বধাম॥
প্রতি মরমে মোর    কানুর প্রকাশ গো
দেখ না আঁখি ভরিয়া।
শ্রীপুলিনবিহারী    দাস-প্রভু বিহনে.
সদাই জলে মোর হিয়া॥

কহিতে কহিতে দেহ শিথিল হইল।
সজল নয়নে রাই শয্যাতে শুতিল॥
দেখিয়া করুণানিধি হইয়া আকুল।
শ্রীরাধাকে বক্ষে ধরি কান্দে প্রেমাকুল
চিনিল তখন প্রিয়া আপন পিয়ারে।
"এ ছলনা কেন" বলি সমাদর করে॥
সখিগণ জানি আসি হাসি কত কয়।
প্রণয়ের তিরস্কার যত মধুময়॥
সম্ভাষিয়া সখীজনে মধুর বচনে।
শুতিল প্রিয়ার সহ নিকুঞ্জ ভবনে॥

এই ভাবে কত লীলা সুখের সদন।
ভাবনেত্রে ভাবুক করুক দরশন ॥
পূর্ণিমা রজনী মাঝে নিশীথ মিলন।
প্রিয়-নর্ম্ম কোন সখী করিছে বর্ণন ॥

## যথারাগ

নিরমল নিবিড় নিকুঞ্জে নদীতটে
পীত-পট-বঙ্কিম-অঙ্গ।
অধর-সুধারসে মুরলী মুখরিত
রাগরাগিণীকুল-সঙ্গ ॥
রাধাপতি রমে যামিনী।
আলিঙ্গন চুম্বন, সুললিত গমন
সঙ্গ-গোপকুল-কামিনী ॥
লোল-লোচনাম্বুজ, রক্তিম সুকপোল
যুগল-মিলন-সুরঙ্গ।
চকোর-সদালাপে, বিলাপে শশধর
নিরখি স্বগৌরব ভঙ্গ ॥
শ্যামলিম সুন্দর কৈশোর-কলেবর
চিরসুখ বিলাসকুঞ্জ।
ফুলমালিকাকারে জানু-গল-চুম্বিত
সুমালতী-মল্লিকা-পুঞ্জ ॥

সুন্দরী রামা-প্রতি কুটিল-দৃষ্টি-পটু,
বদন-বিমণ্ডিত-হাস্য।
সুচন্দন-তিলক- বিন্দু-সহ শোভিত,
ভুবন-বিমোহন আস্য॥
ব্রজ-বধূটী-নীল অম্বর-আবরিত,
আধ-শিখি-চন্দ্রকগুচ্ছ।
নীরদ-আবরিত, আধ-সুরেশ-ধনু
মানয়ে আপনাকে তুচ্ছ॥
কৌস্তুভ-মণিগণ আভরণ-রঞ্জিত
হৃদয় নীলাকাশ-গণ্য।
রসবতী-সরস- পীন-উরস-গিরি
পরশত অতীব ধন্য॥
নব-নীল বসনে আবৃত-নীল-বপু,
নায়িকাপৃষ্ঠ-অবলম্ব।
সহচরী-মানসে বিঘটন-সন্দেহ,
পটু-রাস-কেলী-কদম্ব॥
মঞ্জু-মঞ্জীর-রব, কোকনদ-রক্তিম
শরনদ-চরণ রম্য।
শ্রীপুলিন-বিহারী- দাস-প্রভু-সুন্দর
সুধী ভকত-জন-গম্য॥

মধুর বসন্তে ফল্গু মহোৎসব ক্ষণে।
অন্য যুথেশ্বরীসহ প্রিয় হৃষ্টমনে॥
হোরীলীলা-মত্ত দেখি রাধা-সহচরী।
বসন্তবিরহ গাহে সেই শুভকরী॥

## বসন্তরাগ

কিশলয়-বকুল, কঞ্জ-চূত-মুকুল,
পরিমল-সৌরভ-প্রান্ত।
কোকিল অলিদল গাওত অবিরল,
বসন্তে কমনীয় কান্ত॥
হেম-জ্যোতি-উর্ম্মি-কালিন্দী-কুলান্ত।
নবীন-ঘনদেহ, আবীর বিরঞ্জিত,
বসন্তে কমনীয় কান্ত॥
পুষ্প-রোষ-লোচনে অশোক কিংশুকহি
বিশাসিত শীত দুর্দ্দান্ত।
মাধবী-পরিমলে পুলকিত-অন্তর,
বসন্তে কমনীয় কান্ত॥
নব-বরণ তরু, পল্লব করপুটে
ধৃত-নব-লতিকা ক্লান্ত।
বিরহিনী বিধুরা ধ্যায়ত-অনুক্ষণ,
বসন্তে কমনীয় কান্ত॥
মনোভব-রক্তিম লোচন-সম-জ্ঞান
প্রভাত-নিশি-মুখ-ভ্রান্ত।
সুচকিতা শয়নে শোচত বর-বধূ
বসন্তে কমনীয় কান্ত॥
করুণ-পুষ্পবালা, সৌরভ-নববয়-
জ্ঞাপক মলয়-দিগন্ত।
অলি-পতি-বিচ্ছেদে ধরণী বিলুণ্ঠিত
বসন্তে কমনীয় কান্ত॥

মন্দার সোঁদালিয়া, সুমন-সু-আননে,
বিকশিত হাস্য অশান্ত।
গলিত-পত্র-বাস- ত্যক্ত-কানন-সতী,
বসন্তে কমনীয় কান্ত
শষ্প-রোমাঞ্চ-ধরা পীত-কাঁচলী-রূপে,
সর্ষপ-প্রসূন-ফুটন্ত।
লাজহীনা-সজিনা ফুল চুম্বে উরস
বসন্তে কমনীয় কান্ত॥
ফুল্লিত সুরভিত, বল্লরী-বিদোলিত,
কুঞ্জ মধুপ-সমাক্রান্ত।
প্রেমাশ্রু-মধুধারা বর্ষিত বন-রামা
বসন্তে কমনীয় কান্ত॥
শীত যমুনা-জল, সিঞ্চিত শ্যামদেহ,
বসন্ত-মহোৎসব-শ্রান্ত।
শ্রীপুলিন-বিহারী দাস-প্রভু-সুন্দর
বসন্তে কমনীয় কান্ত॥

বিরহে ব্যাকুলা রাই দেখি সখিগণ।
কৃষ্ণস্মৃতি গান করে ভাবাবিষ্ট মন॥
চরণ হইতে বর্ণে সুললিত ভঙ্গে।
পূর্ণ অমরত্ব তার যে দেখে এ রঙ্গে॥

## যথারাগেন গীয়তে

ব্রজজন-শরণং ভবভয়-হরণং
ভজ রাধে কৃষ্ণ-চরণম্।
মায়া-গরনাশনং শ্রীচরণে চরণং
দুঃখ-সিন্ধু-পার-তরণম্॥
মঞ্জুল-মরকত- রঞ্জন-শ্যামরূপ-
মঞ্জু-মঞ্জীর-বর-রবম্।
নখর-সুধাকর- সুধালোভবল্লবী-
লোচন-চকোর-বৈভবম্॥
কোকনদ-রক্তিম- পদতল-মোদিত
গোপিকা-কুচ-চক্রবাচম্।
যেনাপি তরলিতং বসন-বিচলিতং
মুক্তাকনক-হার-সাকম্॥
কমলা-কুচযুগ- কুঙ্কুম-কমনীয়
রতিপ্রিয়া চুম্বন-রাগম্।
কান্তা-সঙ্কেত-প্রিয়- কদম্ব-তরুরুহ-
বিশাসিত কালীয়-নাগম্॥
যশোদা-করাঙ্গুলী- চম্পকমিবার্চ্চিত-
চরাচর-গতিদায়কম্।
ধ্বজ-পরিঘাঙ্কুশ- যবোদর-চিহ্নিত
গোচারণপটু-নায়কম্॥
বৃন্দা-কানন-কামী কালিন্দীকুল-প্রিয়-
বেণু-বট-তট-গমনম্।

রাস-রস-তাণ্ডবী- কানন-পন্থা-গামী
ব্রজভূমি-সুখ-সদনম্ ॥
মুদিতা-গোপবধূ বরাঙ্গুলী-লেপিত
সুললিতালক্তকরাগম্ ।
সচন্দনতুলসী- ফুলকুল-চর্চ্চিত-
নবনীত-চৌর্য্য-সুরাগম্ ॥
কদলী-তরুবর- বরোরু-জানুধর
পীতাম্বর-মালা-বিহারম্ ।
ব্রজ-যুবতী-যৌবন- মদোন্মাদ-নিবারণ-
ধৃতমণি-মুষল-সারম্ ॥
শ্রীপুলিনবিহারী- দাস-কৃত-সুন্দর
কৃষ্ণচরণস্মৃতি-সারম্ ।
ইহ রস-গায়কে হরি-স্মর-দায়কে
প্রাপ্ত বাঞ্ছিত-সুখ-দায়কম্ ॥

পুনর্ব্বার কটিদেশ করেন বর্ণন ।
যা শুনিলে সর্ব্ব দুঃখ হয় বিমোচন ॥

যথারাগেন গীয়তে

পীতপট-ধরণে গোপী-মনোহরণে
মতিরস্তু কৃষ্ণ-কটিবরে ।

সৌদামিনী-বসনে ঘন-ইব শোভনে
গোপিকা-চাতক-সুখ-ধরে ॥
নাভি-সরসীবর রোমাবলী-শৈবাল
গোপী-মন-মীন-মনোহরে।
নীলমণি-ভূধরং হৃদয়-সুজঠরং
ধৃত যেন কিমপি গোচরে ॥
মল্লকেলী-কালেন কালীয়-দলনেন
পরিকর-পাশ-সুখ-বন্ধে।
বেণু প্রিয়-বাদিনীং সময়ানুগামিনীং
ধৃত যেন তাণ্ডব-প্রবন্ধে ॥
ক্ষীণমপি যশোদা বন্ধনেন সুখদা
ববন্ধ উদুখল-কঠিনে।
যেনাপি দামোদরং ব্রজজন-বৎসলং
ঘোষয়তি নিখিল-ভুবনে ॥
আভীর-বর-বধূ- বাহুলতা-বেষ্টিত
ক্বচিদপি রতিকেলী কালে।
যশোদা মাতুরপি পীতবাস-মণ্ডিত
মণিময়-কটিভূষা-জালে ॥
সঙ্গ-পূত-দামেন স্বকীয় প্রভাবেন
যমলার্জ্জুন-মোচন-করে।
শ্রীপুলিনবিহারী- দাস প্রভু কটিবর-
স্মৃতিসার-দুঃখ-চয়-হরে ॥
হৃদয় বর্ণনা করে শ্রবণ মধুর।
শুনিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রেম আসয়ে প্রচুর ॥

## যথারাগেন গীয়তে

বিরহ-তিমির-তলে কিমধিক-হলাহলে,
চিন্তায় সুশীতল-শ্যাম-হৃদয়ম্।
অভিনব-নীল-নভ- মণ্ডল-মঙ্গলময়-
সুখ-দিবাকর-সদা-সমুদয়ম্॥
গোপিকা-কুচ-কুঙ্কুম- সন্ধ্যারুণরাগ-চারু-
সুবিকাশ-লোচন-যুগ-রোচনম্।
রত্নহার মণিকুল- তারাচয়-বিমণ্ডিত-
কৌস্তুভ-কুমুদ-বিষাদ-মোচনম্॥
শ্রীবৎস-জলদ-রেখা- সমুদিত-মনোহর-
ব্রজবালা-বলাকাবিলাসাশয়ম্।
মুক্তা-মরকত-প্রভা চন্দন-চন্দ্রিকা-রেখা
শ্রীরাধা-সৌদামিনী-কেলী-নিলয়ম্॥
বনমালা-দেবধনু পীতাম্বর-পীতমেঘ
রাসক্রীড়া-স্বেদামৃত-বিক্ষরিতম্।
আভীর-কুলজা-বধূ নিমিলিতা-সুলোচনা
বদনেন স্পর্শসুখ তন্দ্রাগতম্॥
অনুগতা মানময়ী- চরণালক্তক-রাগ-
সুশোভিতমতীবমুদাররাগম্।
পুলিনবিহারী দাস- প্রভু-হৃদয়-সুন্দর-
মাশ্রিত সুকৃতাকর-মহাভাগম্॥
কর করতল স্তুতি গাহে ফুল্লমনে।
শুনিয়া চুম্বন রাই করে জনে জনে॥

যথারাগেন গীয়তে

করীকরযুগলে, কমনীয়-মৃণালে,
করতল-কমল-বিকাশম্ ।
অঙ্গুলীদলচয়ে, মুদ্রীকা-মধুকর-
শোভাকুল-সমূহ প্রকাশম্ ॥
পশ্য মদন-মোহন-করম্ ।
হৃদি-গিরি-দারণং গিরিবর ধারণং
বিশ্ব-মোহন-মুরলী-ধরম্ ॥
মণিময় বলয়- বাহু-ভূষা-ভূষিত-
নব-কাম-করী-শিশু-শুণ্ডম্ ।
নখর-মুক্তাফল- নারী-হৃদয়-হার-
যেনাপি দারিত-বক-তুণ্ডম্ ॥
সরলা বেণুবালা ধীরাঙ্গুলীচালনে
সুলালিতা যেন বিশেষেন ।
নবীনা মূঢ়া সাপি সুশব্দেন রোদতি
চুম্বন-সঙ্গম-বিলাসেন ॥
ব্রজবালাচঞ্চল- বসনাঞ্চলধর-
সঞ্চার-কাম-তাপ-হারকম্ ।
নব-কুচ-কদম্ব- কোরক-বিমর্দ্দক
পুতনাহৃৎ পীড়াদায়কম্ ॥
গোপ-কামিনীকুল- কুন্তল-বেণীকর
তিলকাঞ্জনাদি-দানরতম্ ।
ঘন-পরিরম্ভণ- নারী-মৃগ-বন্ধন
তর্জ্জনী-চালন-শর-পাতম্ ॥

দধি-ভাণ্ড-বিবর- গমন-নায়কবর
বস্ত্রহরণ ধীরধরণম্ ।
নিধুবন-শয়নে শয্যারচনাপটু-
শ্রীরাধাচরণ সম্বাহণম্ ॥
কাম-তাপ-ভীষণে নারী-হৃদয়াসনে-
মঙ্গল-কলস-পয়োধরে ।
মৃগমদ-রসাল পত্র-রচনা-কর
তাপন-নাশক-কোবাপরে ॥
সুবল শ্রীদামাদি গোপবালককুল-
স্কন্ধ-সুখদ-সুমনোহারম্ ।
শ্রুতমতিভীষণং কেশীদৈত্য-নাশনং
মুখবিলে তপ্ত-লৌহাকারম্ ॥
বৃষ-তৃণাবর্ত্তাঘ দাব-ময়-তনুজ-
বৎসাদি ব্রজাশুভনাশকম্ ।
ব্রজসুন্দরীপদে -হলক্তকপ্রদায়ক
সমুদয়-শুভ-প্রকাশকম্ ॥
উজ্জ্বলে সমধুরে হরি-কেলী-প্রচুরে,
কবি-পূর্ণচন্দ্রে নর্ত্তন-নায়কে ।
কৃষ্ণ-বাহু-যুগল মুদয়তি সুখদং
শ্রীপুলিনবিহারী দাসে গায়কে ॥

বদনবর্ণনা গাহে যত সখিগণ ।
সজল নয়নে রাই করে নিরীক্ষণ ॥

যথারাগেন গীয়তে

নীলদেবেশ-মণি- দ্যুতি-মুখমণ্ডল
চন্দন-লেপন-কপালম্।
কলাপ-বিলাপক- কুঞ্চিত-কেশধর-
সুষমাকুল-প্রতিপালম্॥
সুন্দর-গোবিন্দ-বদনম্।
চিন্তয় কুন্দদতী, কুরূপ-কাম-কোপ-
বিদ্দলন-সুখ-সদনম্॥
কস্তুরী-বিরচিত সীমন্ত-সীমাস্থিত
নাসামূল-তিলকরেখম্।
মনো-ভব-মোহনে, রতি-সতী-রচিত
স্বপতি-পরাজয়-লেখম্॥
শিখিপিঞ্ছ-মণ্ডিত মুক্তামণি-রচিত
গুঞ্জামালা-সুমৌলী-ধরম্।
কিশলয়-কুসুম- মালাভূষিত-চূড়
-গুঞ্জিত-ভ্রমরনিকরম্॥
নৃত্যরত-ভ্রূযুগ্ম- লতিকাসুরঞ্জিত-
গঞ্জিত-নারী-মান-মদম্।
লোচন-সরসিজ- কটাক্ষ-মধুধারা,
মানস-মধুপ-সুখদম্॥
বল্গিত-ফুল্লাধর- বেণু-রন্ধ্র-চুম্বিত-
সপ্তস্বর-ধ্বনি-ছলেন।
চুম্বন-প্রতিদান- মিয়মপি ঘোষতি
নারীচিত্ত-হৃত-বলেন॥

মণিময়-কুণ্ডল- অলকাবলী-সহ-
চুম্বিত-কদম্ব-কপোলম্ ।
বঙ্ক স্থগ্রীব-নালে রচিতাদ্ভুতরূপ
ফুল্লনীলকমললোলম্ ॥
সীমন্তিনী সিন্দুর তাম্বুলরাগ-চারু
রহঃকেলীকালে শোভিতম্ ।
রমণীয়া-কালিন্দী- সুনীলিম সলিলে
কোকনদ-কুল-হসিতম্ ॥
বল্লব-কুলরমা বর্ণিত মধুময়
শ্রীকৃষ্ণ-মনোহরমুখম্ ।
শ্রীপুলিনবিহারী- দাস-প্রভু সুন্দর
স্মৃতিরপি নাশক দুঃখম্ ॥

ত্রিসন্ধ্যা সর্ব্বদা এই পঞ্চাঙ্গ বর্ণন ।
ব্রজগোপী মন শুধু গাহে সুরোচন ॥
যাহা হইতে সর্ব্ব দুঃখ পূর্ণভাবে নাশ ।
শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চাঙ্গ-স্মৃতি-গান সুখবাস ॥

শুনি সহচরী গীত সুধামুখী রাই ।
গাহিতে লাগিল গীত অতি সুখ পাই ॥

যথারাগেন গীয়তে

জীবনে কৃষ্ণং মরণে কৃষ্ণং
গমনে কৃষ্ণং ভোজনে কৃষ্ণম

শয়নে কৃষ্ণং স্বপনে কৃষ্ণং
ব্যক্তে শ্রীকৃষ্ণং গুপ্তে শ্রীকৃষ্ণম্ ॥

ব্রজেশনন্দনো সুন্দরবরম্ ।
অঙ্গীকৃতো মনো মুরলীধরম্ ॥

মিলনে কৃষ্ণং বিরহে কৃষ্ণং
প্রণয়ে কৃষ্ণং বিবাদে কৃষ্ণম্ ।
সেবনে কৃষ্ণং স্মরণে কৃষ্ণং
শূন্যে শ্রীকৃষ্ণং পূর্ণে শ্রীকৃষ্ণম্ ॥
ভবনে কৃষ্ণং ভূধরে কৃষ্ণং
কাননে কৃষ্ণং নিকুঞ্জে কৃষ্ণম্ ।
স্বজনে কৃষ্ণং বিজনে কৃষ্ণং
সুখে শ্রীকৃষ্ণং দুঃখে শ্রীকৃষ্ণম্
স্বদেশে কৃষ্ণং বিদেশে কৃষ্ণং
রোদনে কৃষ্ণং মোদনে কৃষ্ণম্ ।
স্তবনে কৃষ্ণং বন্দনে কৃষ্ণং
নভে শ্রীকৃষ্ণং স্থলে শ্রীকৃষ্ণম্ ॥
যৌতুকে কৃষ্ণং কৌতুকে কৃষ্ণং
গঞ্জনে কৃষ্ণং রঞ্জনে কৃষ্ণম্ ।
সরবে কৃষ্ণং নীরবে কৃষ্ণং
ভয়ে শ্রীকৃষ্ণং হর্ষে শ্রীকৃষ্ণম্ ॥
বিলাসে কৃষ্ণং বিরাগে কৃষ্ণং
ভজনে কৃষ্ণং পূজনে কৃষ্ণম্ ।
সবলে কৃষ্ণং দূর্ব্বলে কৃষ্ণং
রোগে শ্রীকৃষ্ণং ভোগে শ্রীকৃষ্ণম্ ॥

রন্ধনে কৃষ্ণং বন্ধনে কৃষ্ণং
তরণে কৃষ্ণং চরণে কৃষ্ণম্ ।
পবনে কৃষ্ণং পাবনে কৃষ্ণং
স্নিগ্ধে শ্রীকৃষ্ণং মুগ্ধে শ্রীকৃষ্ণম্ ॥
সুদূরে কৃষ্ণং সমীপে কৃষ্ণং
মারণে কৃষ্ণং তারণে কৃষ্ণম্ ।
ভূষণে কৃষ্ণং দূষণে কৃষ্ণং
যুক্তে শ্রীকৃষ্ণং মুক্তে শ্রীকৃষ্ণম্ ॥
অজয়ে কৃষ্ণং বিজয়ে কৃষ্ণং
সমরে কৃষ্ণং সুস্থিরে কৃষ্ণম্ ।
প্রারম্ভে কৃষ্ণং রম্ভনে কৃষ্ণং
জ্ঞাতৌ শ্রীকৃষ্ণং খ্যাতৌ শ্রীকৃষ্ণম্
আলোকে কৃষ্ণং তিমিরে কৃষ্ণং
সদয়ে কৃষ্ণং নির্দ্দয়ে কৃষ্ণম্ ।
দাস পুলিন- বিহারী কৃষ্ণং
হাস্যে শ্রীকৃষ্ণং দাস্যে শ্রীকৃষ্ণম ॥

শুনি সখিগণ সবে করে আলিঙ্গন ।
'রাধে এস' বলে বাঁশী বাজিল তখন ॥
সখীসঙ্গে তবে রাই চলিল ত্বরায় ।
গান শুনি দাঁড়াইল পুলকিত কায় ॥

মাধবী সঙ্কেত-কুঞ্জে মুরলীর তানে।
স্বলীলা-গৌরব কানু গাহে ফুল্ল-প্রাণে॥

## যথারাগ

সাধের শ্রীবৃন্দাবন, সাধের যমুনা মোর।
সাধের শ্রীবংশীবট, সাধের নিকুঞ্জ ঠোর॥
সাধের যশোদা মাই পিতা নন্দ উপনন্দ।
সখা সুবল শ্রীদাম দাদা বলসুখকন্দ॥
সাধের ব্রজমণ্ডল কুণ্ডতট ঘাট বাট।
সাধের শ্রীগোবর্দ্ধন কেবল সুখের হাট॥
সাধের গোপিকাবৃন্দ গোপ ধেনুবৎস সব।
সাধের এ ব্রজলীলা রাধা-হেতু সম্ভব॥
এ সাধের যত কিছু রাধা বিনু অন্ধকার।
রাধা সুখ পাবার লাগি পাতিয়াছি সংসার॥
কে আমার মাতাপিতা ভাই আর সখাসখী।
জগতে রাধা আমার রাধাময় সব লখী॥
আমাতে রাধাতে সব লয় আর সৃষ্টি হয়।
যোগমায়া দাসীরূপে কার্য্য করে সমুদয়॥
অন্তরে বাহিরে রাধা মাঝে মোর নাম সাধা।
রাধাপ্রেমে যোগী সেজে ঘুচাইব ভব বাধা॥
সুখ-ভোক্তা আমি ভবে সুখের আধার রাধা।
পুলিনবিহারী দাস প্রভুর যে অঙ্গ আধা॥
সখীসঙ্গে সুখময়ী অন্তরালে থাকি।
শুনিয়া মোহনগান মদ-মত্ত-আঁখি॥

হাসি হাসি কাছে আসি কণ্ঠ-আলিঙ্গন।
চুম্বন করিল হাসে মুরলী-বদন॥
বিরহের যত দুঃখ সব গেল দূর।
গাহিছে কোকিল বহে মলয় মধুর॥
কত সুখভোগ্য বস্তু আনি সখিগণ।
যুগলে ভুঞ্জায়ে শেষে করেন ভোজন॥
ফুলের রচিত ঘর ফুলসেজ তায়।
ফুলের মশারি গন্ধে মনকে মাতায়॥
তার মাঝে যুগল মূরতি ফুল্লমনে।
শুইলেন সুবাসিত তাম্বুল বদনে॥
চামর ব্যজন করে সহচরিগণ।
যুগল-মাধুরী-শোভা করে নিরীক্ষণ॥
দোঁহার নয়ন অঙ্গ কত ভঙ্গী করে।
রঙ্গ হেরি রঙ্গিনীরা বাহিরেতে সরে॥
ফুলের কবাট দিয়া গবাক্ষ হইতে।
দেখে সব সুখরঙ্গ পুলকিত চিতে॥
রাধাবক্ষে কভু কৃষ্ণ কৃষ্ণবক্ষে রাধা।
দুই দেহ এক হবে সাধে এই সাধা॥
অধর-দংশন আদি মধুর-বিলাস।
আলুথালু বেশভূষা চারু কেশপাশ॥
রসিক ভাবুক দেখো ভাবের নয়নে।
পুলকে মুকত্ব মোর নমি ও চরণে॥
নিশাশেষভাগে সতী মধুর হাসিয়া।
করুণানিধিকে কহে কণ্ঠ-আলিঙ্গিয়া॥

## যথারাগ

রসিককুল- শেখরমণি
গুণমণি কালো সুন্দর।
চারু কপালে তিলক সহ
ফুল রচ শোভা কন্দর॥
কর কর বেশ মোহন।
কাজলবিন্দু দেহ হে বন্ধু
ভুরু মাঝে প্রিয়-শোভন॥
সিন্দুররেখা সঁীথির মাঝে
গোরোচনা-বিন্দু সহিতে।
কস্তুরীবিন্দু রচ কপোলে
চুম্বন-লক্ষণ ঢাকিতে॥
নব-কদম্ব- নিন্দিত মম
পয়োধর পীন যুগলে।
নখরচিহ্ন- দূরকারণ
লেপহে কুঙ্কুম বিমলে॥
বিরচ বেণী কুসুম দিয়া
ক্ষীণ কটিদেশে মেখলা।
গলে সুহার, পদে নুপুর,
নাসিকাতে ভূষা অমলা॥
যেমন সাজ সাজে আমাতে
তেমন সাজাও যতনে।
দাস পুলিন- বিহারী প্রভু
শেষে হে তুষিব চুম্বনে॥

প্রিয়ার আদেশে কৃষ্ণ অতি ফুল্লমনে।
সাজাইল প্রিয়া শেষে তোষে সুচুম্বনে
সখিগণ হেরি হাসে, রাধাকৃষ্ণ জয়।
কহে সব এইরূপ নিত্যলীলা হয়॥

## অন্যান্য বাৎসল্য রস

প্রলম্ব নিধন আর দাবানল পান।
বল-কৃষ্ণ করে যবে ব্রজজন-প্রাণ॥
সেই নিশি সমাগত নন্দের নিলয়ে।
গোপবৃদ্ধগণ সব মহাসুখী হয়ে॥
শ্রীনন্দ-যশোদা আর রোহিণী মাতার।
জয়ধ্বনি দেয় সবে আনন্দ অপার॥
চিরদিন কোলে লয়ে কৃষ্ণ-বলরাম।
দে তোরা আমাদের সুখ অবিরাম॥
পুত্রযুগলের শুনি গৌরব অপার।
নন্দের নয়নে বহে বাৎসল্যের ধার॥
কারে করে নমস্কার কারে করে কোলে।
কারে বা চুম্বন করে হরিবোল বলে॥
সখাগণ সহ আর যত বৃদ্ধগণে।
সে নিশি-ভোজন নন্দ দেন সযতনে॥
সে ভোজনানন্দ-সুখ দেখ ভাগ্যবান।
নন্দগৃহে পুত্রবেশে খায় ভগবান॥

শ্রীনন্দের বড় ভ্রাতা উপনন্দ নাম।
যাঁর চিন্তা সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-বলরাম ॥
তিনি আজ উপস্থিত ভোজন-আনন্দে।
এক সঙ্গে খায় হেরি কৃষ্ণমুখচন্দ্রে ॥
দুই সারি করি সবে মুখামুখী হ'য়ে।
ভোজন করেন রাম কৃষ্ণ-কথা ক'য়ে ॥
এক দিকে উপনন্দ গোপগণ সহ।
অন্য দিকে নন্দ পুত্র-সখাগণ সহ ॥
দক্ষিণে শ্রীবলরাম বামে ঘনশ্যাম।
মধ্যে ব্রজরাজ স্নেহরস মূর্ত্তিমান ॥
সেই স্নেহরসে যেন দুটি শতদল।
শ্বেত-নীল দুই পার্শ্বে করে ঢল ঢল ॥
রোহিনী যশোদা মাতা মিলি দুইজনে।
সুপরিবেশন করে প্রতি জনে জনে ॥
উভয় পুত্রের আর উভয় মাতার।
যশ কহে বৃদ্ধগণ আনন্দ অপার ॥
বরীয়সী জননীর সঙ্কেত পাইয়া।
উপনন্দ বাবা কহে প্রেমাশ্রু ভরিয়া ॥
শুনো নন্দ ব্রজাধিপ প্রাণপ্রিয় মোর।
রাজা তুই এই দুই রাজপুত্র তোর ॥
তোর হতে ভাগ্যগুণে পাইয়াছি সবে।
এদুটি দেখিয়া আমাদের প্রাণ রবে ॥
কিন্তু কত শত্রু ফেরে এ রত্ন হরিতে।
ধর্ম্মবলে রক্ষা হয় চারিদিক হইতে ॥

গোকুল ছাড়িয়া যুক্তি করি বৃন্দাবনে।
আইলাম তবু শত্রু আসে ক্ষণে ক্ষণে ॥
সাবধানে থেকো সাধু বলে বার বার।
এ দুটিকে গোচারণে পাঠাও না আর ॥
দুঃখের সম্ভব যথা তথা প্রিয়জনে।
কেহ কি পাঠায় ভাই ভাব দেখি মনে ॥
নয়ন সম্মুখে রাখ রাখি এস সবে।
অন্য ভৃত্যদ্বারা গোচারণ কার্য্য হবে ॥
শুনিয়া সকল সখা ভোজন ছাড়িয়া।
দুঃখে কহে শ্রীকৃষ্ণের বদন চাহিয়া ॥
রাজপুত্র রামকৃষ্ণ নাহি যাবে বনে।
আমাদের মৃত্যু হবে গেলে গোচারণে ॥
কৃষ্ণেরে না দেখে গোচারণ ভুলে যাব।
চলাফেরা পথঘাট সকলি হারাব ॥
সকলে ত রাজা নহে গোচারণ বিনে।
গোপের কি কার্য্য বলো এ সংসার তিনে ॥
কহেন মধুমঙ্গল শিখা নাড়া দিয়া।
ব্রাহ্মণভোজন সিদ্ধ হ'ল না বলিয়া ॥
লাড্ডু মোণ্ডা যত কিছু তোমরাই খাও।
ব্রাহ্মণভোজন নষ্ট অধঃপাতে যাও ॥
উঠিয়া চলিল বটু রামকৃষ্ণ হাসে।
যশোদা রোহিণী তাঁরে ধরি নিল পাশে ॥
বুঝিয়া সকল তত্ত্ব নন্দবাবা কহে।
হে বটু তোদের দুঃখ মোর নাহি সহে ॥

আমাদের প্রাণ দুটি তোমাদের প্রাণ।
প্রাণের রক্ষক বিশ্বপতি ভগবান॥
খাও বটু খাও হে রাখাল বৎসগণ।
যাবে এরা নিত্য করিবারে গোচারণ॥
নিজের জাতীয় ধর্ম্ম করিবে যাজন।
রক্ষক এদের সাধু গাভী নারায়ণ॥
শুনো দাদা সাধু-বিপ্র-গাভী-হরি-সেবা।
রামকৃষ্ণ হেতু এই রক্ষাকারী দেবা॥
এইরূপে নন্দ উপনন্দে প্রবোধিল।
পরে বটু সখাগণ ভোজন করিল॥
ভোজনান্তে রামকৃষ্ণ সঙ্গে সখাগণ।
শ্রীনন্দ রাজসভায় করেন গমন॥
আনন্দদায়িকা সেই গোপরাজ-সভা।
মণিময়ী রত্নভূষা বিকশিত প্রভা॥
তাহে রত্ন-সিংহাসনে রত্নছত্র-তলে।
বসে নন্দ উপনন্দ লয়ে গোপবলে॥
উপনন্দ কোলে কৃষ্ণ বসিল যাইয়া।
নন্দকোলে বলরাম বসিল আসিয়া॥
বিশ্বাসের কোলে বসে স্বয়ং ভগবান।
সুধর্ম্মের কোলে বসে বল মূর্ত্তিমান॥
এইরূপে দুই ভাই দুইজন কোলে।
সুখাসনে সখাগণ বসে কুতূহলে॥
সভাতে মাগধ বন্দী সুতের সংবাদ।
শ্রবণ করেন সবে পরম আহ্লাদ॥

নিদ্রা আকর্ষণ দেখি যুগল কুমারে।
পাঠাইলা দুইজনে শয়ন-আগারে॥
সখাগণ নিজালয়ে করিল গমন।
এইরূপে নন্দালয়ে আনন্দ-স্রবণ॥
দাসগণ করে সেবা শয়ন-সময়।
নিদ্রাছল দেখাইয়া বহির্গত হয়॥
সময়ে নিকুঞ্জে মিলে শ্রীরাধার সঙ্গে।
উজ্জ্বল সে মহারস ভোগ করে রঙ্গে॥
দুই মাতা ভিন্ন মুখ্য-বাৎসল্য আধার।
নন্দ উপনন্দ আদি ব্রজজন সার॥

মধুময় রাসলীলা এই বৃন্দাবনে।
করেন করুণানিধি গোপিগণ সনে॥
অপ্রাপ্ত বয়স্কা কোন সুচতুরা সখী।
তদনুকারিণী গাহে রাসলীলা লখী॥

## অথ রাসবিহার

### যথারাগ

বরজকুল- রসিকা সঙ্গ
নাচত রাসরসিয়া।
ফুল্লমল্লিকা পূর্ণিমা নিশি,
মলয় সেবে বহিয়া॥

যত মাধব তত মাধবী,
চলত হাসি নাচিয়া।
বৃন্দা-বিপিন প্রেম-জলধি
সুখ-তরঙ্গ ভরিয়া॥
রাসবিলাস- মুকুটমণি,
নায়িকা-গুরু-রাধিকা।
কেশব সঙ্গ শ্রেষ্ঠ প্রদীপ,
বেষ্টিত দীপমালিকা॥
সবহুঁ অঙ্গ কুসুমহার,
মণিভূষণ ভূষিয়া।
চুম্বন করে চিবুক ধরি,
হরি গোকুল গোপিয়াঁ॥
ঝুনুর ঝুনু বাজত নুপুর,
বলয়ধ্বনি মধুরা।
উঠিল বিশ্ব- ভুবন ভরি
তালের শব্দ ধ্বনিয়া॥
দেবগন্ধর্ব্ব- জয় গাবত
স্বর্গসুমন বর্ষিয়া।
শত যুথপ বনিতা সঙ্গ
বিবিধ রঙ্গ হর্ষিয়া॥
শ্যামল গৌর গৌর শ্যামল
চক্র সদৃশ ঘুরিয়া।
বক্র-কুটিল নয়নভঙ্গী
মধুর গীতি গাহিয়া॥

নিজ কর্ত্তব্য ভুলিল বিশ্ব,
স্বভাবে রহিল চাহিয়া।
ধ্যানের মনে হেরিছে সবে,
রাধা-মাধবে মোহিয়া॥
ধন্য কানন পুলিন চারু
ধৌত যমুনা রঙ্গিয়া।
দাস পুলিন- বিহারী-প্রভু
যত্র বিলাসে ভঙ্গিয়া॥

এইরূপে শরদ বসন্তে মহারাস।
রাধাসহ বৃন্দবনে করে পীতবাস॥
রাসলীলা শেষে জলকেলী মধুময়ী।
করেন করুণানিধি সহ প্রেমময়ী॥
বরষা শ্রাবণ মাসে সখিগণ সঙ্গে।
রাধা সহ ঝুলে আর গীত গাহে রঙ্গে॥

## অথ ঝুলন-লীলা

### যথারাগ

(রাধে) ঝুলো-গো আমার সঙ্গে।
শ্যামল শ্রাবণে শ্যামলা ধরণী
দাতুর গাবত রঙ্গে॥
ক্ষণপ্রভা-বুকে গরজে গভীর
বারিধর অনুরাগে।

শুনিয়া শ্রবণে শিখি পাখী কুল
তুলিছে মল্লার রাগে ॥
বরষে যখন, নিবিড় জলদ
রবিশশী ভয়ে ভাগে।
দিবা কি নিশায় বিরহিনী-বুকে
পিয়া-সঙ্গ-সুখ জাগে ॥
ভূধরে পুলিনে, নিকুঞ্জ-মন্দিরে
ঝুলে লতা কত রঙ্গে।
ঝুলো মোর প্রিয়া, লতিকারূপিনী,
জড়ায়ে আমার অঙ্গে ॥
এ আমার বক্ষ- চারু-সিংহাসন
থাকিতে নাহিত ভয়।
পতন-সম্ভবে, আশ্রয় করিবে
তোমার লাগিত হয় ॥
তব সঙ্গ ঝুলে, সুখ খুব পাই,
তাই হয় এই সাধ।
পুলিন-বিহারী দাস-প্রভু কহে,
নাহি করো প্রতিবাদ ॥

কখন নাবিক সাজি যমুনার নীরে।
রসরঙ্গে গোপিগণে পার করে ধীরে ॥
তরঙ্গে তরণী যবে ডুবুডুবু প্রায়।
নাগরের প্রতি তবে রাধা-সখী গায় ॥

যথারাগ

(ওহে) কাণ্ডারী প্রেম জানাও।
তরঙ্গের তালে বাঁশীটি বাজায়ে
মনের কথাটি গাও॥
বসনভূষণে, সাজানো সুন্দর,
কিন্তু তরী জীর্ণ বটে।
আশা যা তা পাবে, চলো ধীরে বেয়ে,
নিয়ে সাথে অকপটে॥
সন্ধ্যা-দিবা-নিশি- প্রভাত সময়,
নদীতে তুফান বয়।
কালো মেঘ আর তোমার শরীর
যখন উদয় হয়॥
প্রবল তরঙ্গে নাচিছে তরণী,
কাঁপিছে সবার হিয়া।
তুমি কেন থির চেয়ে মুখপানে
হাসিমাখা চোখ দিয়া॥
সুদূরে শ্যামল বনমাঝে ঘর,
আমার দেশের সীমা।
সেথা পাবে সুখ চলো ত্বরা বেয়ে
আসিবে ঝটিকা ভীমা॥
ডুবে যদি যাই কোথা সুখ পাবে
দুখ ত তোমার হবে।
পুলিনবিহারী- দাস প্রভু তুমি,
পার করো নাম রবে॥

শুনিয়া গোপীর বাক্য হাসিল নাগর।
বলিলেন গোপিগণ কিসে এত ডর॥
তরী যদি ডুবে যায় ভয় কিবা তার।
হৃদয়-তরণী দিয়ে করে দেব পার॥
ছল করি যমুনার কুলের নিকটে।
মগ্নপ্রায় তরী দেখি রাই অকপটে॥
ভয়েতে বঁধুর কণ্ঠ জড়ায়ে ধরিল।
নাগরের মন-আশা সবহু পূরিল॥
অর্দ্ধ-নাভি-জলে তরীখানি ডুবাইয়া।
মিলেন গোপীকা-সঙ্গে কৌতুক করিয়া॥
এইরূপে ব্রজে নিত্য কতহু বিলাস।
করেন করুণানিধি সদা সুখ বাস॥
বসন্ত-বিলাসে হোরি-লীলার সময়।
প্রমত্ত করুণানিধি সঙ্গে সখাচয়॥
রঙ্গ বরষণ করে গাহে রসগান।
হেরি গোপিগণ হোরি-রঙ্গে আগুয়ান॥

## বসন্তরাগে হোরি

ধর ধর ধর সই ধর পিচকারী।
সখাগণ সহ ওই আসে গিরিধারী॥ ধ্রু
ভাদর বাদর সম রঙ্ বরষাও।
চন্দন কর্দ্দম নিয়ে পুলকে ছড়াও॥

সুবাসিত আবির ছড়াও চারি দিশি।
অরুণিম-বরণ হউক দশ দিশি ॥
বরষাও এত সই ফাগ দুরন্ত।
দেখিতে না পায় শ্যাম যাইবার পন্থ ॥
সখাগণ যেন সই ভাগিয়া পলায়।
পুলিনবিহারী দাস-প্রভু নাহি যায় ॥
এইরূপে যুক্তি করি খেলে গোপিগণ।
উড়িল আবিররাশি ঢাকিল গগন ॥
বাজে বেণু করতাল দুন্দুভি বিশাল।
হো হো হোরি শব্দ করে গাবত রসাল ॥
পলাইছে সখাগণ যে পারে যেথায়।
শ্রীমধুমঙ্গল মাত্র পালাতে না পায় ॥
দুই চারি গোপী তারে ধরিয়া তখন।
শিখাধরি চন্দনাদি করয়ে লেপন ॥
অভিশাপ দেয় বটু করি গোলমাল।
অধঃপাতে যা তোরা মুরখ গোয়াল ॥
আমারে ফেলিয়া সব গেলিরে গোঁয়ার।
সহে কি ব্রাহ্মণদেহে নারী-অত্যাচার ॥
আসিলেন যবে শ্যাম সখারে রাখিতে।
বেড়িল গোপীকা সব চারিদিক হইতে ॥
এইকালে পালাইল সে মধুমঙ্গল।
একা শ্যাম চৌদিকে হাসে গোপীবল ॥
শ্রীরাধাকে মধ্যে রাখি মণ্ডলী করিয়া।
রঙ্গ বরষণ করে মধুর গাহিয়া ॥

## যথারাগ

খেলহে শ্যাম খেলিব হোরি।
ঋতুপতি সমাগমে, নিতি ব্রজে পথে ঘাটে
করিয়া বেড়াও বরজোরি ॥
একলা যুবতী পেয়ে, পিচকারী হাতে নিয়ে,
ধেয়ে এস করো রসগান।
পেয়েছি একলা এবে, কেমনে গরব রবে,
গোপী কাছে হারাইবে মা'ন ॥
বাঁশীটি কাঁড়িয়ে নেব চোখে মুখে রঙ দেব
যেমন নারীর দশা কর।
পুলিনবিহারী দাস -প্রভু নারী হও আজু,
নারী পিছে লাগা রঙ্গ ধর ॥

এইরূপে খেলে গোপী পুলকে মাতিয়া।
খেলাতে হারিনু শ্যাম বলিল হাসিয়া ॥
ফাগে আবরিত আঁখি মেলিতে না পারে।
রাধে রক্ষা কর শ্যাম বলে বারে বারে ॥
দেখি বিনোদিনী তাঁরে ধরিল হিয়ায়।
নিজের আঁচলে আঁখি বদন মুছায় ॥
অতি শ্রান্ত দেখি নিল দোলনা-উপরে।
কোলেতে বসায়ে পিয়া গায় মধুস্বরে ॥

## অথ দোললীলা

### যথারাগ

হোরি খেলিয়া হয়েছে দুখ।
দোলনে দুলগো পিয়া, ধরিয়া আমার হিয়া,
লাভ করো সুবিমল সুখ ॥
ফাগমাখা তনুখানি, ঘাম ঝরে অবিরল
শ্রান্ত ওহে রঙ্গ কর শ্যাম।
দোলায়ে দোলায়ে ঘরে, বসন্তবিলাস করো,
তোমারে দোলাব গুণধাম ॥
সুগন্ধ আবির নিয়া, মাখাব এমনি দেহে,
অঞ্চলের বায়ু দিব অঙ্গে।
দাস পুলিনবিহারী- প্রভু মদনমোহন
দোললীলা-সুখ দেখো রঙ্গে ॥

আগে রাধা তারপরে গাহে সখিগণ।
দোলেতে যুগল রূপ বিশ্ববিমোহন ॥
রাধা-প্রেম-মত্ত পরে রসিকপ্রবর।
গাহিছে সুরসগীতি শ্রুতিমনোহর ॥

### যথারাগ

ইহভব-নিলয়ে মম লীলা-বিষয়ে
ত্বমসি সম্বলমেকম্।
সুন্দরি সুধামুখি, দুঃখ-দলনে মম,
ত্বমসি সৌভগলেখম্ ॥

রাধে রতি-প্রিয়ে রসায়ন রূপে।
পতন-রোগহরাসিহভব কূপে॥
কাম-তিমির-ঘোর-নিন্দিত কুহু-নিশি
মম-মার্গচ্যুত-নয়নম্।
মিহিরমিব তব চারু-বপু-মণ্ডল
দর্শয়তি স্বপস্থানম্॥
তব রস-ভাষণং শ্রুতিযুগ-তোষণং
বিধেহি মম শ্রবণায়।
তব বাহু-যুগলং করী-কর-পেশলং
নিধেহি স্কন্ধ-কুবলায়॥
লোচন-কুরঙ্গিনী কটাক্ষ-মৃগমদ
গন্ধমবিরতে ক্ষয়তি।
মম হৃদি-কাননে বিধেহি শয়নায়
মদন-ব্যাধমানয়তি॥
মেঘ-নীল-কুন্তলে! চুম্বন-সুধালোভে
তব বদন-সুধাকরম্।
বাঞ্ছতি মনো মম তিলক-বিলাঞ্ছিত-
-হাস্য-কৌমুদী-শোভাধরম্॥
নভো সম-মণ্ডলে তব কুচ-যুগলে
কুঙ্কুম-লেপন-জলদে।
হারকুল-দামিনী- শোভিতে শয়ামি কিং
লোচন-চাতক সুখদে॥
নিতম্ব-পরিসরে মেখলা-পারাবারে
পরিরম্ভ-মজ্জন-সারম্।

দেহি চামোদ-প্রিয়ে, চরণ-কোকনদে
চুম্বন-শরণ-বিহারম্ ॥
অসারে ভবঘরে ত্রিতাপ-নাশে সারে
রাধা-বিমোদন বচনে।
শ্রীপুলিনবিহারী দাস-প্রভু-কথনে,
রতিরস্তু রসরচনে ॥

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্মস্পর্শী-ভাব।
শুনিয়া শ্রীরাধা হাসে আনে লজ্জাভাব ॥
উপকারী সাধু কিন্তু অতিথি স্বজনে।
বাঞ্ছনীয় বস্তু দিয়া তোষয়ে যতনে ॥
সেইরূপ রাধা কোন ত্রুটি না করিয়া।
কৃষ্ণ-মনোগত-সুখ দেন সুখী হইয়া ॥
উভয়ের ভাব দেখি সখিগণ পরে।
শোয়ায় কুসুম শেজে কুসুমের ঘরে ॥
এইভাবে নিত্য লীলা ব্রজের মাঝারে।
রসিক ভাবুক দেখে৷ ভাবের আগারে ॥
ভাবনা করিব যাহা তাই যদি পাই।
ব্রজভাবে মাতি তবে এস সব ভাই ॥

হাহা প্রিয় জয়দেব হাহা প্রিয় চণ্ডিদাস,
হাহা বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস।
হাহা গৌরাঙ্গের গণ, ব্রজরসে মত্ত মন
গোবিন্দদাসাদি কৃষ্ণদাস ॥
ব্রজ-গীত শুনাইলে, মালা গাঁথা শিখাইলে
তাই গাঁথিলাম গাহিলাম।

কোন কুঞ্জে লুকাইয়া, একা আমাকে ফেলিয়া
সঙ্গে লহো না হইও বাম ॥
জয় রাধে রাসেশ্বরী অপার করুণা করি
যেই লীলা দেখালে আমায়।
সেই লীলামৃতে ভাসি, নিজের নিকুঞ্জে বসি
পুলিনবিহারী দাস গায় ॥
দিবসশর্ব্বরী সমুদ্র-লহরী
উঠে যত ক্ষণে ক্ষণে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-রঙ্গ-লীলা
তাদৃশ ভক্তের মনে ॥
সংক্ষেপে কহিনু চারি ভক্তি-রস
সাধন চারু-সোপান।
চঞ্চল জীবের চিত্ত যাহে চড়ি
হইবে সুভাগ্যবান ॥
জয় জয় গৌড়, পুণ্য বঙ্গভূমি,
যাহে গৌর-অবতার।
যার বনে কুঞ্জে, নদী-তট-মাঠে,
সুষমা ক্ষরে অপার ॥
কৃষ্ণ-ব্রজ-লীলা, যাহার মধ্যেতে,
হয় সমধুর ভাবে।
জয়দেব আদি, চণ্ডীদাস কবি,
ব্রজ জনে তাই গাবে ॥
আবার আসিল, ব্রজের ঠাকুর,
ভাল করে বুঝাইল।

সে ব্রজ এ গৌড়, এ গৌড় সে ব্রজ,
ব্রজলীলা দেখাইল ॥
কতদিন হতে এ সাধের দেশে,
ব্রজলীলা অভিনয়।
নিত্য নিত্য হয় সাধক হেরিছে,
সত্ত্বগুণ যাহে রয় ॥
সেই দেশে জন্ম, সেই দেশে কর্ম্ম,
তবে কেন তুমি দুখী।
শ্রীরাধা-গোবিন্দ ভাব দিবানিশি,
হইবে পরম সুখী ॥
প্রাণভরে বল, কোথা আছ তুমি,
শ্রীকৃষ্ণকরুণানিধি।
হবে ভব পার, সব সুখ পাবে
ছুটিবে যমের বিধি ॥
ভাষা চম্পূকাব্য, এ চারু প্রবন্ধ
শ্রীকৃষ্ণকরুণানিধি।
শ্রবণ পঠন করয়ে যে জন,
তার নাহি যম-বিধি ॥
যে জন পড়িবে, শুনাবে শুনিবে,
শ্রীকৃষ্ণকরুণানিধি।
জন্মে জন্মে তার দাস-অনুদাস,
আমারে করুক বিধি ॥
হয়েছে হইবে, যে জন ডাকিবে,
হা কৃষ্ণকরুণানিধি।

জন্মে জন্মে তার, দাস-অনুদাস,
আমারে করুক বিধি ॥
নয়ন মুদিলে সবকে হারাও,
দেখ যদি অন্ধকার।
এইটি আমার ওইটি পরের
কেন এই অহঙ্কার ॥
কোথা পিতামাতা পত্নীবন্ধুভ্রাতা
সব অন্ধকারে মেশে।
আমার বলিয়া তাদের লইয়া
ঘুরছি আঁধার দেশে ॥
কি তোর কুমতি হল না সুমতি,
বিকারী রোগীর পারা।
হাসিস কাঁদিস ক্রোধেতে জলিস
কখন শবের ধারা ॥
আপন করিলি দুই চারি জনে
সবকে করিলি পর।
সাগর ছাড়িয়া গোষ্পদে রহিলি
তাই দুঃখ নিরন্তর ॥
জগতপতির রূপগুণ ধ্যান
করিলে রবে না দুখ।
সকলে তোমার আপন হইবে
পাইবে পরম সুখ ॥
হর্ম্ম তরুতল সমান হইবে
পুলকে থাকিবে প্রাণ।

রোগ-জরা-জ্বালা, কিছু না থাকিবে;
কর কৃষ্ণগুণ গান ॥
যমুনার তটে নিকুঞ্জ কানন,
সুখ বৃন্দাবন নাম।
রাধাকৃষ্ণ তায় খেলে নিরবধি,
ভাব ইহা অবিরাম ॥
রাধাকৃষ্ণ রূপ ধেয়ানের যোগে,
যাহার হৃদয়ে জাগে।
পুলিনবিহারী- দাস-প্রভু তার,
সুখ দেয় অনুরাগে ॥

এই শ্রীশ্রীকৃষ্ণকরুণানিধি প্রবন্ধ অতি সুন্দর! লোকচক্ষু প্রকাশে নলিনী-মনোহর দিবাপতি, স্নিগ্ধ-উপদেশামৃত বর্ষণে সুরসুন্দরী-প্রভাব একমাত্র বিরাম-স্থল শ্রাবণ-মেঘ, যাহা প্রেমের একমাত্র আনন্দ-মন্দির, শ্রীলক্ষ্মীর হৃদয়-সর্ব্বস্ব অন্যান্য গোপকুল-লক্ষ্মী-বৃন্দের প্রাণপ্রিয় ভাব্য—বেদপুরাণের সার-স্বরূপ করুণানিধি কৃষ্ণ, আজ নিখিল বৈষ্ণবীয় ভক্তিশাস্ত্রের সারস্বরূপ কৃষ্ণকরুণানিধি প্রবন্ধরূপে প্রকাশ হওয়াতে, দুশ্ছেদ্য লৌহশৃঙ্খলরূপ ভব-বন্ধন, প্রমত্ত হস্তীর ফুলহার-বন্ধনের ন্যায় তুচ্ছতা-গ্রহণ-পূর্ব্বক জীবগণের নিকট যে থাকিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ-ই নাই।

ইতি ভাষাচম্পু-লক্ষণাত্মক সূচনা-পূর্ব্বার্দ্ধ-উত্তরার্দ্ধ-খণ্ডযুক্ত শ্রীপুলিন-বিহারী দাস কৃত শ্রীশ্রীকৃষ্ণকরুণানিধি প্রবন্ধ-গ্রন্থ

সম্পূর্ণ